প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

ভারতীয় দর্শন

ব্যানার্জী পাবলিশার্স

Bani Ganguly. -
Baniganguly

কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পরিবর্তিত ও সংশোধিত নূতন পাঠক্রম (Syllabus) অনুসারে লিখিত ত্রি-বার্ষিক স্নাতক (Three Year Degree Pass Course) পরীক্ষার্থীর একমাত্র পুস্তক।
[Vide : Syallabi—1960]

ভারতীয় দর্শন

[ত্রি-বার্ষিক স্নাতক (Pass Course) শ্রেণীর পাঠ্য]

অধ্যাপক, **প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত**, এম. এ. (দর্শন ও বাংলা)
দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর (বীরভূম);
তর্কবিজ্ঞান প্রবেশ (P. U.), উচ্চ-মাধ্যমিক তর্কবিজ্ঞান,
উচ্চ-মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন,
দর্শনের মূলতত্ত্ব (ত্রি-বার্ষিক) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা
এবং পরীক্ষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
কর্তৃক প্রণীত

অধ্যাপক, **মতিলাল মুখোপাধ্যায়**, এম. এ.,
দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, যোগমায়া দেবী কলেজ;
অধ্যাপক, আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা এবং
পরীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কর্তৃক পরিমার্জিত

বি.পি

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : জুন '৬২

মূল্য : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

—পৃথক বাঁধাই—

দর্শনের মূলতত্ত্ব (ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন)	১১·০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শন	৬·৫০

মুদ্রাকর :
শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

ভূমিকা

গত বছর কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসরের স্নাতক শ্রেণীর নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী আমার লেখা 'নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন' প্রকাশিত হওয়ার পরই বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ও অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই দর্শনের তৃতীয় পত্র অর্থাৎ 'ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন' লেখার জন্য অনুরোধ করে আমায় পত্র দেন। ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মী অধ্যাপক-বৃন্দের উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করে তিন বৎসরের স্নাতক শ্রেণীর (Pass course) নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী এই 'ভারতীয় দর্শন' রচিত হল। 'দর্শনের মূলতত্ত্ব' (ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন) নামে কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসরের স্নাতক শ্রেণীর দর্শনের ছাত্রদের জন্য যে পুস্তকটি রচনা করেছি 'ভারতীয় দর্শন' সেই পুস্তকেরই প্রথম খণ্ড।

এই পুস্তক রচনার ব্যাপারে আমাকে একাধিক গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের মূল গ্রন্থগুলি ছাড়াও *Radhakrisnan, S. N. Das gupta, Dr. J. N. Sinha, S, C. Chatterjee* এবং *D. M. Dutta*-এর ভারতীয় দর্শনের গ্রন্থগুলি, ভারত সরকারের শিক্ষাধিকারিক বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ), *Hiriyanna*র 'Outlines of Indian Philosophy', *Max Muller*-এর 'The Six Systems of Indian Philosophy', সুখময় ভট্টাচার্যের 'ন্যায়-দর্শন' ও 'বৈশেষিক দর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই পুস্তক রচনায় আমায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। এই সকল লেখকদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ইতিপূর্বে মাতৃভাষায় 'ভারতীয় দর্শনের' অন্যান্য পুস্তক যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের ব্যবহৃত পরিভাষা আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছে, সেজন্য তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। পরিভাষার অপ্রতুলতাহেতু প্রয়োজনবোধে কোথাও কোথাও নতুন পরিভাষা নিজেকেই তৈরী করে নিতে হয়েছে। পরিভাষার তালিকা ও প্রশ্নমালা গ্রন্থের শেষে যুক্ত করা হয়েছে।

'ভারতীয় দর্শনের' বিষয়বস্তুগুলিকে এই পুস্তকটিতে সরল সহজ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা শব্দের পাশেই ইংরেজী প্রতিশব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর আলোচনাকে একদিকে যেমন অনাবশ্যকভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়নি, তেমনি পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত বিষয়বস্তুর অনাবশ্যক আলোচনায় পুস্তকের কলেবর অযথা স্ফীত করা হয়নি।

যোগমায়া দেবী কলেজের প্রধান অধ্যাপক ও আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায় পুস্তকটির প্রতিটি অধ্যায় যত্নপূর্বক পাঠ করে এবং পরিমার্জিত করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। হাওড়া গার্লস কলেজ ও শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের বর্তমান প্রধান অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীগিরিধারী শাস্ত্রী ও অধ্যাপক শ্রীজগদীশ্বর সান্ন্যাল, সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীসতীন চক্রবর্তী, চন্দননগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীহীরেন রায়, মগরা শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅমিয়াংশু দেব, বিষ্ণুপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীতীর্থনাথ সরকার, সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত, রামপুরহাট কলেজের অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ও অন্যান্য সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দের প্রেরণা এ গ্রন্থ রচনার মূলে বিশেষভাবে বর্তমান। আমার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী নমিতা সেনগুপ্তা ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীতড়িৎ সেনগুপ্ত প্রুফ দেখার কাজে আমায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। পুস্তকখানি ছাত্রছাত্রীগণ ছাড়াও যাতে সাধারণ পাঠকের উপকারে আসে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

পরিশেষে, যাদের জন্য বইখানি লেখা হল তারা উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে। ব্যানার্জী পাবলিশার্স-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী এই পুস্তক প্রকাশ এবং শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না পুস্তকটির মুদ্রনের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। অনিচ্ছা সত্বেও দু'একটি মুদ্রনের ভুল রয়ে গেছে, তার জন্য বিশেষ দুঃখিত। ইতি—

কলিকাতা
১৭ই জুন '৬২

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

Syllabus

IDIAN PHILOSOPHY

The University of Calcutta

Group A

Full marks—50

Basic Features of Philosophy : Schools of Indian Philosophy and their Development. The common characters of the Indian Systems.

Outlines of three systems of Indian Philosophy to be selected by the Board from time to time.

For the present—The Buddha, Nyaya and Vaisesika Systems.

The University of Burdwan

Degree Examination, 1963 and 1964.

Paper III—General Philosophy : *Indian* and *Western*

Group A

Full marks—50

Four noble Truths of Buddhism.

Basic Tenets of four schools of Buddhism.

Nyaya Theory of Pramanas and Vaisesika Theory of Padarthas.

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

ভারতীয় দর্শন

[INDIAN PHILOSOPHY]

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ত্ব

(Basic characteristics of Indian Philosophy)

১। ভূমিকা (Introduction) :

মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব ; কিন্তু সে শুধু বুদ্ধিযুক্ত নয়, তার মধ্যে আছে এক অদম্য কৌতূহল, এক দুর্নিবার জ্ঞানস্পৃহা। তাই তার চার পাশের জগতটার দিকে চোখ মেলে তাকিয়েই সে তৃপ্ত নয় ; তাকে সে ভাল ভাবে জানতে চায়, বুঝতে চায়। সে দেখে এ জগত অসীম বৈচিত্র্যে পূর্ণ, অপূর্ব রহস্যে ভরা। এই রহস্য এবং এই বৈচিত্র্য মানুষের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। এই বিস্ময় থেকেই উদ্ভূত হয় মানুষের জিজ্ঞাসা, জানবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। সে চায় এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে, অজানাকে জানতে। তার জ্ঞানস্পৃহা এবং অদম্য কৌতূহল তার মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। এই বিশ্বজগতের উদ্ভব কি ভাবে হল, এ বিশ্বজগতের কোন স্রষ্টিকর্তা আছে কিনা, যদি থাকে তার স্বরূপ কি, বিশ্বজগতের সঙ্গে স্রষ্টিকর্তার বা ঈশ্বরের কি সম্পর্ক, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ কি, এ জীবনের পরিণতি কি, মানুষের আত্মার স্বরূপ কি, মানুষের আত্মা কি অমর, জীবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের কি সম্পর্ক—এই সব প্রশ্নের কোন সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত তার মন তৃপ্ত হয় না। মানুষের কৌতূহলেরও অন্ত নেই, তার জিজ্ঞাসারও শেষ নেই। তাই সে আরও জানতে চায়—মানুষের ইচ্ছা কি স্বাধীন, না জাগতিক

মানুষের জ্ঞানস্পৃহার মূলে তার অদম্য কৌতূহল

মানুষের বিস্ময়বোধ থেকে তার জিজ্ঞাসার উদ্ভব

মানুষের মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগে যার সদুত্তর সে চায়

নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ? সত্য, শিব ও স্থন্দরের আদর্শ কি বাস্তব, না মানুষের মনগড়া কাল্পনিক ধারণা মাত্র ?

জ্ঞানের রাজ্য অনন্ত ও অসীম, মানুষের জ্ঞানস্পৃহাও প্রবল ও দুর্বার ; তারও কোন সীমা নেই। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিই তার এই জ্ঞানস্পৃহার উৎস। বুদ্ধিবৃত্তিই এনে দেয় মানুষের মধ্যে চিন্তা করার ক্ষমতা। এই চিন্তাশক্তির সহায়তায় মানুষ জানতে চায় তার পরিবেশকে, বৃহত্তর জগতকে এবং অজানা সত্যকে। বস্তুতঃ, ইংরেজী *Philosophy* শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই হল জ্ঞানের জন্য অনুরাগ (Love for knowledge)[1] ।

Philosophy হল জ্ঞানের জন্য অনুরাগ

মনুষ্যেতর জীবের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ আছে। মানুষ শুধু বাঁচতে চায় না, সে ভালভাবে বাঁচতে চায়। কিন্তু নিজের পরিবেশকে ভালভাবে না জানলে ভালভাবে বাঁচা কি ভাবে সম্ভব ? এর জন্যেই প্রয়োজন এই বিশ্বজগত ও জীবনকে ভালভাবে জানা, যথার্থভাবে উপলব্ধি করা এবং জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করেই মানুষ জীবন সংগ্রামকে করতে চায় সহজ ও সাফল্যময়।

মানুষ জানতে চায় কারণ সে ভালভাবে বাঁচতে চায়

জগত ও জীবন এবং তার চার পাশের পরিবেশ সম্পর্কে প্রতিটি মানুষেরই কতকগুলি বিশ্বাস ও ধারণা আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এ সব ধারণার যৌক্তিকতা বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে মনে করে না। দার্শনিকের কাজ এই সব ধারণা বা মতামতগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে এই বিশ্বজগত সম্পর্কে একটা যুক্তিযুক্ত ও সুসংবদ্ধ ধারণা দেওয়া এবং মানুষের জীবনের প্রকৃত অর্থ ও মূল্য নিরূপণ করে এ জগতের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক তা নির্ধারণ করা। এই অর্থে দর্শন হল জীবন এবং অভিজ্ঞতার সমালোচনা (Criticism of life and experience)।

দর্শন হল জীবন এবং অভিজ্ঞতার সমালোচনা

জ্ঞানলাভের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হল যে কেবল চোখে দেখে বা কানে শুনেই সব সময় সত্যকে জানা যায় না। এজন্য যা আমাদের চোখের

1. *Philos* = loving. *Sophia* = wisdom or knowledge.

সামনে প্রতিভাত হয়, তা সকল সময় সত্য নয়, অনেকক্ষেত্রে তা মিথ্যা বা সত্যের আভাস মাত্র। মিথ্যার আড়ালকে সরিয়ে দিতে না পারলে সত্যের স্বরূপ আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে না।

যা কিছু দেখি, সব সত্য নয়

ভারতীয় দার্শনিকদের মতে দার্শনিকের কাজ হল সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা। এই কারণেই ভারতীয়রা Philosophyকে 'দর্শন' নামে অভিহিত করে। দৃশ ধাতু থেকে দর্শন শব্দের উৎপত্তি। দর্শন মানে দেখা, কিন্তু যে কোন দেখাই দর্শন নয়। সত্যকে দেখা এবং সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করাই হল দর্শন এবং যে শাস্ত্রে সত্যকে দর্শন করার পথ, পদ্ধতি ও পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাই হল দর্শনশাস্ত্র। দর্শন হল 'তত্ত্ব-দর্শন', সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধিকরণ। সে কারণে দার্শনিক কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানী নয়, তিনি তত্ত্বদর্শীও বটে। তিনি সত্যানুরাগী। তিনি সত্যদ্রষ্টা। জগৎ ও জীবনের যথার্থ স্বরূপ দর্শনের জন্য দার্শনিক সর্বদাই সচেষ্ট। তিনি সত্যের অনুসন্ধান করেন ও সত্যকে জীবনে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার জন্য ব্রতী হন।

দর্শন হল সত্যের উপলব্ধি

২। ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি (The nature of Indian Philosophy):

ভারতীয় দর্শনকে অনেকে 'হিন্দু দর্শন' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু দর্শন সমার্থক নয়। অবশ্য হিন্দু বলতে যদি বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে না বুঝে, 'ভারতীয়' বুঝি তাহলে ভারতীয় দর্শনকে 'হিন্দু দর্শন' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু হিন্দু বলতে যদি আমরা মনে করি বিশেষ একটি সম্প্রদায় তাহলে ভারতীয় দর্শনকে হিন্দু দর্শনরূপে অভিহিত করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতামত আলোচিত হয়েছে। হিন্দু, অ-হিন্দু, আস্তিক, নাস্তিক সকলের দার্শনিক মতবাদই ভারতীয় দর্শনে স্থান

ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু দর্শন সমার্থক নয়

ভারতীয় দর্শন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতামত আলোচনা করে

লাভ করেছে। মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' আমরা বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকদের আলোচনা পাশাপাশি দেখতে পাই। একদিকে যেমন আমরা সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত প্রভৃতি হিন্দু দর্শনের আলোচনা দেখি, তেমনি বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেরও আলোচনা দেখতে পাই।

ভারতীয় দর্শনে হিন্দু দর্শন ছাড়াও বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন সম্পর্কে আলোচনা আছে

(দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা ও ব্যাপকতা ভারতীয় দর্শনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।) ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যদিও অনেক পার্থক্য আছে, তবু একথা ভুললে চলবে না যে, কোন একটি বিশেষ দর্শন অপর দর্শনের প্রচারিত মতবাদের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করত এবং সেগুলিকে জানবার জন্য সচেষ্ট হত। অপরের মতবাদগুলিকে ভালভাবে জেনে ও কিভাবে সেগুলি খণ্ডন করা যায় তা স্থির করে তবেই যে কোন দর্শন নিজের সিদ্ধান্ত-গুলি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট হত। অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার ভাব থেকেই ভারতে দার্শনিক আলোচনার এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করার রীতি প্রবর্তিত হয়। (কোন দার্শনিক নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে সর্বপ্রথম প্রতিপক্ষের মতবাদ ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করতেন, যাকে বলা হয় পূর্বপক্ষ।) তারপর শুরু হত পূর্বপক্ষের খণ্ডন। এরপর দার্শনিক যুক্তি-তর্কের সহায়তায় নিজমত প্রতিষ্ঠা করতেন, একে বলা হয় উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত। প্রতিপক্ষের দার্শনিক মতবাদের সুষ্ঠু ও সম্যক আলোচনার এই উদার প্রচেষ্টা ভারতীয় প্রতিটি দর্শনের মধ্যে এনেছিল সম্পূর্ণতা এবং তাকে করে তুলেছিল বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ।

দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা ও ব্যাপকতা ভারতীয় দর্শনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় দর্শনে আলোচনার বিশেষ রীতি

দর্শনালোচনার তিনটি ক্রম—পূর্বপক্ষ, খণ্ডন ও উত্তরপক্ষ

(প্রতিটি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রই এই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। শঙ্কর, রামানুজ প্রমুখ বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন ভাষ্যকার বেদান্ত দর্শনের আলোচনা ছাড়াও চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের মতবাদগুলিও তাঁদের গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।)

পারস্পরিক আলোচনা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রকে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছিল

অনুরূপভাবে বৌদ্ধ বা জৈন দর্শন সম্পর্কীয় গ্রন্থেও আমরা অন্যান্য দার্শনিক মতবাদগুলির সুষ্ঠু আলোচনা পেয়ে থাকি। অপরের মতামতকে জানার এই দুর্নিবার স্পৃহা ভারতীয় দর্শনগুলিকে করে তুলেছিল উদার, বিস্তৃত এবং অমূল্য জ্ঞানের ভাণ্ডার।

ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিক পটভূমিকা

ভারতীয় দর্শনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার আধ্যাত্মিক পটভূমিকা (Spiritual background)। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের তুলনায় ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বালোচনা নয়, এ হল সত্যের সন্ধান ও উপলব্ধি। ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র তাত্ত্বিক (Theoretical) নয়, এর একটি প্রয়োগের (Practical) দিকও আছে। ভারতীয় দার্শনিক মনে করেন যে দর্শনের সঙ্গে জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। দার্শনিক জ্ঞান দৈনন্দিন জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে সহায়তা করে, যথাযথ জীবনযাপনে সাহায্য করে।

ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র তাত্ত্বিক নয়, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তার গভীর সংযোগ

ভারতীয় দর্শন বিশেষ করে আধ্যাত্মিক, যেহেতু ভারতে দর্শন ও ধর্মের মধ্যে এক গভীর সংযোগ বর্তমান। ভারতীয়দের কাছে ধর্ম মানে নিছক আচার অনুষ্ঠান পালন করা নয়। ধর্ম হল আধ্যাত্মিক সত্যের প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ উপলব্ধি যা মানুষকে মোক্ষলাভে সহায়তা করে। ভারতীয় দর্শনে মোক্ষলাভই (Liberation) হল পরমার্থ (Summum Bonum)। ভারতীয়দের চোখে দর্শনই নীতি ও ধর্মের মূল ভিত্তি।

ভারতীয় দর্শনে দর্শন ও ধর্মের অপূর্ব সংযোগ

ভারতীয় দর্শনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী (Synthetic outlook)। ভারতীয় দর্শনের আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যই এই দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করেছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মত ভারতীয় দর্শনও অধিবিদ্যা (Metaphysics), নীতিবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) সম্পর্কীয় বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করে, তবে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মত এদের পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে না। একই দার্শনিক সমস্যা—অধিবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্ভাব্য

ভারতীয় দর্শনের সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী

দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচিত হয়। ভারতীয় দার্শনিকদের আলোচনা পদ্ধতির এই দৃষ্টিভঙ্গীকেই অনেকে সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী বলে অভিহিত করেছেন।

৩। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা বা দর্শন-সম্প্রদায় (The Schools of Indian Philosophy):

ভারতীয় দর্শনের দুটি শ্রেণী—আস্তিক ও নাস্তিক

ভারতীয় দর্শনগুলিকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; যথা, **আস্তিক** (Orthodox) এবং **নাস্তিক** (Heterodox)। সাধারণতঃ ষড়দর্শন বলতে আমরা যে ছয়টি দর্শনকে বুঝে থাকি, যথা—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত—এরা হল আস্তিক এবং চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন হল নাস্তিক।

সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত হল আস্তিক, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন হল নাস্তিক

'আস্তিক' এবং 'নাস্তিক'—এই শব্দ দুটিকে এখানে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আস্তিক বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং নাস্তিক বলতে বুঝি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আস্তিক বলা হয়েছে তাদের যারা বেদের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য স্বীকার করে এবং বেদের সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে। সুতরাং কোন দর্শন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়েও যদি বেদে বিশ্বাসী হয় তাকে আস্তিক বলা হবে। অপরদিকে ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে সেগুলিই নাস্তিক যেগুলি বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে না এবং বেদকে প্রামাণিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করে না। এই বিভাগ অনুসারে সাংখ্য এবং মীমাংসা দর্শন যদিও জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় তবু এই উভয় দর্শনকে আস্তিক বলা হয়, যেহেতু উভয় দর্শনই বেদে বিশ্বাসী এবং বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়।

আস্তিক কথাটির অর্থ যে বেদে বিশ্বাসী

সাংখ্য এবং মীমাংসা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়েও আস্তিক, যেহেতু উভয়ে বেদে বিশ্বাসী

যে ষড়দর্শনকে আস্তিক বলা হয়, তাদের মধ্যে একদিকে যেমন অনেক বিষয়ে মতের মিল আছে, তেমনি নানা বিষয়ে মতভেদও আছে। যেমন, সাংখ্য এবং যোগ উভয় দর্শনই পুরুষ ও প্রকৃতিকে স্বীকার ক'রে তাদের

দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেছে ; কিন্তু সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, অথচ যোগ দর্শন ঈশ্বরে বিশ্বাসী। সাংখ্য দর্শনের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না এবং এই জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। যোগদর্শন পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্ন ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে এবং এর মতে এই জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা ও পরিণামই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মীমাংসা দর্শনের মধ্যেও আমরা দুটি প্রধান মতবাদের পার্থক্য লক্ষ্য করি। একদিকে প্রভাকর মিশ্র এবং অপরদিকে কুমারিল ভট্ট, উভয়ই মীমাংসাবাদী হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে মতের পার্থক্য আছে। মীমাংসকগণ ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাসী নন। অনুরূপভাবে বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে শঙ্কর তাঁর অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন এবং রামানুজ বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ, রামানুজের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। শঙ্করের মতে কেবলমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগত মিথ্যা মায়ার সৃষ্টি ; কিন্তু রামানুজ শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করে ব্রহ্ম ও জগত উভয়কেই সত্য প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ পরিলক্ষিত হয় ; তবুও এগুলিকে আস্তিক বলা হয়, যেহেতু এরা সকলেই বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে মনে করে।

ষড়দর্শনের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ

সাংখ্য ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, যোগ ঈশ্বরে বিশ্বাসী

মীমাংসা দর্শনে—প্রভাকর মিশ্র ও কুমারিল ভট্টর মতৈক্য ও মতবিভেদ

শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে মতভেদ

মতবিভেদ সত্ত্বেও ষড়দর্শন বেদে বিশ্বাসী এবং সেহেতু আস্তিক

অপরদিকে তিনটি প্রধান নাস্তিক দর্শন হল—চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন। চার্বাক দার্শনিকরা হল জড়বাদী। তাঁরা কেবলমাত্র জড়ের অস্তিত্বই স্বীকার করেন, আত্মার পৃথক সত্তা স্বীকার করেন না এবং তাঁদের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। চার্বাকদের মতে প্রত্যক্ষণই একমাত্র জ্ঞানলাভের উপায় বা প্রমাণ,

জড়বাদী চার্বাক দর্শন

এবং যেহেতু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেহেতু ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। জৈন দার্শনিকরা দ্বৈতবাদী। দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে তাঁরা সর্বপ্রথম তাকে 'অস্তিকায়' এবং 'নাস্তিকায়' —এই দু' ভাগে বিভক্ত করেন। অস্তিকায় অর্থে যার বিস্তৃতি, কায় বা দেহ বর্তমান ; যেমন 'জীব' বা অজীব। কাল (time) হল নাস্তিকায়, যেহেতু এর কোন বিস্তৃতি নেই। অস্তিকায় দ্রব্যকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় ; যথা, জীব এবং অজীব। জীব চেতন দ্রব্য, অজীব অচেতন দ্রব্য। জীব এবং আত্মা সমার্থক। আত্মা চেতনস্বভাব।

দ্বৈতবাদী জৈন দর্শন

জগৎস্রষ্টারূপে কোন ঈশ্বরের সত্তায় জৈন দর্শন বিশ্বাস করে না। জৈন দার্শনিকদের মতে এই জগৎ ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন এবং নানা যুক্তির সাহায্যে জৈনগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। জৈন দর্শন নাস্তিক দর্শন, যেহেতু জৈনগণ শুধু যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তা নয়, বেদকেও প্রামাণিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করেন না। বৌদ্ধ দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় মানুষের জীবন। জরামরণের হাত থেকে মানুষ কি ভাবে মুক্তিলাভ করতে পারে বুদ্ধদেব তারই পথ নির্দেশ করেছেন। জটিল দার্শনিক তত্ত্বালোচনাকে তিনি নিরর্থক ও মূল্যহীন মনে করতেন। বৌদ্ধরা মনে করেন এ জগতের সব কিছুই অনিত্য। কোন কিছুই শাশ্বত বা চিরস্থায়ী নয়। জগতের সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনই জগতের একমাত্র সত্য। যেহেতু কোন কিছুই নিত্য বা শাশ্বত নয়, সব কিছুই অনিত্য এবং ক্ষণিক, যেহেতু চিন্ময় সত্তারূপে কোন আত্মা নেই। বৌদ্ধধর্মেও ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। অতএব চার্বাক, জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক, যেহেতু এরা কেউ বেদের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য স্বীকার করে না।

জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী

চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে বেদের প্রাধান্য অস্বীকার

এই প্রসঙ্গে বেদ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। ভারতীয় চিন্তাধারার সূচনা ও ক্রমবিকাশের পথে বেদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। বেদ ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্য এবং পরবর্তী কালের

চিন্তাধারা—বিশেষ করে দার্শনিক ধারণা, বেদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে যে সব দর্শন বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের মধ্যে দুটি দর্শন অর্থাৎ মীমাংসা এবং বেদান্ত প্রত্যক্ষভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় চিন্তাধারায় বেদের স্থান

বেদের মন্ত্রগুলির দুটি দিক আছে—একটি কর্মের দিক এবং অপরটি জ্ঞানের দিক। মীমাংসা দর্শন বেদের যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতাই প্রমাণ করেছে এবং বেদান্ত দর্শন বেদের জ্ঞানের দিকটি অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ, জীবাত্মার ও পরমাত্মার সম্পর্ক প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বগুলি যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে আলোচনা করেছে। মীমাংসা এবং বেদান্ত উভয়ই সাক্ষাৎ ভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে, সময় সময় উভয়কেই একই নামে অর্থাৎ মীমাংসা নামে অভিহিত করা হয়; তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ করার জন্য প্রথমটিকে বলা হয় 'পূর্ব মীমাংসা' বা 'কর্ম-মীমাংসা' এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'উত্তর-মীমাংসা' বা 'জ্ঞান মীমাংসা'। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা মীমাংসা দর্শন বলতে কর্ম-মীমাংসাকেই বুঝে থাকি এবং শেষোক্ত দর্শনকে বেদান্ত নামেই অভিহিত করে থাকি।

মীমাংসা বেদের কর্মের দিক ও বেদান্ত বেদের জ্ঞানের দিক সম্পর্কে আলোচনা করে

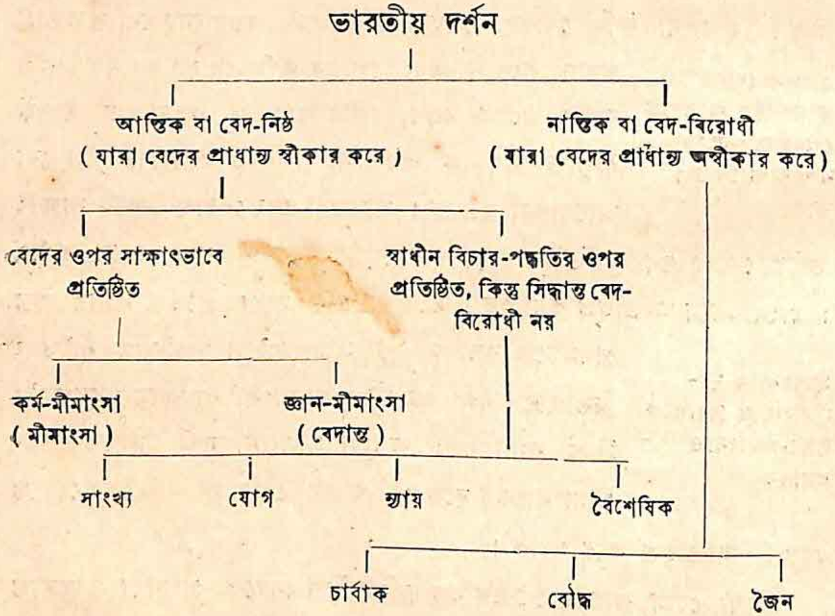
মীমাংসাকে পূর্ব-মীমাংসা ও বেদান্তকে উত্তর-মীমাংসাও বলা হয়

সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন যদিও বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে তবু এই সব দর্শন দার্শনিক আলোচনায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পদ্ধতি অনুসরণ করে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজ নিজ যুক্তি পদ্ধতির সহায়তায় এই সব দর্শন নিজেদের মতবাদগুলি আলোচনা করে এবং নিজ নিজ দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে। বেদের প্রাধান্য এরা অস্বীকার করেনি বরং এরা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে নিজ নিজ স্বাধীন পদ্ধতি ও যুক্তি-তর্ক অনুসরণ করলেও এদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বেদের সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়, বরং বেদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এদের সিদ্ধান্তের অনেকটা সামঞ্জস্য এবং মিল

সাংখ্য, যোগ. ন্যায় এবং বৈশেষিক নিজ নিজ স্বাধীন চিন্তা-পদ্ধতি অনুসরণ করে

আছে। এই সব দর্শন যদিও মীমাংসা এবং বেদান্তের মত সাক্ষাৎভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তবু বেদের প্রাধান্যকে স্বীকার করার জন্য এগুলিকে আস্তিক দর্শন বলা হয়।

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখাগুলিকে নীচে ছকের সাহায্যে দেখান হচ্ছে :



৪। ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগের বিচার (Consideration of some charges levelled against Indian Philosophy) :

ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ কতকগুলি অভিযোগ আনা হয়। ভারতীয় দর্শনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে হলে এই সব অভিযোগগুলিকে বিচার করে দেখা প্রয়োজন এবং এই সব অভিযোগের মূলে কতখানি সত্যতা আছে তা নির্ধারণ করা দরকার। ভারতীয় দর্শনের

বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় তার মধ্যে যেগুলি প্রধান, সেগুলিই আমরা নীচে এক একটি করে আলোচনা করছি :

(ক) ভারতীয় দর্শন বিচারবিযুক্ত দর্শন (Indian Philosophy is dogmatic) : ভারতী দর্শনের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় তার মধ্যে একটি প্রধান অভিযোগ হল ভারতীয় দর্শন বিচারবিযুক্ত দর্শন। বিচারবিযুক্ত দর্শন বলতে কি বোঝায় তাই সর্বপ্রথম আলোচনা করা যাক। সাধারণতঃ, তাদেরই বিচারবিযুক্ত দার্শনিক বলা হয় যারা মানুষের জ্ঞানের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং তার সীমা সম্পর্কে কোন বিচার না করেই তত্ত্বালোচনা শুরু করে দেয় এবং কতকগুলি মনগড়া সিদ্ধান্তে পৌছয়। এই জাতীয় দর্শন স্বাধীন চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ না করে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা থেকেই সিদ্ধান্ত গঠন করে। বিনা বিচারে এরা অনুশাসন বাক্য (Dogma) গ্রহণ করে এবং সেগুলির অকাট্যতা স্থাপনে প্রয়াসী হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, এ জাতীয় দর্শনে স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ হল গৌণ এবং গৃহীত মতের সত্যতা বিনা বিচারে স্বীকার করে নেওয়া বা তাকে ব্যাখ্যা করা ও প্রতিষ্ঠা করাই হল মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিচারবিযুক্ত দর্শন স্বাধীন চিন্তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়

যেহেতু অনেক ভারতীয় দর্শন বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে এবং বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে মনে করে, সেহেতু অভিযোগকারীরা বলেন যে, ভারতীয় দর্শন স্বাধীন চিন্তা বা যুক্তিতর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বেদকে ব্যাখ্যা করা, বেদের অনুশাসন ও উপদেশবাণীকে বিনা বিচারে গ্রহণ ও প্রচার করাই ভারতীয় দর্শনের একমাত্র কাজ। এই সব অভিযোগকারী যে কেবলমাত্র আস্তিক দর্শন, অর্থাৎ যেগুলি বেদকে প্রামাণিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করে, সেগুলিকেই বিচারবিযুক্ত দর্শন বলেই অভিহিত করে, তা নয়; যেগুলি নাস্তিক দর্শন অর্থাৎ যে সব দর্শন বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় বা যেগুলি বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে না সেগুলিকেও বিচারবিযুক্ত দর্শন বলে মনে করে। নাস্তিক দর্শন সম্পর্কে তাদের বক্তব্য এই যে এগুলি বেদের

অভিযোগকারীদের দৃষ্টিতে আস্তিক ও নাস্তিক উভয় দর্শনই বিচারবিযুক্ত দর্শন

অনুশাসনকে অভ্রান্ত বা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে না সত্য, কিন্তু এসব দর্শনও বিনা বিচারে মহাপুরুষ ও ধর্মপ্রবর্তকদের বাণী ও উপদেশাবলীকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে নেয়। যেমন, বৌদ্ধ দার্শনিক ও জৈন দার্শনিকেরা যথাক্রমে বুদ্ধদেব ও মহাবীরের অনুশাসন বা উপদেশাবলীকে অভ্রান্ত সত্য বলে গ্রহণ করে এবং ঐ সব অনুশাসন তাদের দার্শনিক আলোচনার সীমা নির্দেশ করে দেয়। অপরের অনুশাসন বা উপদেশই যদি বিচারের পথ নির্ধারণ করে, তবে স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিতর্কের অবকাশ কোথায়? সুতরাং ভারতের আস্তিক ও নাস্তিক উভয় দর্শনই সমানভাবে বিচারবিযুক্ত দর্শন।

এবার ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ কতখানি যুক্তিগ্রাহ্য বিচার করা যাক্। সর্বপ্রথমেই একথা বলা যেতে পারে, ভারতীয় দর্শনের মধ্যে একাধিক দর্শনই তত্ত্বালোচনার পূর্বে জ্ঞান-সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমস্যাগুলি; যেমন—জ্ঞানের প্রকৃতি, জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞানের পরিধি ও জ্ঞানের যাথার্থ নিয়ে আলোচনা করেছে। কিন্তু বিচারবিযুক্ত দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করে কতকগুলি মনগড়া মতকে সত্য বলে প্রচার করা।

নাস্তিক দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগের যৌক্তিকতা বিচার

দ্বিতীয়তঃ, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এই সব নাস্তিক দর্শন বেদকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করে না বা বেদের অনুশাসনগুলিকে অভ্রান্ত বা প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে না। স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে এরা নিজ নিজ দার্শনিক মতগুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে। চার্বাক দর্শন প্রত্যক্ষণকে একমাত্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করে এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের আপ্তবচনকে প্রমাণরূপে তারা কখনও গ্রহণ করেনি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতই তাদের দার্শনিক আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। বৌদ্ধ দর্শনও স্বাধীন বিচার ও যুক্তিতর্কের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। একথা সত্য যে বৌদ্ধধর্মের সমর্থকবৃন্দ বুদ্ধদেবের প্রচারিত বাণীকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের ব্যাখ্যার জন্যে বুদ্ধদেবের অনুশানকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ না করে তাকে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিতর্কের ওপরই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জৈনদর্শনের তত্ত্বালোচনাও

চার্বাক দর্শন আপ্তবচনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করে না

স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তি তর্কের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের দার্শনিক মতামতের ওপর এই সব তত্ত্বালোচনার ভিত্তি নয়।

এবার দেখা যাক আস্তিক দর্শনগুলির বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ কতখানি যুক্তিযুক্ত। ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন যদিও বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে, তবু এই সব দর্শন সাক্ষাৎভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই সব দর্শন স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করেই নিজ নিজ দার্শনিক মতগুলি প্রতিষ্ঠা করেছে। বেদের কথা ব্যাখ্যা বা প্রমাণ করাকে এরা নিজেদের কাজ বলে মনে করেনি। এরা দেখিয়েছে যে যুক্তিতর্ক, বিচার বিশ্লেষণের সহায়তায় এরা যে সব দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, সেগুলি বেদ-বিরোধী নয়। বেদের সঙ্গে যদি তাদের ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় বা বেদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি তাদের সিদ্ধান্তের কোন মিল থাকে, তাহলে তাদের চিন্তার বা ভাবনার কোন স্বাতন্ত্র্য নেই—এই সিদ্ধান্ত করা সমীচিন নয়।

আস্তিক দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার

ষড়দর্শনের মধ্যে মীমাংসা ও বেদান্তই সাক্ষাৎভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় দর্শনেরই কাজ হল বেদের কথা ব্যাখ্যা করা ও প্রমাণ করা। সুতরাং ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে বিচারবিযুক্ততার অভিযোগটি প্রধানতঃ এদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই অভিযোগও অযৌক্তিক।

প্রথমতঃ, বলা যেতে পারে যে উভয় দর্শনই যদিও বেদকে প্রামাণিক শাস্ত্র (Authority) হিসেবে গ্রহণ করেছে, তবু তারা যে সব দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেগুলি স্বাধীন যুক্তিতর্কের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ, বেদান্ত দর্শনের সূক্ষ্ম জটিল যুক্তিতর্ক, সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিচার-বিশ্লেষণই বেদান্ত দর্শনের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। মীমাংসা ও বেদান্ত বেদ-নির্ভর এবং বেদকে কেন্দ্র করেই তাদের আলোচনা শুরু—এ কথা সত্য, কিন্তু যে সকল বৈদিক তত্ত্বকে তারা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করছে, তাদের যদি অপসারিত করা হয়, তাহলেও স্বাধীন বিচার ও যুক্তিতর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে তাদের

মীমাংসা ও বেদান্তও স্বাধীন যুক্তিতর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত

সিদ্ধান্তগুলি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে এবং যুক্তিতর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন অন্য দর্শনের সঙ্গে সমানভাবে তুল্য হতে পারবে।

তাছাড়া, যদি দেখা যায় যে, বেদান্ত ও মীমাংসার সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিগ্রাহ্য হবার পরও মহাপুরুষ ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাহলে তাতে সে সব দর্শনের মূল্য কমে যায় না, বরং বেড়েই যায়। এই উভয় দর্শনেরই আলোচ্য বিষয়বস্তু হল ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ এবং আধ্যাত্মিক সত্য। ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র অলস তত্ত্বালোচনা নয়, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, সত্যের দর্শন। সেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিদের এই সব আপ্তবচন অবহেলার বস্তু নয়। সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সুযোগ তাদের হয়েছিল, সেহেতু তত্ত্বের যুক্তিসম্মত আলোচনার ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য গ্রহণে বাধা কোথায়? তাছাড়া, এই সব সত্যদ্রষ্টা ঋষি এই কথাই প্রচার করেছেন যে, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা সত্যদর্শন সকলেরই আয়ত্তের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের একটি কথা খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "সাধারণ লোকের কাছে যা অনুশাসনবাক্য, শুচি হৃদয়ের কাছে তাই অভিজ্ঞতাস্বরূপ"।[1]

বেদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্য যুক্তিবিরোধী নয়

অবশ্য একথা সত্য যে কোন দর্শনের ওপর পরবর্তীকালে বিভিন্ন দার্শনিক যখন ভাষ্য রচনা করেন, তখন তাঁদের আলোচনার মধ্যে কিছুমাত্রায় দার্শনিক গোঁড়ামি দেখা দেয়। তাহলেও সমগ্র ভারতীয় দর্শনকে বিচারবিযুক্ত দর্শন নামে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় দর্শন বিচারবিযুক্ত দর্শন নয়। ভারতীয় দর্শন যুক্তিতর্কের ওপরই প্রতিষ্ঠিত; বস্তুতঃ, ভারতীয় দার্শনিকদের আদর্শই হল যা যুক্তিযুক্ত তাই গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া, নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতীয় দার্শনিক প্রতিপক্ষের বক্তব্য বিষয়কেও বিচার করে দেখে। সুতরাং ভারতীয় দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী অন্ধ গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে বিচার-বিশ্লেষণ না করে অপরের গৃহীত মতকে ব্যাখ্যা করা নয়,

1. "What is dogma to the ordinary man is experience to the pure in heart." —S. Radhakrisnan : Indian Philosophy, Vol. I. Page 51.

বরং স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, বিচার ও বিশ্লেষণ করে সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী হওয়া।

(খ) ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী (Indian Philosophy is pessimistic): ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হল যে ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী। দুঃখবাদ অনুসারে এই জগৎ ও জীবনে কোন সুখ ও আনন্দ নেই; জীবন হল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে পূর্ণ। দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যের বেদনায় মানুষের কাতরতার সীমা নেই। প্রতি মানুষ ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অধীন এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে কেবল দুঃখের অনলে দগ্ধ হচ্ছে। সমালোচকদের মতে ভারতীয় দার্শনিক কেবল জীবনের এই অন্ধকারময় রূপটিকেই তাদের দর্শনে চিত্রিত করেছেন।

জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে পূর্ণ—এই মতবাদই দুঃখবাদ

সমালোচকদের এই অভিযোগ যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, ভারতীয় দার্শনিকরা দর্শনের সঙ্গে মানুষের জীবনের নিগূঢ় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ, ভারতীয়দের কাছে দর্শন কেবলমাত্র তত্ত্বালোচনা নয়; তাদের মতে দর্শন হল জীবনকে যথাযথভাবে পরিচালিত করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছিয়ে দেওয়ার পন্থা। তাই বাস্তব জীবনের দিকে তাকিয়ে ভারতীয় দার্শনিকরা জীবনের দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণার কথা অস্বীকার করতে পারেননি। বৌদ্ধদর্শনে এই দুঃখবাদের এক সুস্পষ্ট রূপ দেখতে পাই। বৌদ্ধদর্শনে বলা হয়েছে 'সর্বং দুঃখম্'—সকলই দুঃখময়। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, রোগ দুঃখ, মরণ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, অপ্রিয়সংযোগ দুঃখ, কামনার ব্যাঘাত দুঃখ।[1] এ জগতের সবই দুঃখপূর্ণ। পৃথিবীতে যে সুখ নেই তা নয়, তবে 'দুঃখোদর্ক সুখ'। প্রত্যেক সুখই দুঃখোদর্ক, অর্থাৎ সকল সুখের মাঝেই দুঃখের বীজ

অভিযোগের খণ্ডন

ভারতীয় দর্শনে জীবনের সঙ্গে দর্শনের নিগূঢ় সম্পর্ক

বৌদ্ধদর্শনে পাই দুঃখবাদের সুস্পষ্ট রূপ

1. জাতি পি দুক্‌খা, জরা পি দুক্‌খা, ব্যাধি পি দুক্‌খা, মরণং পি দুক্‌খং, সোক-পরিদেব-দুক্‌খদোমনস্স-উপায়াসা পি দুক্‌খা, যং পি ইচ্ছং ন লভতি তং পি দুক্‌খং, সংক্‌খিত্তেন পঞ্চুপাদানক্‌খন্ধা দুক্‌খা—"মহা সতিপত্তানসুত্ত"।

প্রচ্ছন্ন আছে। এ ছাড়া 'সর্বং অনিত্যঃ', সবই অনিত্য। বুদ্ধদেব বলেন, 'যৎ অনিত্যং তৎ দুঃখম্' 'যা অনিত্য তাই দুঃখ'। শুধু বৌদ্ধ দর্শনে নয়, উপনিষদে এবং গীতায়ও আমরা এই দুঃখবাদ দেখতে পাই। উপনিষদের মতে সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ছাড়া আর সবই দুঃখময়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই জগৎকে দুঃখের আলয় বলে অভিহিত করেছেন। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব-মীমাংসা এবং উত্তর-মীমাংসা (বেদান্ত), ষড়দর্শনের প্রত্যেকটির মধ্যে এই দুঃখবাদ আমরা দেখতে পাই। সাংখ্যকার কপিলের মতে এ জীবনে অনাবিল সুখের স্থান নেই ; জগৎ এবং জীবন উভয়ই দুঃখপূর্ণ। তিনি তিন প্রকার দুঃখের কথা বলেছেন—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।[1] যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলির মতে মানুষ পাঁচ ধরনের ক্লেশে ক্লিষ্ট।[2]

উপনিষদে এবং গীতায় দুঃখবাদ

সাংখ্য ও যোগ দর্শনে দুঃখবাদ

কিন্তু এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় যে দুঃখেই জীবন শুরু, দুঃখেই জীবন শেষ—এই নৈরাশ্যময় জীবনের চিত্র কোন ভারতীয় দর্শনেই আমরা পাই না। বরং সকল ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করেছে যে, দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় আছে এবং মানুষ নিজের চেষ্টায় দুঃখময় জীবন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। বুদ্ধদেব যেমন দুঃখময় জীবনের কথা বলেছেন তেমনই দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি ও দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায়ও নির্দেশ করেছেন। বুদ্ধদেবের মতে 'নির্বাণং পরমং সুখম্'। জীব যখন নির্বাণ লাভ করে তখন সে পরম সুখ লাভ করে, সে ভূমানন্দের অংশীদার হয়।

জীবন দুঃখপূর্ণ হলেও, দুঃখেই মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি নয়

নির্বাণেই পরম সুখ

সাংখ্যকারও বলেন যে, দুঃখ আছে বলেই দুঃখপীড়িত মানুষ দুঃখ নিবৃত্তির উপায় সন্ধান করে এবং তারই ফলে দর্শনের উদ্ভব। সাংখ্য দর্শনে চিরদুঃখ

1. আধ্যাত্মিক দুঃখ—শারীরিক ও মানসিক দুঃখ।
আধিভৌতিক দুঃখ—মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি থেকে যে দুঃখের উদ্ভব হয়। যেমন—জীবহত্যা, সর্পাঘাত।
আধিদৈবিক দুঃখ—ভূত, প্রেত প্রভৃতি অলৌকিক কারণ থেকে যে দুঃখ উদ্ভূত হয়।
2. অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ।

নিবৃত্তির অবস্থাকেই পুরুষার্থ বা শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু বলে নির্দেশ করা হয়েছে। যোগ দর্শনও জাগতিক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য সমাধিকেই শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে নির্দেশ করেছে এবং এই সমাধির দ্বারাই জীব মোক্ষ বা চিরমুক্তি লাভ করে। এই মোক্ষই চিরদুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা। নৈয়ায়িকগণও বলেন যে, দুঃখের মূল উৎস মিথ্যাজ্ঞান এবং সত্যজ্ঞানের সাহায্যে মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হলে জীব অপবর্গ বা মোক্ষলাভ করে। বৈশেষিক দর্শনও স্বীকার করে যে, সত্যজ্ঞান লাভ হলেই সব দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে। বেদান্তে বলা হয়েছে যে, অবিদ্যাই দুঃখের মূল এবং ব্রহ্মই সত্যজ্ঞান, আনন্দ ও অমৃতস্বরূপ। ব্রহ্মজ্ঞানই অবিদ্যাকে দূরীভূত ক'রে মানুষকে ভূমানন্দের অধিকারী করে, মানুষকে পরম শান্তির রাজ্যে উত্তীর্ণ করে।

সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, ন্যায়, বেদান্ত সকলেই দুঃখনিবৃত্তির উপায় নির্দেশ করেছে

এই যদি ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী হয়, তাহলে ভারতীয় দর্শনকে কোন মতেই দুঃখবাদী বলা চলে না। ম্যাক্সমূলার বলেন, "সুতরাং সকল ভারতীয় দর্শনই যখন দুঃখ দূর করতে সমর্থ বলে দাবী করে তখন দুঃখবাদী বলতে সাধারণতঃ যা বুঝে থাকি সেই অর্থে তাদের দুঃখবাদী বলা চলে না।"[1] ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী ত নয়ই, বরং আশাবাদী (optimistic)। ভারতীয় দর্শনের শুরুতে দুঃখ থাকলেও, দুঃখেই তা শেষ হয়নি। ম্যাক্সমূলারের মতে জগতে দুঃখের উপস্থিতিই তাদের দার্শনিক চিন্তার প্রথম প্রেরণা যোগায়।[2] ভারতীয় দার্শনিকরাই দুঃখপীড়িত, ক্লেশ-জর্জরিত মানুষকে প্রথম আশার বাণী শুনিয়েছেন।

ম্যাক্সমূলারের অভিমত

উপনিষদের ঋষিই দুঃখ ও মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষকে উদ্দেশ করে বলেছেন যে, অজ্ঞানান্ধকারের পরবর্তী সেই জ্যোতিঃ স্বরূপ সর্বব্যাপী পুরুষকে জেনেই

1. "If, therefore, all Indian philosophy professes its ability to remove pain, it can hardly be called pessimistic in the ordinary sense of the word" —Max Muller : Six Systems of Indian Philosophy. Page 108

2. "They simply state that they received the first impulse to philosophical reflection from the fact that there is suffering in the world."

—I bid. Page 106

মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে। এ ছাড়া মৃত্যু উত্তরণের অপর কোন পথ নেই। অতৃপ্ত জীবের অমৃতলাভের প্রার্থনা এই ভারতীয় দার্শনিকের কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছে—"আমায় অসৎ থেকে সৎ-এ, অন্ধকার থেকে আলোতে, মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে নিয়ে চল।"[1] ভারতীয় দার্শনিক শুধু দুঃখকে জানেননি, দুঃখের কারণের অনুসন্ধানও করেছেন। সকল দুঃখের কারণ একই, যাকে বেদান্ত বলেছে অবিদ্যা, সাংখ্য বলেছে অবিবেক, ন্যায় বলেছে মিথ্যাজ্ঞান। অবিদ্যার ফলে মানুষের বদ্ধাবস্থা এবং সত্যজ্ঞানই মানুষকে এনে দেয় চিরমুক্তি বা মোক্ষ। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, "ভারতীয় দার্শনিকরা দুঃখবাদী, যেহেতু তারা এ জগতকে মন্দ ও মিথ্যা বলে অভিহিত করে; কিন্তু তারা আশাবাদী, যেহেতু তারা অনুভব করে যে, এ জগত থেকেই সত্যের রাজ্যে উত্তীর্ণ হবার পথ আছে এবং এই সত্যই হল মঙ্গল।"[2]

উপনিষদের ঋষির আশার বাণী

রাধাকৃষ্ণণের অভিমত

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী নয়, আশাবাদী। ভারতীয় দর্শনের মতে আদিতেই দুঃখ, পরিণামে দুঃখ নিবৃত্তি, মুক্তি বা মোক্ষ। দুঃখই জীবনের শেষ কথা নয়; সাধনার দ্বারা সত্যোপলব্ধিই হল মানব-জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং সত্যোপলব্ধির আনন্দই মানুষের এই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, দুঃখপূর্ণ জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলে।

দুঃখই শেষ কথা নয়, সত্যের উপলব্ধিতেই জীবনের সার্থকতা

(গ) ভারতীয় দর্শন কেবল নীতি ও ধর্মে সীমাবদ্ধ (Indian Philosophy is ethico-religious): ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হল যে, ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র নীতি ও ধর্মবিষয়ক আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। এতে কেবলমাত্র জীবন-দর্শন আছে, জগদ্দর্শন নেই। এই প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে সব পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকবৃন্দ ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে এই

ভারতীয় দর্শনে জগদ্দর্শন নেই

---

1. "অসতো মা সৎ গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।"

2. S. Radhakrisnan : Indian Philosophy, Vol I. Page 50

অভিযোগ এনেছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথক। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতে এই জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য, অপূর্ব রহস্য মানুষের মনে যে বিপুল বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, তার থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। দার্শনিক প্লেটো বিস্ময়কেই দর্শনের জনক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক জগত ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে জীবন ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে। বিস্ময় বা কৌতূহল নয়, জীবনের লক্ষ্য কি এবং কি ভাবে ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় এই বিষয়ই ভারতীয় দর্শনের প্রধান প্রশ্ন বা সমস্যা। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকরা এ প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে দেখলেন জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, জ্বালা, যন্ত্রণায় মানুষ কাতর ও এই দুঃখের হাত থেকে কি ভাবে মুক্তিলাভ করা যেতে পারে তারই উপায় নির্ধারণ করার জন্য ভারতীয় দার্শনিকরা সচেষ্ট হয়েছেন। এ কারণেই নৈতিক ও ধর্মালোচনা ভারতীয় দর্শনের অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে এবং ভারতীয় দার্শনিক আলোচনা করেছেন মানুষের পুরুষার্থ (Summum bonum) কি এবং কি উপায়ে এই পুরুষার্থ লাভ করা যায়। তার কাছে প্রশ্ন হল : ধর্ম কি ? অধর্ম কি ? সম্যক্ চরিত্র বা আচরণের স্বরূপ কি ? পাপ কর্মের ফলাফল কি এবং দুঃখ থেকে নির্বাণলাভের পথে এই কর্মের ফলাফল কি ভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করে ? উপনিষদের ঋষি বলেন ব্রহ্মের জ্ঞানই মানুষকে সর্ব দুঃখ থেকে মুক্ত করে, যেহেতু অবিদ্যা থেকেই দুঃখের উদ্ভব। তাহলে প্রশ্ন জাগে, ব্রহ্ম কি ? এ জগতের অন্তরালে কি কোন পরমসত্তার অস্তিত্ব আছে ? ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের কি সম্পর্ক ? ব্রহ্মই কি ঈশ্বর ? ঈশ্বর আমাদের জীবনকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন ? এভাবে নীতি ও ধর্মের আলোচনাতেই ভারতীয় দার্শনিকরা প্রবৃত্ত হয়েছেন।

বিস্ময় নয়, দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছাই ভারতীয় দর্শনের উৎস

ভারতীয় দর্শনে নীতি ও ধর্মের আলোচনা

ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত নয়। যদিও ভারতীয় দর্শন নীতি ও ধর্মের আলোচনার ওপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছে তবু একথা সত্য নয় যে, ভারতীয় দর্শনে জগত সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, মীমাংসা ও যোগ নীতি এবং

ধর্ম ব্যতীত অন্য তত্ত্বালোচনাও তাদের দর্শনে করেছে। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত নিছক তত্ত্বালোচনায় ভারতীয় দার্শনিকদের আগ্রহ না থাকলেও ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র নীতি ও ধর্মে সীমাবদ্ধ নয়।

ভারতীয়ের দৃষ্টিতে দর্শন হল 'সত্য দর্শন', সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, যথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞান শুধু এই জীবনের নয়, জগতেরও। এ জগত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও নির্ভুল জ্ঞানই মানুষকে এ জগতে তার নিজের স্থান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দেয় ও মানুষ উপলব্ধি করে কী তার কাম্য, কী তার পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ লাভই তার ধর্ম, তার জীবনের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্য প্রয়োজন নিজের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করা, নিজের চিত্তবৃত্তিকে সংযত করা। সম্যক জ্ঞান ও সম্যক আচরণ— এই উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক। সুতরাং জগত এবং জীবন এই উভয়ের স্বরূপ ও মূল্য অবধারণই দার্শনিকের কাজ। ভারতীয় দর্শনে তাই কেবল জীবনের ব্যাখ্যাই নেই, এই জগতেরও ব্যাখ্যা আছে।

নীতি ও ধর্মের সঙ্গে দর্শনের গভীর যোগ আছে

ভারতীয় দর্শনে জীবনের ও জগতের উভয়েরই ব্যাখ্যা আছে

আমরা আগেই দেখেছি যে, ভারতীয় দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গীকে বলা হয়েছে সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী (Synthetic outlook)। পৃথক পৃথক ভাবে নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র বা তত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা না করে ভারতীয় দার্শনিক একই দার্শনিক প্রশ্নকেই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করেছেন। সেই কারণে একই বিষয়ের আলোচনায় নীতি, ধর্ম ও তত্ত্ব সব আলোচনাই পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। সুতরাং ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র নীতি ও ধর্মশাস্ত্র নয়; ভারতীয় দর্শন হল জীবনদর্শন, জগদ্দর্শন— সংক্ষেপে সত্য-দর্শন বা সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

ভারতীয় দর্শনের সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী

2 **(ঘ) ভারতীয় দর্শন নীতি-নিস্পৃহ দর্শন (Indian Philosophy is non-ethical in character):** ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে কেউ কেউ এমন অভিযোগ এনেছে যে, ভারতীয় দর্শন নৈতিক কর্ম-বিমুখতার দর্শন। অর্থাৎ ভারতীয় দর্শনে নৈতিক কর্ম-সম্পাদন করার ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। তাদের মতে এর কারণ

ভারতীয় দর্শন কেবল মোক্ষ দর্শন

হল ভারতীয় দর্শন মোক্ষ দর্শন। ভারতীয় সাধনা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সাধনা এবং এরই অনিবার্য পরিণতি হল নৈতিক ও সামাজিক কর্মবিমুখতা এবং পার্থিব জগত ও জীবনের প্রতি নিস্পৃহতা। প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনেই আত্মার মোক্ষ লাভকেই জীবের পুরুষার্থ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। জীবের বদ্ধাবস্থাই তার সব দুঃখের কারণ এবং এই বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করাই তার একমাত্র কাম্য বস্তু। অবশ্য আত্মার বন্ধন ও মোক্ষকে বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে যে আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও মুক্ত, আত্মা সনাতন। কর্মের জন্যেই আত্মাকে দেহ ধারণ করতে হয় ও দেহ ধারণের জন্যই আত্মার বন্ধন সূচিত হয়। বৌদ্ধদর্শনেও সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য নির্বাণের কথা বলা হয়েছে। নির্বাণ লাভ করার ফলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। পূর্বজন্মে কৃত সকাম কর্মই বর্তমান জীবন ধারণ করার কারণ স্বরূপ। সাংখ্য দর্শনেও বলা হয়েছে যে, প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগেই দুঃখ ও বন্ধন; এই সংযোগের অবসানেই পুরুষের মুক্তি। জগতের প্রতি নিস্পৃহ ভাব ও ভোগ লালসার প্রতি বিতৃষ্ণা যখন জীবের মনের বৈরাগ্যের সঞ্চার করে তখনই তার মধ্যে বিবেকজ্ঞান জন্মে এবং তখনই সে পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে— যে পুরুষ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য। যোগ দর্শনেও আত্মোপলব্ধিকেই মোক্ষরূপে অভিহিত করা হয়েছে এবং সমাধি বা যোগের সাহায্যেই এই মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়। মীমাংসকদের মতে বৈদিক কর্ম সম্পাদন করেই মানুষ তার পুরুষার্থ অর্থাৎ স্বর্গকে প্রাপ্ত হয়। মীমাংসকদের মতে আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের উপায়। ন্যায় দর্শনেও বলা হয়েছে যে আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ বা অপবর্গ এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই এই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। বেদান্তেও বলা হয়েছে যে, জীব স্বরূপতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত; অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার জন্যই তার বদ্ধাবস্থা। যথার্থ জ্ঞানই জীবকে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত করে।

বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তির বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ভারতের প্রায় সকল দর্শনই মোক্ষ বা মুক্তিকেই জীবের পুরুষার্থ বলে নির্দেশ করেছে। নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই এই মোক্ষলাভ সম্ভব হয়। জাগতিক সুখ-দুঃখে যে ব্যক্তি উদাসীন, ভোগ, কামনা-বাসনার প্রতি যার বিতৃষ্ণা, অর্থাৎ যার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়েছে, তিনিই নিষ্কাম কর্ম করে মোক্ষলাভ করতে সক্ষম।—এই দৃষ্টিভঙ্গীই নাকি ভারতীয় দার্শনিককে কর্মবিমুখ করে তুলেছে। মোক্ষলাভের জন্য তত্ত্বজ্ঞান, যোগ বা সমাধি, শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসনই প্রশস্ত পথ। বেদনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন এবং ঈশ্বর ভজনই মুক্তিলাভের উপায়। এ কারণেই সমালোচকরা বলেন যে, ভারতীয় দর্শন নৈতিক কর্মবিমুখতার দর্শন।

নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মোক্ষলাভই জীবের যথার্থ পুরুষার্থ

কিন্তু ভারতীয় দর্শনের গভীরে প্রবেশ করলেই এ যুক্তির অসারত্ব উপলব্ধি হয়। জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শনকে নৈতিক কর্মবিমুখতার দর্শন কোন মতেই বলা চলে না। জৈন দর্শনে মোক্ষলাভের জন্য কেবলমাত্র সম্যক দর্শন (Right insight), সম্যক জ্ঞান (Right knowledge)-কেই স্বীকার করা হয়নি, সম্যক চরিত্র (Right conduct)-কেও স্বীকার করা হয়েছে। সম্যক চরিত্র অর্থে সৎ কর্ম সম্পাদন করা এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকা। বৌদ্ধ দর্শনেও নির্বাণ লাভের জন্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্যক কর্মান্ত (Right conduct) এবং সম্যক আজীব (Right livelihood)—এই উভয়কে স্বীকার করা হয়েছ। সম্যক কর্মান্ত অর্থে সৎ কর্ম সম্পাদন করা; যেমন—চুরি না করা, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি থেকে বিরত থাকা ও প্রাণী হত্যা না করা, এবং সম্যক আজীব অর্থে সৎ পথ অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করা।

অভিযোগের অসারতা

বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে

সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে যে অজ্ঞানতাই দুঃখের মূল। যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যেই এই অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। কিন্তু সাংখ্যকার এ কথাও স্বীকার করেছেন যে সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যদি চিত্ত শুদ্ধ ও পবিত্র না হয়, তাহলে চিত্তে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয় না। যোগ দর্শনে যোগ সাধনার

কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই সাধনার পথে অগ্রসর হতে হলেই সর্বপ্রথম চিত্তের পবিত্রতা ও শুদ্ধতা প্রয়োজন। ক্রোধ, হিংসা, লোভ, রাগ প্রভৃতি রাজস ও তামস বৃত্তিগুলিকে বর্জন করে সাত্বিক বৃত্তিগুলিকে—যেমন মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতিকে চিত্তে জাগ্রত করতে হবে। সংযত জীবন যাপন ও অসৎ প্রবৃত্তির নিরোধই চিত্তের শুদ্ধতা আনয়ন করে। যোগ শাস্ত্রের অষ্ট মার্গের মধ্যে যম ও নিয়মে নৈতিক শুচিতার কথাই বলা হয়েছে। অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ হল যম। নিয়মের অর্থ সৎ অভ্যাস অর্জন করা। মুমুক্ষু ব্যক্তিকে অহিংস হতে হবে, সত্য-নিষ্ঠ হতে হবে ও ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে এবং পরের দ্রব্য অপহরণ করা ও বিনা প্রয়োজনে কোন দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত হতে হবে।

সকল ভারতীয় দর্শনই নৈতিক শুচিতা ও চিত্তের শুদ্ধিতা ও পবিত্রতার ওপর জোর দিয়েছে

মীমাংসা দর্শনে যদিও স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য বৈদিক কর্ম সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে, তবু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মগুলি 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সম্পাদন' এই নীতি অনুসারে সম্পাদন করতে হবে। তাছাড়া, ইন্দ্রিয় সংযম, ভোগ লালসার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন করা থেকে বিরত হওয়া যে পুরুষার্থ লাভের পক্ষে অপরিহার্য—এ সত্যও মীমাংসকগণ স্বীকার করেছেন। ন্যায় দর্শনেও বিহিত কর্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনের ফলাফলের কথা বলা হয়েছে। বিহিত কর্ম সম্পাদনে ধর্ম উৎপন্ন হয় এবং তার ফল সুখ; নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনে অধর্ম উৎপন্ন হয় এবং তার ফলাফল দুঃখ। বেদান্তে ব্রহ্মজ্ঞানকেই মোক্ষলাভের উপায় বলা হলেও, যিনি মুমুক্ষু তাকে ইন্দ্রিয় সংযম ও মনঃস্থির করতে হবে এবং ভোগ বিমুখ হতে হবে। মুমুক্ষু ব্যক্তির শম, দম, তিতিক্ষা ও শ্রদ্ধা থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

সুতরাং দেখা যায় যে, ভারতীয় দর্শন নৈতিক কর্মবিমুখতার দর্শন নয়; যদিও ভারতীয় দর্শন অবিদ্যা ও অজ্ঞানতাকেই সর্বপ্রকার দুঃখের মূল বলে স্বীকার করে এবং যথার্থ জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের পরিপূরক মনে করে, তবু প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনেই নৈতিক ও সামাজিক কর্ম সম্পাদনের ওপর

গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চিত্তের শুদ্ধিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, সৎকর্ম সম্পাদন, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা, ভোগবিমুখতা, সংক্ষেপে নৈতিক জীবন যাপনের ওপরই জীবের মোক্ষলাভ একান্তভাবে নির্ভর। যদিও মোক্ষই ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থ, তবু চতুর্বর্গের অপর তিনটিকে—ধর্ম, অর্থ, কামকে ভারতীয় দর্শন উপেক্ষা করেনি। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের মতে ভারতীয় দর্শনে ধর্মের ধারণা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা। নৈতিক পূর্ণতা ঈশ্বর জ্ঞানের প্রথম স্তর।

সকল ভারতীয় দর্শনেই নৈতিক কর্ম সম্পাদনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে

(৬) ভারতীয় দর্শন গতিহীন বা নিশ্চল (Indian Philosophy is stationary) : ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ হল যে, ভারতীয় দর্শন গতিহীন বা নিশ্চল। ভারতীয় দর্শনে একই বিষয়ের গতানুগতিক আলোচনাই দৃষ্ট হয়। চিন্তার ক্ষেত্রে কোন অভিনবত্বের বিকাশ নেই।

এ অভিযোগও যুক্তিযুক্ত নয়। যদি অভিযোগকারীরা একথা বলতে চান যে, বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের আলোচ্য বিষয় মোটামুটি একই, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, সকল দর্শনেরই ক্ষেত্রে কি এই গতিহীনতা চোখে পড়ে না? ঈশ্বর, স্বাধীনতা, অমরত্ব—সেই অতি পুরাতন সমস্যা এবং তার পুরাতন সমাধানগুলিই বারে বারে আলোচিত হয়েছে; এবং এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সত্য এক ও অখণ্ড এবং তার প্রকাশও সর্বক্ষেত্রে একই রকমের।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তু ও সমাধানের সাদৃশ্য প্রমাণ করে সত্য এক ও অখণ্ড

যদি অভিযোগের অর্থ হয় এই যে ভারতীয় দার্শনিকরা অতীত ও প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সে কারণেই পুরাতন বিষয়গুলিকেই কেবলমাত্র নতুনভাবে গ্রহণ করছেন তাহলে বলতে হয় যে, ভারতীয় চিন্তাধারার এ হল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় চিন্তাধারার বিকাশের বৈশিষ্ট্যই হল পুরাতন বা অতীতের যা ভাল তাকে গ্রহণ করা এবং নতুন বিষয়কে তার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া।

ভারতীয় চিন্তাধারা পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল

যদি অভিযোগের অর্থ হয় এই যে, ভারতীয় চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে দৃষ্টিপাত করেনি এবং সেহেতু ব্যর্থ, তাহলে বলা যেতে পারে যে, এ অভিযোগও সত্য নয়। বরং একথা বলা যেতে পারে যে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক মতবাদ ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের বিরোধিতা না করে অনেক ক্ষেত্রে তাকে সমর্থনই করছে।

ভারতীয় চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে গ্রহণ না করার জন্য গতিহীন—এ যুক্তি অচল

ভারতীয় দর্শনের অগ্রগতির পথে অবশ্য কিছুটা নিশ্চলতা দেখি সেই স্তরে যখন ভারতীয় দর্শনের ভাষ্য রচনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তখন চিন্তার ক্ষেত্রে যেমন নির্জীবতা দেখা দিয়েছে, তেমনি ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত হওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন কোন সক্রিয় অবদানের দ্বারা ভারতের চিন্তার ভাণ্ডার নতুন সম্পদে পূর্ণ হতে পারেনি। অবশ্য পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য দার্শনিকদের নতুন চিন্তাধারা ভারতীয় দর্শনের এই নিশ্চল অবস্থার অবসান করে ভারতীয় চিন্তাধারাকে পুনরায় গতিশীল করে তুলেছে। যেহেতু ভারতবর্ষ বর্তমানে স্বাধীন এবং স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশের সম্ভাবনা প্রচুর, সেহেতু আশা করা যায় যে, ভারতীয় দার্শনিকরা যদি অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বজায় রাখেন, নতুন চিন্তাধারাকে বরণ করে নেবার উদারতা যদি তাঁদের থাকে এবং সর্বশেষে সত্য উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা যদি তাদের মধ্যে জাগরূক থাকে তাহলে ভারতীয় দর্শন সাময়িক নিশ্চলতা বা গতিহীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে।

ভাষ্যরচনায় পরবর্তীকালে নিশ্চল ভাব

স্বাধীন ভারতীয় দর্শনের অগ্রগতির পথ [illegible] থাকবে

৫। ভারতীয় দর্শনের ক্রমবিকাশ (Development of Indian Philosophy):

ভারতীয় দর্শনের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে প্রধান প্রধান যে সব দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠছিল সেগুলি একটির পর একটি আবির্ভূত হয়েছিল। কোন একটি দার্শনিক মতবাদ কিছুদিন ধরে

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ একের পর এক আবির্ভূত হয়েছিল

সকলের স্বীকৃতি এবং সমাদর লাভ করার পর, নিজের প্রভাব ও প্রাধান্য হারিয়ে নতুন কোন দার্শনিক মতবাদকে তার জায়গাটি ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের ধারা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনগুলি বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হয়েও সুদীর্ঘকাল ধরে নিজ নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রেখে পাশাপাশি বিরাজ করেছে। বিভিন্ন দর্শনের সহ-অবস্থান এবং দীর্ঘকাল সমান ভাবে বিকাশ লাভ করা ভারতীয় দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় দর্শনগুলি একই সময়ে পাশাপাশি বিরাজ করেছে

সে কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, আস্তিক এবং নাস্তিক, জড়বাদী এবং ভাববাদী, নিরীশ্বর এবং সেশ্বর সবরকম দার্শনিক মতবাদই একই সময়ে প্রচারিত হয়েছে এবং একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে; কিন্তু কোন দর্শনই এর জন্য নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য হারায়নি। এর কারণ ভারতীয় দার্শনিকদের কাছে দর্শন নিছক তত্ত্বালোচনা ছিল না, তা ছিল জীবনকে যথাযথভাবে পরিচালিত করার জন্য অন্যতম হাতিয়ার। দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে দার্শনিক মতবাদগুলির ছিল নিবিড় সংযোগ। এজন্য কোন একটি দার্শনিক মতবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদল শিষ্য বা সমর্থকবৃন্দ সেই দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী তাদের জীবন পরিচালনা করার জন্য ব্রতী হত এবং তাদের পরবর্তীকালে তাদের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ সেই মতবাদ অনুযায়ী তাদের জীবনধারা পরিচালিত করত। এইভাবে দার্শনিক মতবাদটি হয়ে উঠত তাদের জীবন-দর্শন এবং শিষ্যদের জীবনধারা ও সক্রিয় প্রচারের মাধ্যমে এক একটি দার্শনিক মতবাদ দার্শনিকের তিরোধানের পরও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হত। এই কারণেই বুদ্ধদেব বা মহাবীরের তিরোধানের পরও অগণিত শিষ্য এবং অনুরাগীবৃন্দের মাধ্যমে উভয় মহাপুরুষের প্রচারিত মতবাদ সুদীর্ঘকাল ধরে প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে বিরাজ করেছে। এখনও ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ—যেগুলির পূর্বের প্রভাব প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে—সক্রিয় এবং অনুরাগী শিষ্যমণ্ডলীর মাধ্যমে বিরাজ করছে।

ভারতীয় দর্শনে দর্শনের সঙ্গে জীবনের গভীর সংযোগ স্বীকার করা হয়েছে

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে বিভিন্ন দর্শনগুলি একই সময়ে বিরাজ করার জন্য পারস্পরিক আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারা পরস্পরের ওপরে প্রভাব বিস্তার করত এবং পরস্পরকে ভালভাবে জানবার সুযোগ লাভ করত। সে কারণে প্রতিটি দর্শন তার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের আনীত অভিযোগগুলি ব্যাখ্যা করে, সেগুলিকে খণ্ডন করে নিজেদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করত। প্রতিটি দর্শনই অপরের অভিযোগগুলিকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করে দেখত। এর ফলে প্রতিটি দর্শন তার নিজ বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার ও নিজের মতামতকে সুদৃঢ় করার সুযোগ লাভ করেছিল। ভারতীয় দর্শনগুলির ক্রমবিকাশের আলোচনায় ভারতীয় দর্শনগুলির এই পারস্পরিক প্রভাবের কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

ভারতীয়র্শদন গুলি পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে

ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তিকাল সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করেই যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। বেদই ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, ভারতীয় চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। কখন বেদ রচিত হয় এবং কারা বেদ রচনা করেছেন—এ নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়নি। বেদকে সকল সময়ই শাশ্বত এবং অপৌরুষেয় বলেই বিশ্বাস করা হয়েছে। বস্তুতঃ, ভারতীয়দের বিশ্বাস, কোন মানুষ বেদ রচনা করেনি, বেদ স্বয়ং ব্রহ্মের বাণী।

বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় চিন্তাধারার প্রথম উদ্ভব

বেদের রচনাকাল সম্পর্কে সকলে একমত নন। ম্যাক্সমূলার খ্রীঃ পূঃ ১২০০ থেকে ৬০০ বৎসরকেই বেদের রচনাকাল বলে নির্দেশ করেছেন। কারও কারও মতে এই রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ থেকে ২৫০০ বৎসর। বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবের পূর্বে যে উপনিষদের চিন্তাধারার বিকাশ শুরু হয়েছিল, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। অনেকে এমন কথা বলেন যে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে দর্শনের যে শুধু বিকাশ ঘটেছিল তা নয়, দর্শনের একটা পরিণত অবস্থাও লক্ষ্য করা যায়।

বেদের রচনাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মত

আমরা ইতিপূর্বে ভারতীয় দর্শনের দুটি ধারার কথা উল্লেখ করেছি একটি আস্তিক দর্শন অর্থাৎ বেদানুগামী এবং অপরটি নাস্তিক, অর্থাৎ বেদবিরোধী।

আস্তিক দর্শনের বিকাশ শুরু হয় বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করে। বেদ এবং উপনিষদের পরই উল্লেখযোগ্য হল সূত্র-সাহিত্য বা দর্শনের সূত্রগুলি। **সূত্র** কথার সাধারণ অর্থ হল সূতা এবং এই প্রসঙ্গে এর অর্থ হল সংক্ষিপ্ত স্মৃতি-সহায়ক বচন বা উপদেশ। যেমন সূতো দিয়ে অনেক ফুলকে একটি মালায় গেঁথে রাখা যায়, অনুরূপভাবে এই সূত্রগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাগুলিকে একত্র গ্রথিত করা হত। এই সূত্রগুলির উৎপত্তির একটি বিশেষ কারণ এই যে, অতীতে দার্শনিক তত্ত্বসমূহ মুখে মুখেই আলোচিত হত এবং মুখে মুখেই গুরুর কাছ থেকেই শিষ্যদের মধ্যে সেগুলি প্রচারিত হত। যেহেতু লিখিত গ্রন্থের অভাব পূর্ণ করার জন্য সূত্রের মাধ্যমে এই দার্শনিক চিন্তাগুলি একত্র গ্রথিত ও সংরক্ষিত করার প্রয়োজন হয়েছিল। সূত্রগুলির মধ্যেই অতি সংক্ষেপে দার্শনিক সমস্যা, দার্শনিকের সিদ্ধান্ত, তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য অভিযোগ এবং এই অভিযোগের উত্তর খুঁজে পাওয়া যেত। এক একটি দর্শন-সূত্রে অনেকগুলি সূত্রকে একসঙ্গে সংকলিত করা হত। এ বিষয়ে **বদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র** একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। বেদের বিশেষ করে উপনিষদের আলোচনাই ব্রহ্মসূত্রে করা হয়েছে। উপনিষদের মতবাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তরও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র ছাড়াও অন্যান্য দর্শনের সূত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে; যেমন জৈমিনির **মীমাংসা** সূত্র, গৌতমের **ন্যায়** সূত্র, কনাদের **বৈশেষিক** সূত্র, পতঞ্জলির **যোগ** সূত্র, কপিলের **সাংখ্য**সূত্র ইত্যাদি।

বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করেই আস্তিক দর্শনের শুরু

সূত্র-সাহিত্যের উদ্ভব

সূত্রের মাধ্যমে দার্শনিক চিন্তার সংরক্ষণ

বদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র

এই সূত্রগুলি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, সে কারণে সূত্রগুলির অর্থ সহজবোধ্য ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক ব্যাখ্যা দেওয়াও অসম্ভব ছিল না। এই কারণে সূত্রগুলির অর্থ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য ভাষ্যকারের প্রয়োজন দেখা দিল। বিভিন্ন দার্শনিকের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এই সব সূত্রের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দর্শনের সূত্রের ভাষ্য রচিত হতে লাগল। অনেক সময় বিভিন্ন দার্শনিক নিজ

ভাষ্যের উদ্ভব

নিজ বিচারবুদ্ধি, যুক্তিতর্ক ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একই দর্শনের সূত্রগুলিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতেন। একমাত্র ব্রহ্মসূত্রের ওপরই শঙ্কর, রামানুজ, মাধব, বল্লভ, নিমবার্ক, বলদেব ও অন্যান্য ব্যক্তিদের ভাষ্য রচিত হয়েছে। এ সব ভাষ্যের মধ্যে শঙ্কর ও রামানুজের ভাষ্য ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ।

টীকার আবির্ভাব

কিছুকাল পরে আবার ভাষ্যেরও ভাষ্যের প্রয়োজন দেখা দিল; সাধারণ ভাবে একে বলা হয় **টীকা**। ভাষ্য যেমন সূত্রের ব্যাখ্যা, টীকা তেমনিই ভাষ্যের ব্যাখ্যা। ভাষ্য এবং টীকা ছাড়াও বিভিন্ন দর্শনের ওপর স্বাধীনভাবে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থের অনেকগুলিই ছন্দে লেখা। এতে রচয়িতা সংক্ষেপে এবং প্রাঞ্জলভাবে মূল বিষয়গুলিকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। **সাংখ্যকারিকা** এ জাতীয় রচনা। এ ছাড়াও কোন কোন দর্শনের ওপর ছন্দে লেখা সাধারণ আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। কুমারিলের **'শ্লোকবর্তিকা'** বা সুরেশ্বরের **'বর্তিকা'** এ জাতীয় রচনা; অবশ্য এগুলির ওপরও ভাষ্য রচিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দর্শনের ওপর গদ্যে লেখা অনেক পরিণত রচনা দেখতে পাওয়া যায়। কোন ক্ষেত্রে হয়ত লেখক কতকগুলি নির্বাচিত সূত্রকে অবলম্বন করেই আলোচনায় এগিয়ে গেছেন বা স্বাধীনভাবে কোন দর্শনের আলোচনা করেছেন। জয়ন্তের **'ন্যায়-মঞ্জরী'** প্রথমোক্ত শ্রেণীর ও মধুসূদন সরস্বতীর **'অদ্বৈতসিদ্ধি'** দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সব রচনা দৃঢ় যুক্তিতর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে রচয়িতাদের উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার পরিচায়ক। অবশ্য এগুলিরও ভাষ্য রচিত হয়েছে।

বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সমালোচনা গ্রন্থ

নাস্তিক দর্শনের বিকাশ একই রূপ

আস্তিক দর্শনের বিকাশের ইতিহাস যেভাবে ঘটেছে নাস্তিক দর্শনের বিকাশও সেইভাবেই হয়েছে। তবে আস্তিক দর্শনের মত নাস্তিক দর্শনের কোন সূত্র ছিল না।

রাধাকৃষ্ণণ[1] ভারতীয় দর্শনের বিকাশের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে চারটি পর্যায়ের কথা বলেছেন:

1. S. Radhakrisnan : Indian Philosophy, Vol. I. Page 56.

(১) বৈদিক যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ বৎসর)।

(২) মহাকাব্যের যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ২০০ অব্দ)। রামায়ণ মহাভারত ছাড়াও বৌদ্ধ, জৈন, শিব, ও বৈষ্ণব চিন্তাধারার উদ্ভব এই যুগেই হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনের চারটি পর্যায়

(৩) সূত্র-যুগ (২০০ অব্দ থেকে এর শুরু)।

(৪) পাণ্ডিত্যের যুগ—এরও শুরু দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে। এই সময়েই শঙ্কর, রামানুজ, কুমারিল, শ্রীধর, মাধব, বাচস্পতি, উদয়ন, ভাস্কর, জয়ন্ত, বিজ্ঞানভিক্ষু এবং রঘুনাথ প্রভৃতি পণ্ডিতদের আবির্ভাব ঘটে।

৬। ভারতীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষণ (The Common characters of the Indian systems):

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে নানা বিষয়ে এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু নানারকম পার্থক্য ও মতভেদ সত্ত্বেও এদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, যেগুলিকে আমরা ভারতীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষণরূপেই অভিহিত করতে পারি। নানারকম বৈষম্যের মাঝেও এই সাদৃশ্যের একটা সংগত কারণ আছে। যে কোন দেশের দর্শনই সে দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ছাপ ধারণ ও বহন করে। সে কারণে যে কোন দেশের দর্শনশাস্ত্রে সে দেশের পরিবেশে যে সব চিন্তা ও ধারণাগুলি বিরাজ করে, তার একটা প্রভাব অজানিতেই সেই দর্শনে মুদ্রিত হয়ে যায়। সুতরাং ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলির মধ্যে নানারকম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা কৃষ্টিগত সাদৃশ্য, একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষণগুলি এবার আমরা একে একে আলোচনা করছি।

কতক বিষয়ে ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান

(ক) ভারতীয় দর্শনগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য হল এই যে সব ভারতীয় দর্শনই জীবনের সঙ্গে দর্শনের নিগূঢ় সম্পর্ককে স্বীকার করে নিয়েছে। সকলেই দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকটির ওপর বিশেষভাবে

গুরুত্ব আরোপ করেছে, জীবন যথাযথ ভাবে পরিচালিত করার জন্য দর্শনের অনুশীলন যে একান্ত প্রয়োজন, তা স্বীকার করেছে। সে কারণে ভারতীয়দের কাছে দর্শন নিছক তত্ত্বালোচনা বা বিস্ময়প্রসূত কৌতূহলের পরিতৃপ্তি নয়, তা হল দূরদৃষ্টি ও অন্তঃদৃষ্টির সহায়তায় মহৎ ও উন্নত জীবনযাপন করা। ভারতীয় দর্শনগুলিতে তত্ত্বালোচনা ছাড়াও মানবজীবনের চরম কাম্য বস্তু বা পুরুষার্থের আলোচনাও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

দর্শনের সঙ্গে জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্বীকার ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য

ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকটির ওপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কোন কোন পাশ্চাত্য সমালোচক ভারতীয় দর্শনকে কেবলমাত্র নীতি ও ধর্মশাস্ত্র বলে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ সমালোচনা যুক্তিগ্রাহ্য নয়।[1] ভারতীয় দর্শনে ব্যবহারিক (practical) এবং তাত্ত্বিক (theoretical) উভয় দিকের ওপরই সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ; তাত্ত্বিক দিকটিকে উপেক্ষা করে আলোচনার পরিসরটিকে সংকুচিত করা হয়নি।

ভারতীয় দর্শনে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ

(খ) শুরুতে দুঃখবাদী হয়েও পরিশেষে আশাবাদী হওয়া ভারতীয় দর্শনগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য। প্রায় সব ভারতীয় দর্শনই কম-বেশী দুঃখবাদী। সাংখ্য, যোগ এবং বৌদ্ধদর্শনে এই দুঃখবাদ সুস্পষ্ট আকারে দেখা দিয়েছে। একটা আধ্যাত্মিক অশান্তি বা অতৃপ্তি ভারতীয় দার্শনিককে দার্শনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে। জগৎকে তারা দুঃখময় দেখেছেন। সর্বং দুঃখম্—সবই দুঃখময়, যাকে সুখ বলে মনে করা হয় তাও দুঃখ। সব সুখের মাঝেই দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। জীবনের সব অভিজ্ঞতাই দুঃখপূর্ণ বা পরিণামে দুঃখ ডেকে নিয়ে আসে। এজন্য সুখ কামনা করে আমরা প্রতারিত হই। এই দুঃখবোধই দার্শনিককে জগতের স্বরূপ এবং মানব জীবনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক জীবনে দুঃখকে স্বীকার করে নিলেও দুঃখেই জীবনের পরিসমাপ্তি এমন কথা বলেনি। বৌদ্ধদর্শনে দুঃখবাদের এক

ভারতীয় দর্শন শুরুতে দুঃখবাদী হয়েও, পরিণামে আশাবাদী

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চরমরূপ চিত্রিত করা হলেও এই বৌদ্ধদর্শনেই নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে এই আশার বাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, মানুষ নিজের চেষ্টায় দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। সব রকম দুঃখ থেকে নিবৃত্তি হল নির্বাণ। জীবনে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে ও দুঃখ নিরোধের উপায় আছে—বুদ্ধদেব প্রচারিত এই আর্য সত্য-চতুষ্টয়ই (four noble truths) ভারতীয় দর্শনের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। ভারতীয় দর্শন দুঃখ নিয়ে শুরু হলেও স্পষ্টই স্বীকার করে যে, দুঃখই জীবনের শেষ পরিণতি নয়। সর্ব দুঃখ নিরোধ বা মোক্ষই জীবনের শেষ পরিণতি।[1] অতএব একথা বলা যেতে পারে যে, শুরুতে দুঃখবাদী হলেও সমাপ্তিতে ভারতীয় দর্শন সুখবাদী।

ভারতীয় দর্শন কর্মবাদে বিশ্বাস করে

(গ) এক হিসেবে ভারতীয় সুখবাদের ভিত্তি হল কর্মবাদ। চার্বাক ব্যতীত সব ভারতীয় দর্শনই কর্মবাদ, সর্বকাল ব্যাপি জন্মান্তরবাদ এবং এক নৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলায় (eternal moral order) বিশ্বাসী। কর্মবাদকে বলা যেতে পারে নৈতিক কার্যকারণবাদ। মানুষ যেমন কর্ম করবে, তাকে তেমন ফল ভোগ করতে হবে। সৎ কাজের ফল পুণ্য এবং সুখ, অসৎ কাজের ফল পাপ এবং দুঃখ। সৎ কাজ এবং অসৎ কাজ এমন এক অদৃষ্ট অর্থাৎ অদৃশ্য শক্তি (unseen potency) উৎপন্ন করে যে, ব্যক্তির কর্মানুযায়ী ভবিষ্যতে তার সুখ এবং দুঃখ আসবেই।

কর্মবাদের ওপর জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত

এই কর্মবাদের ওপরই জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যুর পরে আত্মার পুনর্জন্ম হয় এবং তা নতুন দেহ ধারণ করে। এই মতবাদই জন্মান্তরবাদ। এই জন্মান্তরবাদ কর্মবাদের উত্তরফলস্বরূপ। ভারতীয় দর্শনের মতানুসারে কর্মের ফলভোগ এক জীবনে শেষ না হলে, জীবকে নতুন জন্ম পরিগ্রহ করে ফলভোগের জন্য সংসারে আসতে হয়। কর্ম এবং কর্মের ফলভোগ—এই উভয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বর্তমান। কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে, কর্মফল কখনও বিনষ্ট

1. বিস্তারিত আলোচনার জন্য এই পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হয় না। এ জীবনে না হলেও কোন ভবিষ্যৎ জীবনে শুভ, অশুভ, পাপ পুণ্য,—সব নৈতিক মূল্যই কর্মফলের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে। একে বলা হয়েছে নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণ নিয়ম (Law of the Conservation of Moral Values)। তবে নিষ্কাম কর্মের জন্য জীবকে ফলভোগ করতে হয় না। সকাম কর্মের জন্যই জীবকে জন্মান্তর গ্রহণ করতে হয়।

ভারতীয় দার্শনিক এক সনাতন নৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী

ভারতীয় দার্শনিকরা এক সর্বকালব্যাপি নৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলায় (An eternal moral order) বিশ্বাসী। সর্বত্রই নিয়ম এবং শৃঙ্খলা। ঋগ্‌বেদে এই চিরন্তন ও অলঙ্ঘ্য জাগতিক শৃঙ্খলাকে 'ঋত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই শৃঙ্খলা জাগতিক ও নৈতিক উভয়ই। এই নিয়ম দেবতাদেরও মেনে চলতে হয়, কেহই একে লঙ্ঘন করতে পারে না। এই বিশ্বাসই মীমাংসকদের 'অপূর্ব', ন্যায় বৈশেষিকদের 'অদৃষ্ট' এবং 'কর্মবাদে'র মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই সনাতন নৈতিক শৃঙ্খলা আছে বলেই সৎ কাজ করার ফল পুণ্য ও সুখ, অসৎ কাজ করার ফল পাপ ও দুঃখ। এই

ভারতীয় কর্মবাদ অদৃষ্টবাদ নয়

বিশ্বাসই ভারতীয় দার্শনিককে আশাবাদী করে তুলেছে, যেহেতু জীব নিজের কর্মের দ্বারাই নিজের ভাগ্যকে গঠন করতে পারে। ভারতীয় কর্মবাদ কিন্তু অদৃষ্টবাদ (Fatalism) নয়, কারণ, প্রতিটি জীবই স্বাধীন ইচ্ছা ও পুরুষকারের দ্বারা নিজেকে মহৎ ও উন্নত করে তুলতে পারে।

(ঘ) সব ভারতীয় দর্শনই অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাকেই জীবের বন্ধনের (bondage) ও দুঃখভোগের কারণ মনে করে; এবং জগতের ও আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানই যে জীবকে দুঃখভোগের ও বন্ধনের হাত থেকে চিরমুক্তি এনে দিতে পারে—এই বিশ্বাস করে। শাশ্বত ও চিরমুক্ত আত্মার দেহের অধীনতা স্বীকার করা ও কর্মফল ভোগ করার জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করা এবং জাগতিক দুঃখকষ্ট ও মৃত্যুর অধীন হওয়াই জীবের বন্ধন। এই জন্ম-মৃত্যু-চক্রের হাত থেকে মুক্তিলাভ করা, সংক্ষেপে পুনর্জন্ম বন্ধ করাই

হল মুক্তি বা মোক্ষ। এই জীবনেই নিজের প্রচেষ্টায় এই মোক্ষ লাভ করা যেতে পারে। ভোগতৃষ্ণা, কামনা, বাসনা অর্থাৎ সকাম কর্মই পুনর্জন্মের কারণ। আবার এই ভোগতৃষ্ণা, কামনা ও বাসনার মূলে আছে অবিদ্যা বা জগতের স্বরূপ ও আত্মা সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানের অভাব।

অবিদ্যাই দুঃখভোগ ও বন্ধনের কারণ

(ঙ) প্রায় সব ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করে যে সম্যক্ জ্ঞান বা বিদ্যাই অবিদ্যাকে দূরীভূত করে জীবকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে। কিন্তু কেবলমাত্র সত্যের ধ্যানই সত্য উপলব্ধিকে যথার্থ করে অবিদ্যাকে দূরীভূত করতে পারে। যোগ দর্শনে যোগ সাধনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যোগদর্শন ছাড়াও বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক এবং বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনেও সত্যের ধ্যানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মোক্ষলাভের পথ অতি দুর্গম। মনের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসগুলি বহু গভীরে তাদের মূলগুলিকে প্রোথিত করেছে সেগুলিকে উৎপাটিত করতে হলে কেবল সত্যের জ্ঞান নয়, সত্যের অনুভূতি থাকা প্রয়োজন। এর জন্যে চাই একনিষ্ঠা, একাগ্রতা, কঠোর সাধনা। এই সত্য জ্ঞান লাভ করলেই আমরা জানতে পারি যে, আত্মা শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য; দেহ ও আত্মা পৃথক এবং দেহের বন্ধন আত্মার বন্ধন সূচিত করে না।

বিদ্যা অবিদ্যাকে দূরীভূত করে জীবকে মোক্ষলাভের উপযুক্ত করে তোলে

(ঙ) চার্বাক ছাড়া সব ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করে যে সম্যক্ জ্ঞানের জন্য সংযম বা নৈতিক শুচিতার প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন আত্মোপলব্ধি বা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের মতে সততা হল জ্ঞান (Virtue is knowledge)। দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে সততা হল অভ্যাস। বস্তুতঃ, সততা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেও মানুষ সব সময় সৎ কাজ করে না। জৈব প্রবৃত্তিকে যদি বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তাহলে মানুষ ভোগ বাসনার দাস হয়ে পড়ে। সুতরাং সংযম অর্থে ইন্দ্রিয়ময় সত্তাকে বুদ্ধিময় সত্তার অধীনস্থ করা প্রয়োজন। সংযমের অর্থ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করা নয়, সৎ অভ্যাস অনুশীলন করা। সেকারণে ভারতীয় নীতিবিদ্যা কেবলমাত্র কৃচ্ছ্রতাবাদ

মোক্ষলাভের জন্য সংযম ও নৈতিক শুচিতার প্রয়োজন

(rigorism) প্রচার করেছে—এ অভিযোগও যুক্তিযুক্ত নয়। যোগদর্শনে যেমন 'যম'[1] বা কি করা উচিত নয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনই 'নিয়ম'[2] বা সৎ অভ্যাস অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মেও অহিংসার সঙ্গে মৈত্রী এবং করুণার অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে।

(ছ) চার্বাক ভিন্ন সব দর্শনই মোক্ষকেই (liberation) একমাত্র পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছে। অবশ্য এই মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে সকলে একমত নয়। তবে সকলেই স্বীকার করেছে যে মোক্ষ হল সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা। আবার কারও কারও অভিমত যে মোক্ষ কেবলমাত্র দুঃখ নিবৃত্তি নয়, পরম শান্তি; যে মোক্ষলাভ করে সে ভূমানন্দের অংশীদার হয়।

সব ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য মোক্ষ

বৌদ্ধ দর্শনে এই মোক্ষকে বলা হয়েছে 'নির্বাণ'। কারও কারও মতে সর্ব দুঃখ নিরোধই নির্বাণ। কারও কারও মতে মোক্ষ বা নির্বাণ শান্তিপুর্ণ ও আনন্দময় অবস্থা। জৈনদের মতে আত্মার পূর্ণ বিকাশ ও স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। সাংখ্য দর্শনের মতে পুরুষ স্বরূপতঃ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগের উচ্ছেদ ও পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। যোগ দর্শনেও আত্মচেতনা উপলব্ধিকেই মোক্ষ বলা হয়েছে এবং যোগ বা সমাধির সাহায্যে এই মোক্ষ লাভ হয়। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলেই আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনেও বলা হয়েছে যে দেহ ও মনের সঙ্গে আত্মার যখন সংযোগ নষ্ট হয় ও আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে তখনই মোক্ষলাভ হয়। মীমাংসকগণও মনে করেন যে, আত্মা স্বরূপেতে নির্গুণ ও নির্বিশেষ। আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। অদ্বৈত বেদান্তে (শঙ্কর) জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের একাত্মাকেই মোক্ষরূপে অভিহিত করা হয়েছে।

(জ) চার্বাক ভিন্ন সব ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে বাইরের জগতের থেকে আন্তর-সত্তাই তাদের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাদের জগদ্দর্শনের ভিত্তি হল আত্মোপলব্ধি—সে কারণে সব ভারতীয় দর্শনই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও সকলেই আত্মার দুটি অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছে। একটি

বাইরের জগতের থেকে আন্তর সত্তাই বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে

1. যম—অহিংসা, সত্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।
2. নিয়ম, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান।

বদ্ধাবস্থা ও অপরটি মুক্তাবস্থা। আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য; অবিদ্যাবশতঃ আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানের অভাবই জীবের বন্ধন সূচনা করে। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত হলে আমাদের আত্মোপলব্ধি হয় ও আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করি।

(ঝ) সব ভারতীয় দর্শনই এক বা একাধিক প্রমাণ স্বীকার করে নেয়। যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়কে প্রমাণ বলা হয়। ভারতীয় দর্শনকে বিচারবিযুক্ত (Dogmatic) দর্শন বলা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। অধিবিদ্যা বা তত্ত্বালোচনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিদ্যার (Epistemology) আলোচনার ওপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যদিও আস্তিক দর্শন শ্রুতি-নির্ভর তবু তা দৃঢ় যুক্তিতর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সব ভারতীয় দর্শনই এক বা একাধিক প্রমাণ স্বীকার করে নেয়

চার্বাক দর্শন প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ করে, অনুমান এবং শব্দকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করে না। বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান উভয়কেই প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা হয়। সাংখ্য দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ—এই তিনটিই প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়েছে। ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ—এই চারটিকেই প্রমাণ বলে গ্রহণ করা হয়। মীমাংসা এবং অদ্বৈত বেদান্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধিকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বৌদ্ধ-দর্শন

১। ভূমিকা (Introduction):

(ক) প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় দর্শনের অবস্থা (The State of Philosophy in India before Buddha): বৌদ্ধ দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয় দর্শনের অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে যে উপনিষদের চিন্তাধারার বিকাশ শুরু হয়েছিল, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উপনিষদই একমাত্র প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগের দর্শন নয়, আরও অন্যান্য দার্শনিক মতবাদগুলিরও যে বিকাশ ঘটেছিল, উপনিষদ থেকেই সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। উপনিষদের কয়েকটি সূত্রে জড়বাদী চিন্তাধারার উল্লেখ থাকাতে অনেকে মনে করেন যে, প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগে চার্বাক দর্শনেরও বিকাশ ঘটেছিল। চার্বাক দর্শন জড়বাদী দর্শন। কারও কারও মতে প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে সাংখ্য ও যোগ দর্শনেরও বিকাশ ঘটেছিল এবং বৌদ্ধ দর্শনের ওপর এ দুটি দর্শনের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অনেক পণ্ডিত পূর্বোক্ত অভিমতগুলি গ্রহণ করতে রাজী নন—তাঁদের মতে যেহেতু উপনিষদের মধ্যে জড়বাদী ধারণার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতেই প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগে চার্বাক দর্শনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল এমন কথা বলা চলে না; বা বৌদ্ধদর্শন ও সাংখ্য বা যোগদর্শনের মধ্যে কয়েক বিষয়ে সিদ্ধান্তের মিল লক্ষ্য করেও বলা চলে না যে প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে সাংখ্য এবং যোগ দর্শনের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৌদ্ধ মতবাদের পরই সাংখ্য এবং যোগদর্শনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তাছাড়া, বৌদ্ধ মতবাদের

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে উপনিষদের চিন্তাধারার বিকাশ

কারও কারও মতে প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগে চার্বাক, সাংখ্য ও যোগ দর্শনের বিকাশ হয়েছিল

কারও কারও মতে বৌদ্ধ মতবাদের পরেই সাংখ্য ও যোগদর্শনের বিকাশ

বিরোধিতা করতে গিয়েই যে বহু ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[1]

সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হবে না যে, গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে উপনিষদকে কেন্দ্র করে দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছিল এবং প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সুস্পষ্ট বিকাশ না ঘটলেও তার কিছু কিছু সূত্রপাত ঘটেছিল।

ডাঃ দাশগুপ্তের মতে প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগে তিনটি চিন্তাধারা

ডাঃ দাশগুপ্তের মতে প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে তিনটি চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, যার মাধ্যমে মানুষ যে-কোন কাম্য বস্তু লাভ করতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, উপনিষদের বাণী অর্থাৎ ব্রহ্মই চরম তত্ত্ব (Ultimate reality) ও আত্মাই একমাত্র শাশ্বত সত্য এবং এছাড়া সব কিছুই নিছক নাম ও রূপ; তৃতীয়তঃ, কোন স্থায়ী সত্তা বা কোন নিয়মের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, আকস্মিক ঘটনার সমন্বয়েই বা কোন অজানা অদৃষ্টের দরুণই সব কিছুর উদ্ভব।[2] এ সময় একদিকে যেমন যৌগিক ক্রিয়া-কর্মের অনুষ্ঠানের জন্য আগ্রহ, শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্যই মানুষের মনকে অধিকার করেছিল, অপর দিকে একেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদের উদ্ভব হওয়াতে ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা চরম তত্ত্বের জ্ঞানকেই শ্রেয়তর বলে বিবেচনা করা হয়েছিল।

বুদ্ধদেব যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান ও চরম তত্ত্বের জ্ঞানে আস্থা স্থাপন না করে দুঃখমুক্তির উপায় সন্ধান করেছিলেন

দুটি ভাবধারার সংঘাতের এই সন্ধিক্ষণেই বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। তিনি এক মৌলিক চিন্তাধারার প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তাধারার নতুন গতিপথ নির্দেশ করলেন। যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে মানুষ পরমার্থ লাভ করতে পারে, তার যুক্তিগত ভিত্তি কোথায়? ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য হয় তবে নতুন দর্শন কিভাবে সম্ভব? মানুষের বন্ধনমুক্তি বা মোক্ষলাভই কি ভাবে সম্ভব হয়? কোন চরম তত্ত্বে আস্থা স্থাপন না করে বুদ্ধদেব

1. "Moreover it is well known to every student of Hindu Philosophy that a conflict with the Buddhists has largely stimulated philosophic enquiry in most of the systems of Hindu thought."
—S. N. Dasgupta : A History of Indian philosophy, Vol. I. Page 78

2. S. N. Das Gupta : A History of Indian Philosophy, Vol. I. Page 80

তাকালেন মানুষের দিকে, যে মানুষ দুঃখক্লেশে জর্জরিত। তিনি অনুসন্ধান করতে লাগলেন মানুষের দুঃখমুক্তির উপায়—বাহ্যিক অনুষ্ঠান এবং দর্শনের চরম তত্ত্ব ছেড়ে নতুন যুগের এক নব্য দর্শন তিনি দিলেন যা মানুষকে জানাল তার মুক্তির বারতা।

(খ) বুদ্ধদেবের জীবন-বৃত্তান্ত (The life of Buddha): উপনিষদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, তা কোন বিশেষ একজন ব্যক্তির দ্বারা রচিত নয়, বহু ঋষির উপলব্ধ সত্যই উপনিষদে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু উপনিষদ থেকে যখন আমরা প্রাচীন বৌদ্ধযুগে উত্তীর্ণ হই, তখন আমরা পাই একটিমাত্র সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের উপলব্ধ সত্যের কথা। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সাফল্যের মূলে রয়েছে বুদ্ধের জীবন ও তাঁর ব্যক্তিত্ব ; বুদ্ধের জীবন ও তার কার্যকলাপের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম মূর্তরূপ লাভ করেছে।

বৌদ্ধধর্মের মূলে বুদ্ধের জীবন ও তার ব্যক্তিত্ব

হিমালয়ের পাদদেশে প্রাচীন কপিলাবস্তু নগরে শাক্যবংশের এক রাজপরিবারে খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ, অর্থাৎ যিনি নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। পরিবারের দেওয়া নাম ছিল গৌতম; পিতা ছিলেন শুদ্ধোধন এবং মাতা মায়াদেবী। তাঁর জন্মের সাত দিন পরেই তাঁর মার মৃত্যু হয় এবং তাঁর বিমাতা তাকে লালনপালন করেন। যথাসময়ে যশোধারা নামে একটি সুন্দরী বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং তাঁর গর্ভে রাহুল নামে তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

বুদ্ধের জন্ম ও পরিচয়

কথিত আছে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং পরিশেষে সন্ন্যাসীর দর্শন গৌতম যেদিন পাবেন, সেদিনই তিনি সন্ন্যাসী হয়ে এই সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করবেন, এমন একটা সম্ভাবনার কথা আগে থেকে জানতে পেরে তাঁর পিতা সকল সময় তাকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, ভোগবিলাসের মধ্যে ঘিরে রাখবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধার্থ ছিল অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং ভাবপ্রবণ। ইহ জগৎ ও জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করার কাজেই তার মন সব সময় নিমগ্ন থাকত। এ জীবনের ক্ষণিকতা ও অনিশ্চয়তা তাকে চিন্তিত করে

বুদ্ধ বাল্যকাল থেকেই জগত ও জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনে মনোযোগী ছিলেন

তুলেছিল। সত্যই তিনি কপিলাবস্তুর পথে একে একে জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর দৃষ্টান্ত ও এক শান্তচিত্ত, সৌম্যদর্শন নির্ভীক সন্ন্যাসীর দেখা পেলেন এবং তিনি উপলব্ধি করলেন যে এই জগৎ দুঃখে পরিপূর্ণ। সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করে এই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের পথের সন্ধান করতে তিনি সংকল্প করলেন

উনত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার পরিত্যাগ

এবং মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার পরিত্যাগ করলেন। তিনি পদব্রজে রাজগৃহে (রাজগীর) এবং সেখান থেকে উরুবিল্বতে গমন করলেন। সেখানে আরও পাঁচজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে মগ্ন হয়ে কঠোর তপশ্চর্যায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন। কখনও একাকী চিন্তার সাগরে মগ্ন থেকে, কখনও বা অন্যান্য লোকের সঙ্গে আলোচনায় নিজেকে নিযুক্ত করে তিনি সত্যের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু অনবরত পর্যটনে, উপবাস ও কঠোর তপশ্চর্যার ফলে তার শরীর ক্ষীণ ও অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল। তিনি প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন হলেন, কিন্তু তবু

কৃচ্ছ্র সাধনের ব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতনতা

তিনি সত্যের সন্ধান পেলেন না; জীবন তখনও তাঁর কাছে এক বিরাট জিজ্ঞাসা। প্রায় ছ' বৎসর ধরে এরকম কঠোর তপশ্চর্যার ও দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমেও যখন তিনি সত্যের সন্ধান পেলেন না, তখন তিনি এই চরম কৃচ্ছ্রসাধনার ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত হলেন। ভোগবিলাস ও কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যবর্তী যে সাধনার উদার মধ্যপন্থা বর্তমান, তাকে অবলম্বন করেই তিনি পুনরায় সত্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হলেন। শুচিমন, পবিত্র দেহ এবং শুদ্ধচিত্ত নিয়ে গয়ার সুপ্রসিদ্ধ বোধিবৃক্ষের নীচে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন।

একাগ্রচিত্তে সাত সপ্তাহ ধরে তপস্যা করার পর একদিন তিনি সত্যোপলব্ধি করলেন ও সত্যের আলোয় তাঁর মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যার জন্য তাঁর এই

বোধিবৃক্ষের তলায় বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ

কঠোর তপশ্চর্যা, এই একাগ্র তপস্যা, সেই কাম্য বস্তু তিনি লাভ করলেন। জগতের দুঃখের যে রহস্য, তার স্বরূপ তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হল। সেদিন থেকেই সিদ্ধার্থ হলেন বুদ্ধ বা সম্যক্ জ্ঞানী (Buddha or the Enlightened)। তিনি হলেন তথাগত অর্থাৎ সত্যের স্বরূপ তিনি অবগত হয়েছেন। তিনি অর্হৎ বা পূজনীয় বলেও অভিহিত হলেন।

কিন্তু সত্যের সন্ধান পেয়েও তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না। কেবলমাত্র নিজের মুক্তি নয়, বিশ্বের লোককে দুঃখকষ্ট থেকে চিরমুক্ত করার জন্য তিনি তাঁর ধর্মবাণী প্রচার করার সংকল্প করলেন। প্রায় পয়তাল্লিশ বৎসর ধরে বিভিন্ন স্থান পর্যটন করে তিনি তাঁর সত্যোপলব্ধির বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর এই বাণীই বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি। কালক্রমে এই বৌদ্ধধর্ম দক্ষিণে সুদূর সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম এবং উত্তরে তিব্বত, চীন, জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত হল। তিনি চারটি আর্যসত্য এবং নির্বাণ লাভের আটটি মার্গ দুঃখপীড়িত জগতে প্রচার করে গেছেন। জটিল তত্ত্বালোচনার গভীরে প্রবেশ না করে নীতি ও ধর্মের প্রচারই ছিল তার উদ্দেশ্য। বহু বৎসর ধরে অহিংসা, প্রেম ও করুণার বাণী প্রচার করে আশী বৎসর বয়সে তিনি এই মরজগত ত্যাগ করলেন। তাঁর প্রচারিত বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে অনেক লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল এবং তাঁর তিরোভাবের পর তাঁর ধর্মের বাণী দেশে দেশে প্রচার করেছিল। মানবজাতির আধ্যাত্মিক ইতিহাসে বুদ্ধ ছিলেন একজন মহান পুরুষ এবং তাঁর সমগ্র জীবনই মানবজাতিকে এক নূতন শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

বুদ্ধের অহিংসা, প্রেম ও করুণার বাণী প্রচার

(গ) প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্য বা দর্শন (Early Buddhist Literature or Philosophy): বুদ্ধদেব নিজে কোন গ্রন্থই রচনা করেননি। তিনি মুখেমুখেই তাঁর উপদেশ বাণী প্রচার করতেন। তাঁর এই উপদেশ ও বাণী, তাঁর অগণিত শিষ্যদের মাধ্যমে মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দেশে দেশে প্রচারিত হয়েছিল। যুগভেদে ও দেশভেদে বৌদ্ধদর্শনের নানারকম ব্যাখ্যার ফলে কোন্‌টি যে প্রকৃত বুদ্ধমত তা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন এবং কোন একটি গ্রন্থকেই বৌদ্ধদর্শনের আদি গ্রন্থরূপে নির্দেশ করাও কষ্টসাধ্য।

বুদ্ধদেব কোন গ্রন্থ রচনা করেননি

বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর তাঁর অমূল্য উপদেশ ও বাণীগুলিকে সংরক্ষিত করার প্রয়োজন দেখা দেওয়াতে তাঁর শিষ্যরা সেগুলিকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থগুলি পালি ভাষায় লেখা এবং

এগুলিকে **পিটক** বলা হয়। **পিটক** কথাটির অর্থ **পেটি** বা ঝাঁপি।

বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর ত্রিপিটকের মাধ্যমে বুদ্ধের বচন ও উপদেশ সংগৃহীত হয়

অনেকে মনে করেন যে বুদ্ধের বাণী ও উপদেশাবলী যথাযথভাবে এই সকল পিটকে লিপিবদ্ধ হয়নি এবং সেহেতু এই গ্রন্থগুলি প্রামাণ্য নয়। কিন্তু অনেক বৌদ্ধদার্শনিক মনে করেন যে, পালিপিটকে যে সব উক্তি আছে, সেগুলি বুদ্ধের নিজেরই উক্তি। যাই হোক না কেন, বুদ্ধের বাণী ও উপদেশাবলীর বা প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনের জন্য এই পিটকের ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৪১ শতকে এই গ্রন্থগুলি সংকলিত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে পালিপিটকই যে সবচেয়ে প্রাচীন—এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

পিটকই প্রাচীন বৌদ্ধ-দর্শনের ভিত্তি

এই পিটকের সংখ্যা তিনটি এবং সংক্ষেপে এগুলিকে **ত্রিপিটক** বা তিন পেটি উপদেশ (The three baskets of teaching) বলা হয়। এই পিটকগুলি হল : (১) **বিনয়পিটক**, (২) **সুত্তপিটক** এবং (৩) **অভিধম্মপিটক**।

(১) **বিনয়পিটক :** এই গ্রন্থে বৌদ্ধসন্ন্যাসী বা ভিক্ষুদের আচরণ সম্পর্কীয় নিয়মাদির কথা বলা হয়েছে। সংযত আচরণ, নিয়মনিষ্ঠা, নৈতিক শুচিতা বৌদ্ধসন্ন্যাসী বা ভিক্ষুদের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। কোন্ কোন্ নিয়ম বা আচরণ অনুসরণ করে এই সংযত জীবন যাপন করা যায়, বিনয়পিটকে তারই নির্দেশ আছে। বিনয়পিটকের **বিনয়** কথাটির অর্থ **আচার** (Rules of conduct or discipline)।

বিনয়পিটক

(২) **সুত্তপিটক :** এই গ্রন্থে আছে ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে বুদ্ধদেবের উপদেশ। বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মের উদ্দেশ্য, সাধনা ও ফল সম্বন্ধে যা বলেছেন সুত্তপিটকে তারই আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। **সুত্ত** কথাটির সাধারণ অর্থ **সংক্ষিপ্ত বচন**। কিন্তু ত্রিপিটকের প্রতিটি সুত্ত একটা কাহিনীর আকারেই ব্যক্ত হয়েছে। এই সুত্তপিটকের পাঁচটি বিভাগ আছে, যেগুলিকে বলা হয় **নিকায়** (Nikayas)।[1]

সুত্তপিটক

1. দীর্ঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, সঞ্‌যুত্তনিকায়, অংগুত্তর নিকায়, খুদ্দক নিকায়।

প্রথম চারটিতে কথোপকথনের ছলে বুদ্ধের উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে। *Rhys Davids*-এর মতানুযায়ী দার্শনিক অন্তঃদৃষ্টির গভীরতায় ও উন্নত চিন্তাধারার বিচারে এগুলি প্লেটোর কথোপকথনের (Dialogues) সমতুল্য।

(৩) **অভিধম্মপিটক**ঃ এই গ্রন্থে দার্শনিক আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অভিধম্মে আমরা পাই বুদ্ধদেবের বচনের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, ভাষ্য ইত্যাদি। অভিধম্মে নতুন কোন ধর্মমতের আলোচনা নেই। সুত্তপিটকে যা বলা হয়েছে তারই দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনা অভিধম্মপিটকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বুদ্ধদেব উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, সুত্তগুলি সমাধিলাভ করতে এবং অভিধম্ম প্রজ্ঞাসম্পদ লাভ করতে সহায়তা করে। এই অভিধম্মপিটকেরও সাতটি বিভাগ আছে।[1]

অভিধম্মপিটক

পূর্বোক্ত তিনটি পিটক ও তাদের ব্যাখ্যা বা টীকাগুলি থেকেই প্রাচীন বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। কালক্রমে বুদ্ধদেবের অনুগামীদের সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল ততই তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যেতে লাগল। দুটি প্রধান বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায় হল হীনযান এবং মহাযান। প্রথম ধর্মমতটির প্রসার ঘটেছিল সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম দেশে এবং দ্বিতীয় ধর্মমতটির প্রসার ঘটে ছিল তিব্বত, চীন ও জাপান দেশে। হীনযানের ধর্মসাহিত্য পালি ভাষায় লিখিত। মহাযানের ধর্মমত সংস্কৃত ভাষায় লেখা।

দুটি প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ঃ হীনযান ও মহাযান

দেশে দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার যতই ঘটতে লাগল, নতুন নতুন ধারণা এবং বিশ্বাসের অনুপ্রবেশের ফলে তার কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গ্রন্থের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে লাগল। বস্তুতঃ, বৌদ্ধ-দর্শন-সাহিত্যের সংখ্যা এতই অধিক যে এক জীবনে সমস্ত বৌদ্ধ-সাহিত্য অধ্যয়ন করা একপ্রকার দুরূহ ব্যাপার।

বৌদ্ধসাহিত্যের ব্যাপকতা

1. ধর্ম সংগনি, বিভংগ, কথা-বথু, পুগ্‌গল পঠ্‌ঞত্তি, ধাতুকথা, যমক, পট্‌ঠান।

২। বুদ্ধদেবের শিক্ষা বা বাণী : চারটি আর্য সত্য (The Teachings of Buddha : The Four Noble Truths) :

সাধারণতঃ দার্শনিক বলতে আমরা যা বুঝে থাকি সে অর্থে বুদ্ধদেবকে দার্শনিক বলা চলে না। তত্ত্ববিদ্যার জটিল আলোচনায় তিনি কখনও আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তাঁর দৃষ্টিতে তত্ত্ববিদ্যার এই সকল জটিল সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না, এগুলির কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা নেই। বুদ্ধদেব ছিলেন সত্যদ্রষ্টা সাধক। এই জাগতিক দুঃখকষ্ট ও নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে তিনি মানুষকে শুনিয়েছিলেন নতুন আশার বাণী, প্রবর্তন করেছিলেন এক নতুন ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনায় মানুষকে করেছিলেন উদ্বোধিত। তাই এই হিসেবে তিনি দার্শনিক বা তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না, তিনি ছিলেন নীতিতত্ত্বের প্রচারক।

তত্ত্ববিদ্যার জটিল আলোচনায় বুদ্ধদেবের কোন আগ্রহ ছিল না

যখন কেউ বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করতেন আত্মার স্বরূপ কি, আত্মা কি দেহ থেকে পৃথক, এ জগৎ সসীম না অসীম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি নেই, তখন তিনি এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে চাইতেন না। বুদ্ধদেবের মতে এ সকল প্রশ্ন একেবারেই নিরর্থক। উপযুক্ত প্রমাণের যেখানে অভাব সেখানে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানগুলি পরস্পরবিরোধী হওয়া স্বাভাবিক। সকলেই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এই সব সমস্যার সমাধান করে থাকেন, ফলে কেউই সত্যের পূর্ণ রূপটিকে উপলব্ধি করতে পারেন না। ফলে এই জাতীয় আলোচনা কেবল বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করে এবং মানুষের জীবনের যা লক্ষ্য—অর্থাৎ দুঃখ থেকে চিরমুক্তি, তা থেকে তাকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। সূক্ষ্ম জটিল তত্ত্বালোচনায় জীবনের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

তাঁর মতে এই জাতীয় সমস্যার আলোচনায় কোন সার্থকতা নেই

বুদ্ধদেব জগতের দিকে তাকিয়েছিলেন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং মানুষ দুঃখের হাত থেকে কি ভাবে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে তারই উপায় নির্দেশ করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত। দুঃখ জর্জরিত মানুষের পক্ষে অলস নিরর্থক তত্ত্বালোচনায় নিজেকে মগ্ন করা একান্তই

মূর্খতা। এমন মূর্খ কে আছে যে, শরীর যখন তার বিষাক্ত তীরের দ্বারা বিদ্ধ, তখন তীরটিকে ছাড়িয়ে না ফেলে, তীরটি কোথা থেকে এল, কে এটি তৈরী করেছে বা কোথা থেকে ছোঁড়া হয়েছে তাই নিয়ে চিন্তা করবে? দুঃখের হাত থেকে কি ভাবে চিরমুক্তি লাভ করা যায়—এই জিজ্ঞাসাই ছিল তার কাছে প্রধান জিজ্ঞাসা। এ ছাড়া অন্য যে কোন তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই ছিল অসার ও নিরর্থক। মানুষকে নিয়েই বুদ্ধদেবের দর্শন—এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের সমস্যাই ছিল তার কাছে প্রধান সমস্যা; অতীন্দ্রিয় জগতের সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না।

দুঃখের হাত থেকে মানুষের মুক্তির উপায় নির্দেশ করাই ছিল বুদ্ধদেবের লক্ষ্য

মানুষকে নিয়েই বুদ্ধদেবের দর্শন

চত্বারি আর্য সত্যানিঃ চারটি আর্য সত্য (Four Noble Truths)ঃ দুঃখ এবং দুঃখ নিরোধের উপায় বিষয়ে বুদ্ধদেবের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তাঁকে চারটি সত্যের সন্ধান দিয়েছিল। এই চারটি সত্য বৌদ্ধদর্শনে 'চত্বারি আর্য সত্যানি' বা 'চারটি আর্য সত্য' নামে পরিচিত। এই চারটি সত্য হলঃ (১) দুঃখ বা এ জীবন দুঃখময়, (২) দুঃখ-সমুদায় বা দুঃখের উদ্ভবের কোন কারণ আছে, (৩) দুঃখ নিরোধ বা দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় আছে, (৪) দুঃখ নিরোধ মার্গ বা দুঃখ নিরোধের যথাযথ উপায় আছে।

চারটি আর্য সত্য—দুঃখ, দুঃখ সমুদায়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধ মার্গ

প্রথম আর্য সত্যঃ দুঃখ (The First Noble Truth—There is Suffering)ঃ এই সংসার দুঃখময়। 'সর্বং দুক্খং'—সবই দুঃখময়। জন্ম দুঃখ জরা দুঃখ, রোগ দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক, ক্লেশ, উদ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিচ্ছেদ দুঃখ, যা ইচ্ছা করে লাভ করা যায় না—তাই দুঃখ, সংক্ষেপে যা কিছু আসক্তি-প্রসূত তাই দুঃখময়। এ সংসারে জীব ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুর কবল থেকে মানুষ নিজেকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারে না, সবকিছুই অবিনশ্বর। সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, এগুলিই দুঃখের সৃষ্টি করে। মানুষের কামনাই বাসনা সৃষ্টি করে এবং এই কামনার অপরিপূর্ণতাই মানুষের মনে দুঃখ উৎপন্ন করে। বুদ্ধদেব

সর্বং দুক্খং—সবই দুঃখময়

কামনার অপরিপূর্ণতাই মানুষের মনে দুঃখ উৎপন্ন করে

নিজমুখেই শিষ্যদের বলেছেন যে, "যখন তোমরা প্রিয়জনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছ, প্রিয়জনের থেকে বিযুক্ত হয়েছ, জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে জন্মে ছুটোছুটি করে বেরিয়েছ তখন তোমাদের এই সুদীর্ঘ পথে, চারটি বিরাট সাগরে যত না জল আছে, তার চেয়ে বেশী চোখের জল তোমরা ফেলেছ।" সংক্ষেপে এই সংসারে নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখ—কোথাও সুখ নেই, কোথাও আনন্দ নেই, এই হল বুদ্ধদেবের দুঃখবাদের মূল কথা।

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় বুদ্ধ এই সংসারে দুঃখের একটি অতিরঞ্জিত চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। জড়বাদী চার্বাক হয়ত বলতে পারে যে জগতে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি সুখও আছে। কিন্তু বুদ্ধের উত্তর হল এই সংসারে সুখ যে নেই তা নয়, কিন্তু বিবেকীর দৃষ্টিতে জগৎ দুঃখময়, প্রত্যেকটি 'সুখ দুঃখোদর্ক'। যে কোন সুখের মধ্যেই দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। বুদ্ধদেব বলতেন, 'প্রিয়ের সঙ্গে বিয়োগ এবং অপ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগই দুঃখ'।[1] তাছাড়া, সব কিছুই অনিত্য ; যা অনিত্য, তাই দুঃখময়।[2] তাছাড়া, সংসারে চারদিকে যখন আগুন জ্বলছে, তখন হাসার বা আনন্দ করার অবসর কোথায়? গীতায়ও উক্ত হয়েছে—যখন সকল সুখের সঙ্গেই দুঃখ মিশ্রিত এবং সকল সুখই অস্থায়ী ও অনিত্য, তখন যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনি অস্থায়ী ও অনিত্য সুখলাভে সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

সংসারে সুখ থাকলেও প্রতিটি সুখই দুঃখোদর্ক

সব জাগতিক সুখই অস্থায়ী ও অনিত্য

বস্তুতঃ, কেবলমাত্র বৌদ্ধদর্শনেই নয়, চার্বাক ভিন্ন সব ভারতীয় দর্শনেই এই দুঃখবাদের কথা বলা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, বৌদ্ধদর্শনে জীবনের নৈরাশ্যময় দিকটিকে অতিরঞ্জিত করে দেখান হয়েছে, বৌদ্ধদর্শনে জীবনের প্রতি বিশ্বাসের এবং সাহসের অভাব। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের সমর্থনে এই কথা বলা যেতে পারে যে, প্রতিটি ধর্মই জাগতিক দুঃখের দিকটিকে একটু অতিরঞ্জিত করে চিত্রিত করে, যেহেতু প্রতিটি ধর্মেরই উদ্দেশ্য দুঃখ থেকে মানুষকে মুক্ত করা।

চার্বাক ভিন্ন সব ভারতীয় দর্শনেই দুঃখবাদের কথা বলা হয়েছে

1. "প্রিয়ানং অদস্সনং দুক্খং অপ্পিয়ানঞ্চ দস্সনং"—ধর্মপদ।
2. 'যৎ অনিত্যং তৎ দুঃখম্' (সুত্তনিপাত, Page I & 216)

তাছাড়া, উক্ত ধর্মপদে উক্ত আছে, যখন এই সংসারে আগুন জ্বলছে, তখন হাসার বা আনন্দ করার সময় কোথায় ?[1] তোমাদের চারদিকে যখন অন্ধকার তখন তুমি কি আলোর সন্ধান করবে না ? এ দেহের ক্ষয় হচ্ছে, দেহ ক্ষীণ এবং রোগে পূর্ণ।...বস্তুতঃ, মৃত্যুতেই জীবনের শেষ।" সুতরাং বৌদ্ধমতে সকলই যে দুঃখময় এ হল সংসারের সত্য চিত্র। দুঃখকে অতিরঞ্জিত করে কোথাও দেখান হয়নি। —দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে জাগতিক আনন্দ ও সুখভোগের মধ্যে ভয় এবং উদ্বেগ মিশ্রিত থাকায় তা দুঃখেরই নামান্তর মাত্র।

বৌদ্ধগণ বৌদ্ধদর্শনে দুঃখের অতিরঞ্জনের কথা স্বীকার করেন না

দুঃখবাদকে বিভিন্ন অর্থে নেওয়া যেতে পারে। যেমন,

যদি দুঃখবাদ বলতে বোঝায় যে অনাসক্ত এবং শুদ্ধ মন নিয়ে না বাঁচলে জীবনের কোন সার্থকতা নেই, তাহলে বৌদ্ধদর্শন দুঃখবাদী, যদি দুঃখবাদ বলতে বোঝায় যে এ-জীবনের ভোগবিলাসের মধ্যে সুখ নেই, সুখ আছে অন্যত্র, তাহলে বৌদ্ধদর্শন দুঃখবাদী। কিন্তু যদি দুঃখবাদ বলতে বুঝি সেই মতবাদ যে মতবাদ কেবল দুঃখের কথা বলে, জীবনের নৈরাশ্যের কথা বলে কিন্তু দুঃখমুক্তি বা নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে আলোর কথা বলে না, তাহলে প্রাচীন বৌদ্ধদর্শন এই অর্থে দুঃখবাদী নয়। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে দুঃখের কথা যেমন আছে, দুঃখমুক্তির কথাও আছে। বুদ্ধদেব কেবলমাত্র জীবনের অসার্থকতা আশার নিষ্ফলতার কথাই বলেননি, মানুষ যে এ জীবনেই নিজের প্রচেষ্টায় দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করতে পারে তার কথাও বলেছেন।—আশাহত মানুষকে আশার বাণী বুদ্ধদেবের মত কেউ শোনাননি।

দ্বিতীয় আর্য সত্য : দুঃখ সমুদায় বা দুঃখের কারণ আছে (The Second Noble truth : There is cause of Suffering) : বুদ্ধের মতে সংসারে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি দুঃখের কারণ আছে। 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' বা কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তির ওপরই দ্বিতীয় আর্য সত্যটি প্রতিষ্ঠিত। প্রতীত্য সমুৎপাদ মতানুসারে এ জগতে কোন কিছুই অকারণে ঘটতে পারে না। প্রত্যেক ঘটনাই কোন পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক ঘটনাই কোন কারণবশতঃ ঘটে থাকে। সুতরাং দুঃখও অকারণে ঘটতে পারে না, এই দুঃখেরও কারণ আছে। ব্যাধি, জরা, মরণ, নৈরাশ্য, শোক—সংক্ষেপে এই

সংসারে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি দুঃখের কারণও আছে

1. "কোণু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি, অন্ধকারেন ওনদ্ধা পদীপং ন গবেস্সথ।"—ধর্মপদ.

জরামরণের কারণ হল জাতি বা জন্ম। জীব যদি জন্মগ্রহণ না করত, তাহলে তাকে ব্যাধি জরামরণের অধীন হতে হত না। কিন্তু জন্মেরও নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, কারণ জন্মও অকারণে হতে পারে না, বৌদ্ধদর্শনে জন্মের কারণকে বলা হয়েছে 'ভব'। ভব মানে 'হওয়া' অর্থাৎ পুনর্বার জন্মগ্রহণ করার জন্য ব্যাকুলতা।[1] কিন্তু এই ব্যাকুলতারই বা কারণ কি? এর কারণ হল 'উপাদান' বা জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি। কিন্তু এই আসক্তিরই বা উদ্ভব হয় কেন? এর কারণ হল তৃষ্ণা বা ভোগস্পৃহা। আবার এই তৃষ্ণার কারণ হল সুখস্মৃতিবিজড়িত পূর্ব-ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। আমরা পূর্বে এই জাতীয় বস্তু ভোগ করেছি এবং আমাদের সুখের অনুভূতি ঘটেছে, সেই সুখানুভূতি বা বেদনা তৃষ্ণার কারণ। কিন্তু বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বা স্পর্শ না ঘটলে ইন্দ্রিয়-সুখের বা বেদনার উদ্ভব সম্ভব নয়। কিন্তু এই সংযোগ বা স্পর্শ কি ভাবে সম্ভব হবে, যদি ষড়ায়তন অর্থাৎ আমাদের পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক) এবং একটি অন্তরিন্দ্রিয় (অর্থাৎ মন) উপস্থিতি না থাকে? কিন্তু, ষড়ায়তন বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কি ভাবে কাজ করতে পারে যদি কোন 'নামরূপ' বা দেহ-মনের সংগঠন (Body mind organism) না থাকে? আবার এই নামরূপের অস্তিত্ব কখনই সম্ভব হত না যদি চেতনা বা বিজ্ঞান না থাকত। চেতনা থাকে বলেই এই জীবদেহ মাতৃগর্ভে দিন দিন বর্ধিত হতে থাকে। কিন্তু এই চেতনা বা বিজ্ঞানের কারণ কি? এর কারণ সংস্কার।[2] পূর্ব বা অতীত জীবনের

জরামরণের কারণ হল জাতি বা জন্ম

জাতির কারণ হল ভব

ভবের কারণ—উপাদান

উপাদানের কারণ—তৃষ্ণা

তৃষ্ণার কারণ বেদনা

বেদনার কারণ স্পর্শ

স্পর্শের কারণ ষড়ায়তন এবং ষড়ায়তনের কারণ 'নামরূপ'

নামরূপের কারণ চেতনা বা বিজ্ঞান

---

1. চন্দ্রকীর্তির মতে ভব হল কর্ম যা পুনর্জন্ম ঘটায়।

2. "কোন ব্যক্তির চিন্তা, বাক্য ও ক্রিয়ারূপ যে সকল কর্ম পাপ-পুণ্যের আকারে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং যাহা বিশেষ করিয়া নতুন জন্মের কামনার সংযোগ দ্বারা প্রবল হইয়া নতুন দেহ ধারণ করে, তাহাদিগকে সংস্কার বলা হয়।"—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস—১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৮১।

যে সব কর্ম সম্পাদিত হয় সে সব কর্ম একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন করে, যাকে বলা হয় সংস্কার। সংস্কার হল অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ।

বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মধ্যে এই সংস্কারই চেতনার সৃষ্টি করে। এই সংস্কারের কারণ কি? এই সংস্কার, যার জন্য পুনর্জন্ম হয়ে থাকে তার কারণ হল অবিদ্যা। অবিদ্যা অর্থে চারটি আর্য সত্য সম্পর্কে

এই সংস্কারের কারণ অবিদ্যা

যথার্থ জ্ঞানের অভাব। অবিদ্যাহেতু মানুষ মিথ্যাকে সত্যরূপে জ্ঞান করে, অনিশ্চিত ও অনিত্য বস্তুকে ধ্রুব ও নিত্য বলে জ্ঞান করে; অস্থায়ী ক্ষণিক সুখ, যার মধ্যে দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে, তাকে যথার্থ সুখ মনে করে, তার জন্য লালায়িত হয়।

ওপরে আমরা বৌদ্ধ দর্শনকে অনুসরণ করে দুঃখকে কার্যরূপে গ্রহণ করে তার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত দেখেছি যে দুঃখের কারণ হল অবিদ্যা। এবার যদি আমরা কারণ থেকে সংক্ষেপে কার্যের দিকে অগ্রসর হই

কারণ থেকে কার্যের দিকে

তাহলে এই কার্যকারণ সম্পর্কের পূর্ণ চিত্রটি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারব: (১) অবিদ্যা বা সত্যের সম্যক জ্ঞানের অভাবের জন্যই (২) সংস্কারের উদ্ভব, পূর্ব জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপই সংস্কার যা মাতৃগর্ভের ভ্রূণের মধ্যে (৩) চৈতন্য বা বিজ্ঞানের সৃষ্টি করে যা থেকে (৪) নামরূপ বা দেহমনের সৃষ্টি, যার থেকে (৫) ষড়য়াতন বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব; এই ষড়ায়তনই (৬) স্পর্শ বা বিষয়-সংযোগের কারণ এবং ইন্দ্রিয় সংযোগের ফলে যে ইন্দ্রিয় সুখ বা (৭) বেদনা তার থেকেই উদ্ভূত হয় (৮) তৃষ্ণা বা ভোগের কামনা যার থেকে উদ্ভূত হয় (৯) উপাদান বা বিষয়ের প্রতি আসক্তি এবং এই উপাদানই (১০) ভব বা পুনর্বার জন্মগ্রহণের ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে। এই ভব থেকেই (১১) জাতি বা পুনর্জন্ম এবং জন্মের ফলেই মানুষকে (১২) জরামরণের অধীনতা স্বীকার ক'রে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়।

বৌদ্ধদর্শনে দুঃখের কারণকার্য শৃঙ্খলের কথায় আমরা দেখতে পাই মোট বারটি বা দ্বাদশ কারণের কথা উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ দুঃখ থেকে অবিদ্যা পর্যন্ত বা অবিদ্যা থেকে দুঃখ পর্যন্ত মোট বারটি 'নিদান' আছে, সেহেতু

বৌদ্ধদর্শনে পূর্বোক্ত কারণকার্য শৃঙ্খলাকে **দ্বাদশ নিদান** বা **ভবচক্র** বলে অভিহিত করা হয়। একে ভবচক্র বলার হেতু এই হল পূর্বোক্ত দ্বাদশটি নিদান বা কার্যকারণ শৃঙ্খলের দ্বাদশ গ্রন্থি যা মানুষকে জন্ম, দুঃখভোগ ও পুনর্জন্মের মধ্যদিয়ে বারংবার সংসারে চাকার মত ঘোরাচ্ছে।

দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্র

পূর্বোক্ত কার্যকারণ শৃঙ্খল লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব যে, অতীতে আমরা যে জীবন লাভ করেছিলাম, বর্তমানে যে জীবন আমরা ভোগ করছি এবং ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম হলে যে জীবন আমরা লাভ করব এর মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র বর্তমান। একটি থেকেই আর একটির উৎপত্তি এবং একটির নিরোধে অপরটির নিরোধ। অতীত জীবন বর্তমান জীবনকে নির্ধারিত করেছে এবং বর্তমান ভবিষ্যত জীবনকে নির্ধারিত করছে। নীচে একটি ছকের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে:

(১) অবিদ্যা (২) সংস্কার	পূর্বজন্ম
(৩) বিজ্ঞান (৪) নামরূপ (৫) ষড়ায়তন (৬) স্পর্শ (৭) বেদনা (৮) তৃষ্ণা (৯) উপাদান (১০) ভব	বর্তমান জীবন
(১১) জাতি (১২) জরামরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, বিষাদ, নৈরাশ্য—মহান দুঃখস্কন্ধ বা দুঃখ সকল	পরজন্ম

উপরোক্ত তালিকাটির সাহায্যে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে কি নিবিড় যোগসূত্র বর্তমান। অবিদ্যা হেতুই সংস্কার এবং অতীত জীবনের সংস্কারই বর্তমান জীবনের হেতু। বর্তমান জীবেনর যে ভোগস্পৃহা বা তৃষ্ণা তাই কর্মফলভোগের মাধ্যমে পুনর্জন্ম ঘটায় এবং জীবকে পুনরায় জরামরণের অধীনস্থ করে। এইভাবে জীব সংসারচক্রে অনবরত আবর্তিত হচ্ছে।

তৃতীয় আর্য সত্য ঃ দুঃখ নিরোধ (The Third Noble Truth about the Cessation of Suffering) ঃ বৌদ্ধদর্শনের তৃতীয় আর্য সত্য হল দুঃখের নিরোধ—যেহেতু প্রতিটি কার্যেরই কারণ আছে, সেহেতু দুঃখেরও কতকগুলি কারণ আছে এবং যদি এই কারণগুলি ধ্বংস করা যায় তাহলেই দুঃখের নিরোধ হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল—এই দুঃখ নিরোধের প্রকৃত অবস্থাটি কি ?

যে কারণের জন্য দুঃখের উদ্ভব, তার ধ্বংসতেই দুঃখের নিরোধ

বৌদ্ধদর্শনে এই দুঃখ নিরোধকেই নির্বাণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। নির্বাণ অর্থে দুঃখের হাত থেকে চিরমুক্তি লাভ। বৌদ্ধদর্শনে বলা হয়েছে যে, মানুষ এই জীবনেই অনুক্ষণ সত্যের অনুধাবন করে এবং ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করে নিজের প্রচেষ্টায় নির্বাণ লাভ করতে পারে। ভোগস্পৃহাকে দূর করার জন্য যখন মানুষের আর বিষয়ানুরক্তি থাকে না তখন মানুষের পুনর্জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা রহিত হয়। তখনই সে এই সংসারচক্র থেকে মুক্ত হয়, তাকে আর জরামরণের অধীন হতে হয় না, সংসারের সঙ্গে তার বন্ধন ছিন্ন হয়, সে হয় মুক্ত, স্বাধীন। এভাবে যে ব্যক্তি দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করে বা নির্বাণপ্রাপ্ত হয় তাকে বলা হয় অর্হত বা পূজনীয়। দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তিই হল নির্বাণ। রাগ, দ্বেষ ও মোহের নির্বাণই নির্বাণ। প্রদীপ যেমন উপাদানের অভাবে নির্বাপিত হয়, তেমনি নির্বাণে তৃষ্ণার নিরোধ হয়। তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরুদ্ধ হয় এবং দুঃখের নিদান পঞ্চস্কন্ধের নিরোধ হয়। অনেকে মনে করেন নির্বাণ এক নিষ্ক্রিয় অবস্থা। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। অবশ্য এ কথা সত্য, বৌদ্ধদর্শনের উক্ত চারটি আর্য সত্যের অনুক্ষণ অনুধাবনের জন্য মনকে স্থির ও সংযত করা প্রয়োজন। ধ্যান বা সমাধি বুদ্ধদেব প্রচারিত অষ্টাঙ্গ মার্গের শেষ মার্গ। কিন্তু সত্যের উপলব্ধি হলে আর ধ্যানে মগ্ন থাকার বা বহির্জগতের সক্রিয় জীবন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধ নিজের জীবনেই এ সত্যকে প্রমাণ করেছেন। নির্বাণ লাভের পর প্রায় সুদীর্ঘ চার-পাঁচ বৎসরকাল ধরে

দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তিই নির্বাণ

নির্বাণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয়

তিনি বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁর নতুন ধর্মমত প্রচার করেছিলেন ও সমস্ত বিশ্বের লোককে মুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন। কাজেই নির্বাণ নিষ্ক্রিয় অবস্থার সূচনা করে না।[1]

কর্ম দু'প্রকার—সকাম এবং নিষ্কাম

নিষ্কাম কর্ম পুনর্জন্ম রোধ করে

নির্বাণ লাভের পর যদি অনাসক্ত ভাবে কর্ম করা যায় তাহলে বন্ধনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কর্ম দু'প্রকার—সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম কর্মই বিষয়ানুরক্তি ও বন্ধন সৃষ্টি করে, যার ফলে জীবের পুনর্জন্ম ঘটে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম অর্থাৎ জগতের ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যখন কর্ম করা হয় তখন বিষয়ানুরাগের কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং ফলে পুনর্জন্মেরও কোন সম্ভাবনা থাকে না।

1. নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়।

নির্বাণ কথাটির সাধারণ অর্থ নিভে যাওয়া বা দীপ নির্বাপিত হওয়া। এই সাধারণ অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নির্বাণ কথাটির অর্থ করা হয়েছে আত্যন্তিক বিনাশ, অবসান বা শূন্যতা। বৌদ্ধ দার্শনিকতত্ত্বের সঙ্গে এই অর্থই সামঞ্জস্যপূর্ণ। নির্বাণ হল পূর্ণ বিলুপ্তি (Total Extinction)। কিন্তু নির্বাণ কথাটা যদি কেবলমাত্র এরূপ একটি অভাবাত্মক অবস্থার কথা নির্দেশ করে তাহলে বুদ্ধদেব প্রচারিত বাণীর কোন সার্থকতা থাকে না। সে কারণে অনেকে মনে করেন যে নির্বান মানে বিলুপ্তি নয়। নির্বাণ হল একটি শাশ্বত আনন্দের অবস্থা (A state of eternal felicity), অর্থাৎ এ অবস্থা অনেকটা উপনিষদের মোক্ষলাভের সমতুল্য। আবার কোন কোন বৌদ্ধের মতে এ হল এমন একটা অবস্থা যাকে সাধারণ জাগতিক অবস্থার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা চলে না—এ হল এক অচিন্তনীয় অবস্থা। আবার কারও কারও মতে নির্বাণ হল একটা অপরিবর্তনীয় শাশ্বত অবস্থা।

সংক্ষেপে এই মতগুলি আলোচনা করা হচ্ছে। যথা,

(ক) নির্বাণ অর্থে অনেকে মনে করেন—অবলুপ্তি, আত্যন্তিক বিনাশ বা অবসান। নির্বাণ লাভ করলে ভোগতৃষ্ণার একান্ত নিরোধ হয় ও কোনরূপ দুঃখ আর থাকে না। নির্বাণ লাভ করলে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের কিরূপ অবস্থা হয় রতনসূত্তে তার উল্লেখ আছে। এই সূত্তে বলা হয়েছে যে নির্বাণ লাভে প্রাচীন সংস্কারগুলি বিনষ্ট হয়, নতুন সংস্কার আর উৎপন্ন হয় না। পুনর্জন্মের প্রতি যাদের বিতরাগ, যাদের মনে কামনা বাসনার কোন স্থান নেই, তারা প্রদীপের মত নির্বাপিত হয়। অর্থাৎ, তেলের অভাবে দীপ যেমন নির্বাপিত হয়, তেমনই সব কামনা বাসনার যখন অবসান ঘটে তখন জন্মান্তরেরও অবসান ঘটে ও জীবের সব অস্তিত্বের বিলোপসাধন হয়।

"খীনং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং
বিরত্তচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং
তে খীনবীজা, অবিরূলিহি চ্ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং পদীপো ॥"—১৪শ রতন সুত্ত।

বুদ্ধদেব কোন শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করায়, তাঁর এই অস্বীকৃতি নির্বাণের অভাবাত্মক ধারণাটিকে সমর্থন করেছে যে, নির্বাণ হল আত্যন্তিক বিনাশ। বুদ্ধদেবের মতে সব কিছুই অনিত্য এবং শাশ্বত বা চিরন্তন আত্মা বলে কোন কিছুই নেই। জীব পাঁচটি স্কন্ধ ছাড়া কছুই নয়। এই পাঁচটি স্কন্ধ আবার ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—রূপ এবং নাম। রূপ অর্থে—পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বায়ু এই চারি ভূতে গঠিত জড়দেহ। নাম অর্থে মানসিক উপাদান। এই উপাদান চারটি—বেদনা বা অনুভূতি, সংজ্ঞা বা ধারণা, সংস্কার বা ক্রিয়াপ্রবণতা এবং বিজ্ঞান বা বিচার-বুদ্ধি। উপরোক্ত পাঁচটি স্কন্ধ বা উপাদানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। সুতরাং নিত্য আত্মা যদি কিছু না থাকে, নির্বাণ বিলুপ্তি (Annihilation or Extinction) ছাড়া আর কি হতে পারে?

কিন্তু নির্বাণ অর্থে যদি অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন হয় তাহলে বৌদ্ধপ্রচারিত বাণীর কোন সার্থকতা থাকে না কারণ অবলুপ্তি বা চিরবিনাশের সম্ভাবনা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে কোন প্রেরণা দিতে পারে না। এ-জাতীয় অভাবাত্মক আদর্শ কোন্ সাধককে সাধনার পথে পরিচালিত করতে পারবে? নির্বাণ হল লোভ, দ্বেষ ও মোহের পাবক নির্বাপিত হওয়া। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নির্বাণ অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ। (Nirvana is the dying out of the three fires of desires, hatred and illusion) তা ছাড়া নির্বাণলাভের পরও বুদ্ধদেব সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং তাঁর অহিংসা, প্রেম, করুণা ও মৈত্রীর বাণী বিশ্বে প্রচার করেছিলেন। সুতরাং দেহবসানের পুর্ব পর্যন্ত বুদ্ধের, সম্পূর্ণ বিলুপ্তি অর্থে নির্বাণলাভ ঘটেছে এমন কথা বলা চলে না। অবশ্য কেহ কেহ নির্বাণ এবং মহানির্বাণের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে বলেন যে, যেদিন বুদ্ধ সত্যকে উপলব্ধি করে দুঃখকে জয় করেছিলেন সেদিন তিনি নির্বাণ লাভ করেছিলেন এবং যেদিন তার দেহাবসান হয় সেদিন তিনি মহানির্বাণ লাভ করেছিলেন। সাধারণতঃ দু প্রকার নির্বাণের কথা বলা হয়। যথা, (১) উপাধিশেষ—এই অবস্থায় মানুষের কামনা বিনাশ প্রাপ্ত হয় (২) অনুপাধিশেষ—যখন সমস্ত সত্তারই বিনাশসাধন হয়ে থাকে। সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করেছে বলা হলে উপাধিশেষ নির্বাণের কথাই বলা হয়ে থাকে। মৃত্যুর পরে মুক্ত জীবের কি অবস্থা হয়—এ জাতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বুদ্ধদেব মৌন থাকতেন। তাঁর মৌন অবস্থা থেকে কোন প্রকারেই অনুমান করা যুক্তিযুক্ত নয় যে নির্বাণেই জীবের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হয়।

(খ) কারও কারও মতে নির্বাণের অর্থ হল এক শাশ্বত আনন্দের অবস্থা। ধর্মপদেই উক্ত আছে নির্বানং পরমং সুখং (সুখবগ্গো, ৮) সংপস্সং বিপুলং সুখং (পকিন্নকবগ্গো, ১)। নির্বাণের অর্থ সকল প্রকার কামনা বাসনার বিলোপসাধন এবং সে অবস্থায় মানুষের রূপাদি

পঞ্চ কাম্য বস্তুর জন্য কামতৃষ্ণা, দ্বেষ ও মোহের উচ্ছেদ সাধিত হয় ও মানুষ এক শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হয়। মন এক পরম শান্তিলাভ করে, চিত্ত প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। এক দিব্য আনন্দের অধিকারী হয়ে সাধক এক অনাবিল শান্তির রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়। 'নির্বাণ শুধু পরম আনন্দ নয়, নির্বাণ পরমশান্তি।'

এই মতবাদের সমালোচনায় বলা হয়েছে যে নির্বাণ শাশ্বত আনন্দের অবস্থা কিনা বলা সম্ভব নয়। জাগতিক সুখ-দুঃখের অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে একে ব্যাখ্যা না করাই যুক্তিযুক্ত। আমাদের জাগতিক সুখ-দুঃখ বিষয়ানুরক্তির সঙ্গে সংযুক্ত। সুতরাং তারই আলোকে নির্বাণের ব্যাখ্যা দেওয়া সমীচিন নয়।

দ্বিতীয়তঃ, নির্বাণকে যদি একটা শাশ্বত আনন্দের অবস্থারূপে স্বীকার করা হয়, তাহলে প্রকারান্তরে একটা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

(গ) অনেকের মতে নির্বাণ হল দুঃখের একান্ত অভাব। এ অবস্থা ভাবাত্মক কি অভাবাত্মক, তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এ হল এমন একটা অবস্থা যাকে আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা চলে না। এ হল উপনিষদের ব্রহ্মের মতন অবাঙ্‌মানসগোচর। এ অবস্থা মানুষের বুদ্ধির অতীত। মানুষের সাধারণ ভাষায় একে ব্যাখ্যা করা চলে না। ডঃ সুরেন দাশগুপ্ত বলেন, "জাগতিক অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাণকে ব্যাখ্যা করা আমার কাছে নিরর্থক কাজ বলেই মনে হয়, এ হল সকল রকম দুঃখ থেকে বিরতি, এ ছাড়া আর অন্য কোন ভাবে এর থেকে ভাল ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যে অবস্থায় সকল রকম জাগতিক অভিজ্ঞতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাকে ভাবাত্মক বা অভাবাত্মক কোন ভাবেই বর্ণনা করা চলে না।"

(ঘ) বৈভাষিক এবং আরও অনেকের মতে নির্বাণ একটি ভাবাত্মক পদার্থ (a positive entity)। নির্বাণ হল একটি শাশ্বত অবস্থা যার কোন পরিবর্তন নেই। নির্বাণের কোন উৎপত্তি নেই, যেহেতু এর কোন কারণ নেই। সমাধির দ্বারা নির্বাণ উৎপন্ন হয় না। মুক্তিকামী সাধক নির্বাণকে প্রাপ্ত হয়, যেহেতু এর উৎপত্তি নেই, সেহেতু এর বিনাশ বা মৃত্যু নেই এবং যেহেতু এ উৎপত্তি, বিনাশ এবং মৃত্যুর অধীন নয়, সেহেতু এ হল শাশ্বত। নির্বাণের অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না, যেহেতু অতীন্দ্রিয় অনুভূতির (Transcendental intution) দ্বারা একে উপলব্ধি করা যায়। নির্বাণ হল অসংস্কৃত ধর্ম (Incomposite category) যা অন্য কোন ধর্মের (Category) কারণ বা ফল নয়।

অনেকে নির্বাণকে অজাত, অভূত, অসংস্কৃত বলে স্বীকার করলেও নির্বাণকে ভাবাত্মক পদার্থরূপে স্বীকার করতে রাজী নন।

প্রশ্ন হল পূর্বোক্ত মতগুলির মধ্যে কোন্ মতটি যুক্তিগ্রাহ্য? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, নির্বাণকে আত্যন্তিক দুঃখনিরোধের অবস্থারূপে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত। দ্বেষ এবং মোহ এদের নির্বাণই নির্বাণ। নির্বাণ যে শাশ্বত আনন্দের অবস্থা এমন কথা বলা চলে না। বস্তুতঃ, বুদ্ধদেব

নির্বাণের অবস্থাকে শাশ্বত আনন্দের অবস্থারূপে কোনখানেই ব্যাখ্যা করেননি। এ ছাড়াও জাগতিক সুখ-দুঃখের অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাণকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সকল রকম দুঃখ থেকে মুক্তিই নির্বাণ। নাগসেন তাঁর শিষ্য মিলিন্দাকে নির্বাণের অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কখনও তাকে সমুদ্র, কখনও বা পর্বতের শৃঙ্গ, কখনও বা মধুর মিষ্টত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এগুলি উপমামাত্রই, এর দ্বারা নির্বাণের প্রকৃত অবস্থাকে হৃদয়ঙ্গম করা কথনও সম্ভব নয়। বুদ্ধ নির্বাণকে কখনও আত্যন্তিক বিনাশ বা চিরবিলুপ্তি বলে স্বীকার করেননি। বুদ্ধের প্রকৃত মনোভাব হয়ত এই যে নির্বাণকে ব্যাখ্যা করতে হলে অভাবাত্মক বর্ণনার সহায়তা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। আর যদি ভাবাত্মক বর্ণনা দেওয়া হয়, তাহলে একথা মনে রাখা যুক্তিযুক্ত যে, এই বর্ণনা নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপটিকে অবহিত হবার প্রচেষ্টা মাত্র—তার স্বরূপের যথাযথ ব্যাখ্যা নয়। নির্বাণকে বর্ণনা করা যায় না, সেকারণে বুদ্ধদেব নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করে তার বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন, নির্বাণ সেই অবস্থা যেখানে জন্ম নেই, রোগ নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, শোক, দুঃখ, কষ্ট, মনস্তাপ বা হতাশা নেই। তবে বুদ্ধদেব নির্বাণের বর্ণনায় যে ভাবাত্মক বিশেষণ ব্যবহার করেননি তা নয়। তবে নির্বাণ যেহেতু অস্তি নাস্তির অতীত অবস্থা তখন সে সম্পর্কে কিছু না বলাই যুক্তিযুক্ত।

চতুর্থ আর্য সত্য : দুঃখনিরোধ মার্গ (The Fourth Noble Truth—The path to Liberation) : বৌদ্ধদর্শনের প্রথম সত্য হল—এ জগত দুঃখময়। দ্বিতীয় সত্য হল, এই দুঃখের কারণ আছে। তৃতীয় সত্য হল যে, এই কারণগুলিকে ধ্বংস করতে পারলে দুঃখ নিরোধ সম্ভব। চতুর্থ সত্য হল এই দুঃখনিরোধের মার্গ বা পথ আছে—যে-পথ অনুসরণ করে দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করা যেতে পারে। এই পথকে বৌদ্ধদর্শনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (Eightfold Noble Path) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই পথ অনুসরণ করতে হলে আট প্রকার কর্মপদ্ধতি বা নিয়মাবলী অনুসরণ করা প্রয়োজন। এই পথকেই বৌদ্ধদর্শনে মধ্যপথ বলা হয়েছে। যেহেতু এই পথ একাধারে 'অসংযত ভোগবিলাস ও অপরদিকে অনাবশ্যক শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন—এই উভয় পথের মধ্যবর্তী পন্থা। মানুষের কল্যাণ কামনায় বুদ্ধদেব এই মধ্য পথের কথা প্রচার করে গেছেন। এই মধ্যপথ অনুসরণ করাই সাধনার সহজ উপায়। এই সাধনায় অসংযত ইন্দ্রিয়ভোগ নেই, অনাবশ্যক কৃচ্ছ্রসাধন

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

এই পথই মধ্য পথ—যেহেতু এই পথ অসংযত ভোগবিলাসের ও শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্যবর্তী পন্থা

নেই। এতে আছে—সংযম, চিত্তের একাগ্রতা, সকল রকম পাপকর্ম ও অসদাচার থেকে বিরত থেকে সদকর্মের অনুষ্ঠান। এ ছাড়া আছে মৈত্রী বা সর্বজীবের হিতকামনা, করুণা বা দুঃখীর প্রতি দয়া, মুদিতা বা অপরের সুখে আনন্দবোধ এবং উপেক্ষা অর্থাৎ অপরের দোষের প্রতি উদাসীনতা। কি বৌদ্ধ ভিক্ষুক, কি সাধারণ মানুষ, যে কোন ব্যক্তিই এই পথ অনুসরণ করতে পারে। বস্তুতঃ, এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যেই বৌদ্ধদর্শনের নীতিতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

নীচে এই আটটি মার্গের কথা আলোচনা করা হচ্ছে :

(ক) **সম্যক্ দৃষ্টি** : চারটি আর্য সত্যের জ্ঞানই হল সম্যক্ দৃষ্টি। আমাদের সকল দুঃখের মূলে অবিদ্যা। এই অবিদ্যা থেকেই উদ্ভূত হয় মিথ্যা দৃষ্টি যা আমাদের এই জগতে ও জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান দেয় না। সুতরাং সত্যের প্রকৃত জ্ঞান বা সম্যক্ দৃষ্টিই অবিদ্যাকে দূরীভূত করতে পারে এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে। সম্যক্ দৃষ্টির অর্থ চারটি আর্য সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

সম্যক দৃষ্টি

(খ) **সম্যক্ সংকল্প** : কেবলমাত্র সত্যের জ্ঞানই জীবকে দুঃখ থেকে মুক্ত করতে পারে না। লব্ধ জ্ঞানানুযায়ী কর্ম করার দৃঢ় সংকল্পের দ্বারাই দুঃখ জয় করা সম্ভব। সুতরাং মুক্তিকামী সাধককে ভোগতৃষ্ণা পরিহার করতে হবে, অপরের প্রতি কু-ভাব বর্জন করতে হবে এবং অপরের ক্ষতিসাধন করা থেকে বিরত হতে হবে। অর্থাৎ পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি অনাসক্তি, ভোগবাসনা জয় করার ইচ্ছা এবং হিংসা, দ্বেষ ও রাগ বিসর্জন দেওয়াই সম্যক্ সংকল্প।

সম্যক্ সংকল্প

(গ) **সম্যক্ বাক্** : সম্যক্ সংকল্পের জন্য প্রয়োজন বাক্-সংযম। সত্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণ, পরনিন্দা, কূট কথার ব্যবহারের দ্বারা অপরকে আঘাত করা এবং বৃথালাপ সর্বতোভাবে বর্জনীয়। সকল অবস্থাতেই সত্য কথা বলা এবং সংযত শিষ্ট ও প্রীতিপদ আলাপ আলোচনায় যোগদান করা যুক্তিযুক্ত।

সম্যক্ বাক্

(ঘ) **সম্যক্ কর্মান্ত :** কেবলমাত্র বাক্-সংযমেই সম্যক্ সংকল্প হয় না, সম্যক্ কর্মান্ত অর্থাৎ সংযত ভাবে আচরণ ও কর্ম করাও একান্ত ভাবে প্রয়োজন। সম্যক্ কর্মান্ত বলতে বোঝায় প্রাণী হত্যা, চৌর্য ও ইন্দ্রিয়সেবা থেকে বিরত হওয়া। স্বার্থবোধে উদ্বুদ্ধ না হয়ে নিষ্কাম ভাবে কর্ম করাই হল সম্যক্ কর্মান্ত। যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে বুদ্ধদেব কখনও সমর্থন করতেন না, বরং ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান অপেক্ষা অন্তরের শুচিতা এবং পবিত্রতার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করতেন। পঞ্চরিপুর অধীনতা স্বীকার করে কোন কার্য সম্পাদন করা যুক্তিযুক্ত নয়।

সম্যক্ কর্মান্ত

(ঙ) **সম্যক্ আজীব :** সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ করাই হল সম্যক্ আজীব। জীবনধারণের জন্য অসৎ পথ অবলম্বন করা উচিত নয়। মিথ্যা ভাষণ এবং অসদাচার থেকে বিরত হয়ে সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ করাই কর্তব্য। দাসত্ব, খাদ্যরূপে পশু বিক্রয়, মাদকদ্রব্য ও বিষ বিক্রয়, বধের জন্য অস্ত্রাদি বিক্রয় সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

সম্যক্ আজীব

(চ) **সম্যক্ ব্যায়াম :** কুচিন্তা ও কুভাব নৈতিক জীবনের শুচিতা নষ্ট করে। মনের মধ্যে এই কুচিন্তা ও কুভাব যদি দৃঢ়ভাবে তাদের মূল প্রোথিত করে তাহলে সদ্‌জীবন যাপন করা কোনমতেই সম্ভব হয় না। সে কারণে একদিকে যেমন মন থেকে অসদ্ চিন্তাকে দূর করা উচিত, তেমনি সদ্‌চিন্তার দ্বারা মনকে সর্বদা পূর্ণ রাখা উচিত।

সম্যক্ ব্যায়াম

সম্যাক্ ব্যায়াম চার প্রকার। যথা : কুচিন্তার বিনাশ সাধন করা, কুচিন্তার উৎপত্তি নিবারণ করা, সদ্‌চিন্তার সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করা এবং সদ্‌চিন্তার উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হওয়া।

(ছ) **সম্যক্ স্মৃতি :** মুক্তিকামী সাধককে সকল সময়ই স্মরণে রাখতে হবে যে দেহ, মন, সংবেদন সকল কিছুই ক্ষণস্থায়ী বা অনিত্য, কোনটিই চিরস্থায়ী বা শাশ্বত নয়। দেহকে দেহ বলেই যদি জানা যায় তাহলে অযথা শোক-দুঃখের হাত থেকে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারি। যে বস্তু যেমন তাকে যদি সেভাবে জানা না যায় তাহলে আসক্তির সৃষ্টি হয় এবং সাংসারিক বন্ধন ও দুঃখের উদ্ভব হয়। দেহ

সম্যক্ স্মৃতি

দেহই, মানসিক অবস্থা মানসিক অবস্থামাত্রই—এগুলির সঙ্গে নিজেকে অভেদ কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। স্থায়ী ব্যক্তি-সত্তার ধারণাই সকল দুঃখের মূল।[1] সম্যক স্মৃতিই অনাসক্তির সৃষ্টি করে মুক্তিকামী সাধককে নির্বাণের পথে পরিচালিত করে।

সম্যক্ সমাধি

(জ) **সম্যক্ সমাধিঃ** এটি হল অষ্টমার্গের শেষ মার্গ। যে-ব্যক্তি পূর্বোক্ত সাতটি কর্মবিধি অনুসরণ করে, সকল প্রকার অসদচিন্তা ও ভাবনা থেকে মনকে মুক্ত করতে পেরেছে, নিজের আচরণকে সংযত করে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতে পেরেছে, তিনিই সমাধির মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করতে পারেন। বস্তুতঃ, পূর্বোক্ত সাতটি মার্গ সমাধির উপযুক্ত ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করে।

সমাধির চারটি স্তর

এই সমাধির চারটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে সাধককে চারটি মহান সত্যের ওপর মনকে নিবিষ্ট করতে হবে। তিনি বিতর্ক এবং বিচারের মাধ্যমেই সত্যের ধ্যানে সমাহিত থাকবেন। এই অবস্থায় বিশুদ্ধ চিন্তা ও অনাসক্তি থেকে উদ্ভূত এক আনন্দের অধিকারী তিনি হবেন—মনের মধ্যে দেখা দেবে প্রীতি এবং সুখ। এই প্রথম জ্ঞানের (first meditation) উপাদান হল বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা। সমাধির দ্বিতীয় স্তরে বিতর্ক এবং বিচারের আর কোন অবকাশ নেই। মন থেকে সকল রকম সন্দেহ দূরীভূত হওয়াতে মন হয় তখন অবিক্ষুব্ধ বা প্রশান্ত। সকল রকম চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে প্রীতি ও সুখের ওপর মনকে নিবিষ্ট করতে হয়। তৃতীয় স্তরে এই প্রীতির অনুভূতির প্রতি উপেক্ষা (indifference) জাগে। কেবলমাত্র থাকে একটা শুদ্ধ প্রশান্তির ভাব এবং তার সাথে থাকে একটা ক্ষীণ দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ। চতুর্থ স্তরে এই শেষ সুখের অনুভূতিও মিলিয়ে যায়। এই শেষ পর্যায়ই

দ্বিতীয় স্তরে মন সর্ব চিন্তামুক্ত

তৃতীয় স্তরে প্রীতির অনুভূতির প্রতি উপেক্ষা

1. "Individuality born of avidya is the crux of all life, the original sin of all existence".

—S. Radhakrisnan : Indian Philosophy. Vol. 1. Page. 416.

নির্বাণের অবস্থা। এই অবস্থায় সুখ-দুঃখের কোন অনুভূতিই থাকে না। প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়াতে মুক্তিকামী সাধক সত্যকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং জগৎ ও জীবনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। সাধক নির্বাণ লাভ করে, তার আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকে না এবং সকল রকম দুঃখ থেকে তিনি মুক্ত হন।

চতুর্থ স্তরই নির্বাণের অবস্থা—সত্যের পূর্ণ উপলব্ধি

অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিভাগঃ বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গিক মার্গ তিনটি স্কন্ধে বিভক্ত। এই তিনটি স্কন্ধ হল প্রজ্ঞা (right knowledge), শীল (right conduct) এবং সমাধি (right concentration)। প্রথম স্কন্ধ হল প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার অর্থ সম্যক্ জ্ঞান। প্রজ্ঞাই অবিদ্যা নাশ করে। সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প এই স্কন্ধের অন্তর্গত। দ্বিতীয় স্কন্ধ হল শীল। শীল মানে সম্যক আচরণ। ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানকে আচরণ থেকে কখনও বিযুক্ত করে দেখা হয়নি। সম্যক্ আচরণের জন্যই যে সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন, তা নয়। সম্যক্ আচরণ সম্যক্ জ্ঞানের পূর্ণতা আনে। সকল রকম পাপ কার্য থেকে বিরত হয়ে শুদ্ধ ও পবিত্র মনে কর্ম সম্পাদন করাই হল শীল। শীল হল স্বভাব, সংযম ও বিধিনিষেধ। শীলের সহায়তায় মন পবিত্র ও চিত্ত প্রশান্ত হয়; জাগতিক বিষয়বস্তুর প্রতি অনাসক্তি জাগ্রত হয়ে নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদন করার প্রবৃত্তি জাগে। সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত ও সম্যক্ জীবিকা শীলের স্কন্ধের অন্তর্গত। তৃতীয় স্কন্ধ সমাধি বা ধ্যান—স্থির মনে, ধ্যানস্থ হয়ে সত্যের ওপর মনকে নিবিষ্ট করা। সম্যক ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি—এই তিনটি এ স্কন্ধের অন্তর্গত। এই সমাধির পাঁচটি উপাদান—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ তিনটি স্কন্ধে বিভক্ত—প্রজ্ঞা, শীল এবং সমাধি

এ ছাড়া আছে দশটি নিষেধ বা দশটি অকুশল কর্মের কথা। প্রাণীহত্যা, চৌর্যবৃত্তি, কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদবাক্য, কটূকথা বলা, নিরর্থক কথা বলা, পরদ্রব্যে লোভ, হিংসা এবং বিপরীত জ্ঞান।

বৌদ্ধ-দার্শনিকতত্ত্ব (Philosophical Background of Buddha's Ethics) ঃ

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, বুদ্ধদেব তত্ত্ববিদ্যার জটিল সমস্যার আলোচনায় কোন আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। তবু তাঁর নৈতিক শিক্ষার মূলে কতকগুলি দার্শনিক তত্ব আছে এবং তার নীতিশাস্ত্র এই দার্শনিক তত্বগুলির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই দার্শনিক তত্ত্বগুলি হল প্রধানতঃ—(১) **প্রতীত্য সমুৎপাদবাদ** (২) **কর্মবাদ** (৩) **অনিত্যবাদ** এবং (৪) **অনাত্মাবাদ**।

বুদ্ধদেবের নৈতিক শাস্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি

(i) প্রতীত্য সমুৎপাদবাদ (The Theory of Dependent Origination or Conditional Existence of things) ঃ এ সংসারে বিনা কারণে বা আকস্মিকভাবে কিছু ঘটতে পারে না। যা কিছু ঘটে, তা কোন না কোন কারণের ওপর নির্ভর করেই ঘটে। এই কার্যকারণ সম্বন্ধ একটি সার্বিক ও অবশ্যস্বীকার্য নিয়ম এবং বৌদ্ধবাদ অনুসারে এ নিয়ম স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ জগতের মধ্যে কাজ করে চলেছে। কোন ঈশ্বর বা কোন অতীন্দ্রিয় চেতন সত্বা একে পরিচালিত করছে না। এই কার্যকারণ নিয়মকেই 'প্রতীত্য সমুৎপাদবাদ' (Theory of Dependent Origination) বলা হয়। সমুৎপাদ কথাটির অর্থ উদ্ভব এবং প্রতীত্য সমুৎপাদ কথাটির অর্থ কোন কিছুকে অবলম্বন করে অপর বস্তুর উৎপাদ বা উদ্ভব। যা কিছু ঘটে তা কোন পূর্ববর্তী কারণের ওপর নির্ভর। যে কোন ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনা থেকেই সমুৎপন্ন হয়। যা কিছু আছে, তা কারণপরম্পরা থেকে উদ্ভূত।

প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতির অর্থ যা কিছু আছে তা কারণপরম্পরা থেকে উদ্ভূত

এ মতবাদ অনুসারে জগতে কোন পরিণতি কারণের (final cause) স্থান নেই, এমন কোন শাশ্বত সত্বা নেই যা কারণনির্ভর না হয়ে অনন্তকাল ধরে বিরাজ করতে পারে। অপরপক্ষে যার অস্তিত্ব রয়েছে, তা বিলীন হবার পূর্বে কোন না কোন কার্যোৎপাদন করবেই। সুতরাং যার অস্তিত্ব রয়েছে, তার অস্তিত্বের কারণরূপে পূর্ববর্তী কারণ আছে।

কোন পরিণতি কারণের অস্তিত্ব নেই

বুদ্ধদেব এই মতবাদটির ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং একে ধর্মরূপে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধের মতে তাঁর শিক্ষার যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এই নীতিকেই সর্বপ্রথম বুঝে নেওয়া দরকার। তাছাড়া, বুদ্ধদেবের চারিটি আর্য সত্যও এই নীতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এই নীতির সাহায্যেই তিনি দুঃখের উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করেছেন ও দুঃখ নিরোধের উপায় নির্দেশ করেছেন এবং একেই ভিত্তি করে বুদ্ধদেব এ জগৎ ও জীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া, বুদ্ধদেবের অন্যান্য দার্শনিক মতবাদগুলিও এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতিই হল ধর্ম

বুদ্ধদেবের চারটি আর্য সত্য এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত

(ii) **কর্মবাদ (The Theory of Karma)**ঃ বুদ্ধদেবের কর্মবাদ তাঁর প্রতীত্য সমুৎপাদবাদেরই একটি ভিন্ন রূপ মাত্র। কর্মবাদ অনুযায়ী মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যে যেরূপ কর্ম করবে তাকে সেরূপ ফল ভোগ করতে হবে। কর্মবাদের নীতিটি বৌদ্ধধর্ম থেকেও প্রাচীন, যেহেতু বেদে এই কর্মবাদের উল্লেখ আছে। এ হল এমন একটি নীতি যা মানুষের এবং দেবতাদেরও মান্য করতে হয়—এই নীতি অলঙ্ঘনীয়।

কর্মবাদ প্রতীত্য সমুৎ-পাদবাদেরই একটি ভিন্ন রূপ

প্রতীত্য সমুৎপাদ মতবাদ অনুযায়ী প্রতিটি ঘটনারই একটি পূর্ববর্তী কারণ আছে। সেকারণে আমাদের বর্তমান জীবন অতীত কর্মের ফল। আবার বর্তমান জীবনের কার্যের দ্বারাই আমাদের ভবিষ্যৎ বা পরজন্ম নির্ধারিত হবে। পূর্বজন্ম, বর্তমান জীবন ও পরজন্ম—এই তিনটির মধ্যে যে যোগসূত্র তার মূলে আছে আমাদের কৃতকর্ম। মিলিন্দ-পঞ্হ-তে[1] নাগসেনকে বলতে দেখি যে, কর্মের পার্থক্যের জন্যই সব মানুষ একরকম হয় না, কেউ দীর্ঘায়ু, কেউ স্বল্পায়ু, কেউ স্বাস্থ্যবান্, কেউ রুগ্ন, কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত ইত্যাদি। বুদ্ধদেবের মতে আমাদের কৃতকর্মের ফল বিনষ্ট হয় না, তা সঞ্চিত থাকে। সে কারণে এক জীবনে যদি কর্মফল ভোগ শেষ না হয়,

কর্মফল ভোগ শেষ না হলে তার বিনাশ নেই

1. গ্রীকরাজা মিলিন্দ এবং ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তাই মিলিন্দ-পঞ্হ নামে পরিচিত।

তাহলে পরজন্মে সেই ফল ভোগ করতে হয়। এই ফলভোগ কার্যকারণবাদ নিয়মানুসারে ঘটে থাকে ও এর জন্য কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

কর্ম দু'প্রকার—সকাম ও নিষ্কাম। রাগ, দ্বেষ ও মোহযুক্ত হয়ে যে কর্ম করা যায় তা সকাম। এই সকাম কর্ম বাসনা থেকে উদ্ভূত ও সংসারের প্রতি আমাদের বন্ধন সূচনা করে। কিন্তু জগৎ ও জীবনের স্বরূপ জেনে এবং লোভ, দ্বেষ ও মোহ মুক্ত হয়ে যদি কর্ম সম্পাদন করা যায় তাহলে সে কর্ম হল নিষ্কাম কর্ম ও তার ফলে আর পুনর্জন্ম হয় না। জীব নির্বাণপ্রাপ্ত হয় ও তার দুঃখ ভোগেরও আত্যন্তিক বিনাশ ঘটে। নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্ম করলেও সংসার বন্ধনে বাঁধা পড়ে না। বুদ্ধদেব একটি উপমার সাহায্যে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন আগুনে ভাজা শুক্‌না বীজ বপন করলে তার থেকে ফলোৎপাদন সম্ভব হয় না তেমনই নির্বাণলাভের পর সাধক যে সব কর্ম করে সেগুলি থেকে ফলোৎপাদন হয় না। এখন প্রশ্ন হল কর্মবাদকে স্বীকার করলে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কি ভাবে সমর্থন করা যায়? যা কিছু ঘটে তাই যদি কর্মের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয় তবে ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও উৎসাহের স্থান কোথায়? কর্মবাদের নিয়মের সঙ্গে সমতা রেখে কাজ না করে তার উপায় কি?

নিষ্কাম কর্মের কোন কর্মফল ভোগ নেই

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ইচ্ছার স্বাধীনতাকে বুদ্ধদেব অস্বীকার করেননি, বরং ইচ্ছার দ্বারা ও স্বাধীন কর্মের দ্বারা শেষ পর্যন্ত এই কর্মবাদকেও জয় করার কথা বলেছেন। বুদ্ধের কাছে কর্মবাদ কোন যান্ত্রিক নীতি নয়, বর্তমান অতীতের দ্বারা নির্ধারিত হলেও ভবিষ্যৎ জীবের ইচ্ছা ও কর্মের ওপরই নির্ভর। কর্মবাদ একথাই বলে যে, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বর্তমান অবস্থাই অতীতের একমাত্র সম্ভাব্য পরিণতি। অতীতে ভিন্ন কর্ম করলে বর্তমান অবস্থা অন্যরূপও হতে পারত। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মতে কর্মবাদের যান্ত্রিক ভ্রান্তিজনক ব্যাখ্যা (mechanical misinterpretation) কর্মবাদের সঙ্গে নীতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের সংঘর্ষ সৃষ্টি করে।

কর্মবাদের সঙ্গে ইচ্ছার স্বাধীনতার কোন বিরোধিতা নেই

(iii) সর্বব্যাপক পরিবর্তনবাদ ও অনিত্যবাদ (The Doctrine of Universal Change and Impermanence)ঃ বুদ্ধদেবের মতে 'সর্বং অনিত্যম্'। সব কিছুই অনিত্য, কোন কিছুই শাশ্বত বা চিরন্তন নয়। 'যং কিঞ্চি সমুদয় ধম্মং, সর্ব্বং তং নিরোধ ধর্মং তি'।[1] অর্থাৎ যার উৎপত্তি আছে, তারই নিরোধ আছে বা ব্যয় আছে। সে কখনও অব্যয় বা অক্ষয় হতে পারে না অর্থাৎ সে অনিত্য। বুদ্ধদেবের অনিত্যবাদ প্রতীত্যসমুৎপাদ থেকে উদ্ভূত। প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুযায়ী সব কিছুরই কারণ আছে। সুতরাং কারণটি যখন আর থাকে না, তখন ঘটনাটিরও পরিবর্তন ঘটে। কারণ ক্রিয়া করলে কার্যের আবির্ভাব হয়। আর কারণ ধ্বংস হলে কার্যেরও তিরোভাব হয়ে থাকে।

অনিত্যবাদ অনুসারে কোন কিছুই শাশ্বত বা চিরন্তন নয়

জীবন ও জগতের নিত্য পরিবর্তন ও ক্ষণস্থায়ীত্বের কথা অনেক লেখক এবং দার্শনিক বলেছেন। গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লাইট্রাস বলেছেন, একই নদীতে আমরা দুবার অবগাহন করতে পারি না। যেহেতু দ্বিতীয়বার অবগাহনের সময় পুরাতন স্রোতের বদলে নতুন স্রোতের ধারা বয়ে চলেছে। দার্শনিক বার্গসোঁর মতে এ জগত নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং অনাদি অনন্ত প্রাণপ্রবাহ (elan vital) প্রতিনিয়ত নূতন নূতন পরিবর্তন সৃষ্টি করে চলেছে। বুদ্ধদেবও জগতের নিত্য পরিবর্তনশীলতা এবং সকল বস্তুর অনিত্যতা দেখে তার অনিত্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অর্থাৎ সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিকগণ বুদ্ধদেবের অনিত্যবাদকেই ক্ষণিত্ববাদে (The Theory of Momentariness) পরিণত করেন। এ মতবাদ অনুযায়ী কেবলমাত্র জগতের সব কিছুই যে অনিত্য তা নয়, প্রতিটি বস্তুই একটিমাত্র ক্ষণের (moment) জন্য স্থায়ী হয়। অর্থাৎ একটি ক্ষণের অধিক স্থায়ী হয় না। কোন বস্তুরই শাশ্বত বা চিরন্তন সত্তা নেই, তার সত্তা হল একটি ক্ষণিকের জন্য। 'সর্বং ক্ষণিকং সত্বাৎ'।

পরবর্তী বৌদ্ধগণ অনিত্যবাদকে ক্ষণিকত্ববাদে পরিণত করে

রতনকীর্তি (৯৫০ খ্রীঃ অঃ) যুক্তির সাহায্যে সকল সত্তার ক্ষণিকত্ব প্রমাণ করেন। যে যুক্তি বা মতবাদের সাহায্যে এই ক্ষণিকত্ববাদটিকে সমর্থন করা

1. মজ্ঝিমনিকায়,—১৪৭ সূত্ত।

হয়, তা হল 'অর্থক্রিয়কারিত্ব লক্ষণম্ সৎ'—কোন কিছুর সত্তা বা অস্তিত্বের মূলে তার কার্যোৎপাদনের ক্ষমতা।) যে কিছুরই অস্তিত্ব আছে তার কার্যোৎপাদনেরও ক্ষমতা আছে। ধরা যাক্ আকাশ-কুসুম বা শশক-শৃঙ্গ। এ জাতীয় বস্তুর কোন কার্যোৎপাদনের ক্ষমতা নেই। কাজেই এর কোন সত্তাও নেই, এগুলি অলীক। কাজেই যা কিছুর সত্তা বা অস্তিত্ব আছে, তা ক্ষণিক হতে বাধ্য, কারণ সত্তা মানেই কার্যোৎপাদন করা এবং বিভিন্ন সময়ের কার্য বিভিন্ন প্রকার।

অর্থক্রিয়াকারিত্বলক্ষণম্ মতবাদটিই ক্ষণিকত্ববাদের ভিত্তি

(বৌদ্ধগণের ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকরা অভিযোগ এনেছেন যে ক্ষণিকত্ববাদকে স্বীকার করে নিলে অনবস্থা দোষ (fallacy of infinite regress) ঘটে। সত্তার অস্তিত্ব প্রকাশ পায় তার কার্যোৎপাদনের মাধ্যমে, কাজেই কোন সত্তাকে জানতে হলে তার কার্যটিকে জানতে হয় ও এই কার্যটির সত্তাটিকে জানতে হলে তার উৎপন্ন কার্যটিকে জানতে হয় এবং এভাবে চললে অনবস্থা দোষ দেখা দেয়। কাজেই কোন বস্তুকে জানা যায় না বা অর্থক্রিয়াকারিত্বকেই সত্তার অস্তিত্বের কারণরূপে গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া, সব কিছুই যদি ক্ষণিক হয় তাহলে এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করার জন্য কোন সনাতন দ্রষ্টা পাওয়া যাবে না এবং সব কিছুই ক্ষণিক হওয়ার জন্য অনুমানও অসম্ভব হয়ে পড়বে। উত্তরে রতনকীর্তি বলেন যে, যেহেতু ক্ষণিকত্বের প্রমাণ অনুমানসিদ্ধ এবং যেহেতু অন্বয় ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তির সাহায্যে এই ক্ষণিকত্ব প্রমাণ করা যায়, সেহেতু অন্বয় ও ব্যতিরেক ব্যাপারে কোন সনাতন দ্রষ্টার প্রয়োজন নেই।)

ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকদের অভিযোগ

রতনকীর্তির নৈয়ায়িক অভিযোগ খণ্ডন

দ্বিতীয়তঃ, রতনকীর্তির মতে অর্থক্রিয়াকারিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। বীজের সত্তা মানেই চারাগাছ উৎপাদন করা, এছাড়া বীজের সত্তার কোন অর্থ হয় না। বীজটি যদি ক্ষণকাল স্থায়ী না হয়ে অধিককাল স্থায়ী হয়, তাহলে মনে করতে হবে যে, প্রতিটি ক্ষণেই এটি কোন কার্যোৎপাদন করবে। আর যদি বীজটির কোন পরিবর্তন না হয়, তাহলে মনে করতে হবে যে, প্রতিটি মুহূর্তে এই বীজটি একই ধরনের কার্যোৎপাদন করবে।

বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বরের স্থান (Place of God in Buddha Philosophy) :

বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাদের মতে পরিণতি কারণ (final cause) রূপে কোন জগৎ-কর্তার অস্তিত্ব নেই, কেননা পরিণতিকারণ বলেই কিছু নেই। প্রত্যেকটি কার্যেরই পূর্ববর্তী কারণ আছে। তাছাড়া, নৈতিক অগ্রগতির জন্যও কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই, যেহেতু ঈশ্বরের ধারণা নিষ্ক্রিয়তা এবং দায়িত্বহীনতার সৃষ্টি করে। ঈশ্বর যদি সকল কিছুরই কারণস্বরূপ হয় তাহলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অবকাশ কোথায়? যদি মন্দকে তিনি ঘৃণা করেন এবং মন্দের কর্তৃত্ব স্বীকার না করেন তাহলে তাকে সর্বময় কর্তা বলা চলে না। ঈশ্বরের করুণার যদি অসীম শক্তি থাকে, যা পাপীকে এক মুহূর্তে সাধুতে পরিণত করতে পারে তাহলে ধর্ম আচরণের ও চরিত্র গঠনের প্রতি মানুষের কোন উদ্যমই পরিলক্ষিত হবে না। বুদ্ধের মতে কর্মবাদের পরিসীমা এতই ব্যাপক যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কর্মবাদের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কর্মের থেকে বড় কিছু নেই, যেহেতু কর্মের দ্বারাই জগতের দুঃখের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কর্মের ফলেই জীবের উদ্ভব, জীবের সৃষ্টিকর্তারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য সাধারণতঃ যে সব যুক্তি উপস্থাপিত করা হয় প্রাচীন বৌদ্ধগণ সেগুলি স্বীকার করে না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণগুলির মধ্যে একটি হল বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক বা পরিণতি কারণবিষয়ক যুক্তি (The cosmological or Causal Argument)। এই যুক্তি অনুসারে এই জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে কোন একটি পরিণতি কারণ (Final cause) থাকা দরকার। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধদের মতে স্বয়ংসৃষ্ট কোন পরিণতি কারণ থাকতে পারে না। বীজ থেকে যেমন গাছ হয়, ঠিক তেমনি এই জগৎ-প্রবাহের কারণ জগতই। কোন চেতন সত্বার অস্তিত্ব

নৈতিক অগ্রগতির জন্য ঈশ্বরের ধারণার কোন প্রয়োজন নেই

কর্মবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণাকে প্রয়োজনহীন প্রতিপন্ন করে

বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণগুলি লঙ্ঘন করেন

কোন পরিণতি কারণ থাকা সম্ভব নয় জগতের কারণ জগৎ নিজেই

স্বীকার করার প্রয়োজন নেই, বস্তু এবং চিন্তা সবই কর্মফল। পূর্ববর্তী কোন কারণ থেকে উদ্ভূত নয় এমন কোন স্বয়ংসৃষ্ট পরিণতি কারণের ধারণার মধ্যেই আত্মবিরোধ আছে। অপর একটি প্রমাণ—উদ্দেশ্যবাদ বিষয়ক যুক্তিও (Teleological Argument) গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এই জগৎ বহু ত্রুটিতে পূর্ণ। ঈশ্বর যদি পূর্ণ (Perfect) হন তবে এই অপূর্ণ জগতের স্রষ্টাকর্তা তিনি কি ভাবে হতে পারেন ? কোন করুণাময় ঈশ্বর বা খেয়াল এই জগতকে নিয়ন্ত্রিত করছে না। জগত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটি নিয়মের দ্বারা, বা নিয়ম জগতের মধ্যেই নিহিত। বস্তুতঃ ঘটনা কি ভাবে ঘটছে, কেন ঘটছে, সে সম্পর্কে যদি আমরা অবহিত হই, তাহলে জগৎ-বহির্ভূত কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

পূর্ণ ঈশ্বর অপূর্ণ জগতের স্রষ্টাকর্তা হতে পারেন না

উপসংহার :

বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন তত্ত্বগুলি আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে বৌদ্ধদর্শনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে। যথা,

প্রথমতঃ, বৌদ্ধদর্শন প্রাকৃতবাদী (Positivist) অর্থাৎ যা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় তাই সত্য। আত্মা এবং ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, সুতরাং এগুলি সত্য নয়। এ জগতের আড়ালে কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব নেই এবং কোন শাশ্বত বা সনাতন আত্মার অস্তিত্ব নেই।

বৌদ্ধদর্শন প্রাকৃতবাদী

দ্বিতীয়তঃ, বৌদ্ধদর্শন দুঃখবাদী (Pessimistic)। দর্শনের এ হল একটি মূল কথা। তবে মানুষ এই জীবনেই নিজের প্রচেষ্টায় দুঃখকে জয় করতে পারে।

বৌদ্ধদর্শন দুঃখবাদী

তৃতীয়তঃ, বৌদ্ধদর্শন হল প্রয়োজনবাদী (Pragmatic)। প্রয়োজনবাদ অনুসারে সেই ধারণাই সত্য, যা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে। কি ভাবে দুঃখ জয় করা যেতে পারে বুদ্ধদেব সেই শিক্ষাই দিয়েছিলেন। দুঃখ থেকে মানুষ কি ভাবে মুক্তি লাভ করতে পারে এই ছিল বুদ্ধদেবের প্রধান জিজ্ঞাসা। দর্শনের জটিল তত্ত্বালোচনায়

বৌদ্ধদর্শন প্রয়োজনবাদী

তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি বলতেন দর্শন নয়, শান্তিই মানুষকে শুচি করে তোলে।

বুদ্ধকে অজ্ঞেয়তাবাদী বলা যুক্তিযুক্ত নয়

অনেকে মনে করেন যে, বুদ্ধ ছিলেন অজ্ঞেয়তাবাদী (Agnostic)। যেহেতু দর্শনের জটিল প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি মৌন থাকতেন, সেহেতু কোন কোন সমালোচক এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, চিরন্তন সত্তা সম্পর্কে তাঁর সঠিক জ্ঞান ছিল না। কিন্তু এরূপ ধারণা খুবই ভ্রমাত্মক। বুদ্ধ ছিলেন যথার্থ জ্ঞানী এবং সত্যকে প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

জীবনের ব্যবহারিক দিকটির ওপরই বুদ্ধ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সে কারণে ভিক্ষুদের উদ্দেশ করে তিনি যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ হল এই যে, নৌকা যদি জলপূর্ণ থাকে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে পারে না, তার ডুবে যাবার ভয় থাকে ; সেক্ষেত্রে নৌকা থেকে জল সিঞ্চনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অনুরূপ ভাবে দেহরূপ নৌকা থেকে বৃথা বিতর্কাদিরূপ জল সিঞ্চন করলে দেহ লঘু হয় এবং রাগ-দ্বেষাদির বন্ধন ছেদন করে নির্বাণ সাগরে উপনীত হওয়া যায়।[1]

---

1. "সিঞ্চ ভিক্খু ইমং নাবং, সিত্তাস্তে লহুমেস্সতি,
ছেত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নির্বাণ মেহিসি।"

—ধর্মপদ : ভিক্খুবগ্গো—১০ সুত্ত।

তৃতীয় অধ্যায়
বৌদ্ধ-দর্শন সম্প্রদায়
(The Schools of Buddha Philosophy)

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে বুদ্ধদেব দার্শনিকতত্ত্বের আলোচনায় কোন আগ্রহ প্রকাশ করতেন না এবং এ সম্পর্কে তাঁকে কোন প্রশ্ন করা হলে তিনি নীরব থাকতেন। কিন্তু তাঁর এই উদাসীনতা এবং মৌনতা থেকেই এক নতুন দর্শনের সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুতঃ, বুদ্ধদেব সত্যোপলব্ধির জন্য বিচার এবং যুক্তিকে প্রাধান্য দিতেন। প্রত্যক্ষণ এবং বিচার-বিশ্লেষণের ওপর তিনি খুব গুরুত্ব আরোপ করতেন। বুদ্ধদেবের সম্পর্কে উক্ত আছে যে, তিনি বলতেন—'শ্রদ্ধাবশতঃ কেউ যেন আমার নীতি গ্রহণ না করে। সোনাকে যেমন আগুনে পুড়িয়ে তার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে নেওয়া হয়, আমার নীতিকেও সর্বপ্রথম সে ভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া হোক।'

বুদ্ধদেবের তত্ত্বালোচনার প্রতি উদাসীনতা থেকেই এক নতুন দর্শনের উদ্ভব

বুদ্ধদেব কোন দার্শনিক মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে প্রচার করেননি সত্য কিন্তু তাঁর নৈতিক শিক্ষার মধ্যেই দার্শনিক মতবাদের বীজ সুপ্ত ছিল। দর্শনে আমরা প্রাকৃতবাদী (Positivist), অভিজ্ঞতাবাদী (Empiricist) বা আভাসবাদী (Phonomenalist) প্রভৃতি নাম ব্যবহার করি। বৌদ্ধ-দর্শনকেও আমরা এই নামগুলির দ্বারা অভিহিত করতে পারি। বৌদ্ধ-দর্শন প্রাকৃতবাদী, যেহেতু এই দর্শন অনুসারে যা প্রত্যক্ষের বিষয় তাই সত্য। বুদ্ধদেব এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিদৃশ্যমান জগতের ওপরই তাঁর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন, কোন অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে তাকাননি। বৌদ্ধ-দর্শন অভিজ্ঞতাবাদী, যেহেতু বুদ্ধদেব অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের উৎস বলে মনে করতেন এবং বৌদ্ধ-দর্শন পরিদৃশ্যমানবাদী, যেহেতু এই দর্শন অনুসারে জগতের পরিদৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকেই কেবলমাত্র যথার্থ ভাবে জানা যায়।

বৌদ্ধদর্শন প্রত্যক্ষবাদী, অভিজ্ঞতাবাদী ও পরিদৃশ্যমানবাদী

বুদ্ধদেব জীবিত থাকাকালীন তাঁর শিষ্যবর্গ তাঁর নির্দেশ অনুসারে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর যখন তাঁর ধর্ম দিকে দিকে এবং দেশে দেশে প্রচারিত হতে লাগল তখন বুদ্ধদেবের ধর্মমতকে নানা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল; ফলে প্রতিপক্ষের অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য তাঁর শিষ্যবর্গ বৌদ্ধ-দর্শনের বিভিন্ন দিকগুলির পূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ দার্শনিক আলোচনায় নিজেদের নিয়োজিত করলেন।

অীতন্দ্রিয় জগত সম্পর্কীয় আলোচনার ব্যাপারে বুদ্ধদেব নীরবতা অবলম্বন করতেন। বুদ্ধদেবের এই নীরবতাকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বুদ্ধদেবের নীরবতাকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে

অনেকে মনে করেন যে, যেহেতু বুদ্ধদেবে ছিলেন অভিজ্ঞতাবাদী এবং অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র জ্ঞানের উৎস বলে মনে করতেন সেহেতু তাঁর এই নীরবতার মুলে ছিল সংশয়বাদ (Scepticism)। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্পর্কেই আমাদের যখন সঠিক জ্ঞান নেই, তখন অতীন্দ্রিয় বস্তু সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা কি ভাবে সম্ভব? কারও কারও মতে বুদ্ধদেবের এই নীরবতার মূলে আছে অজ্ঞেয়তাবাদ (Agrosticism); অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব আছে কিন্তু তা আমাদের অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। আবার অনেকের মতে বুদ্ধদেবের এই নীরবতার মূলে আছে অতীন্দ্রিয়বাদ (Mysticism or transcendentalism)। বুদ্ধদেব এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উর্ধ্বে এক অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন, কিন্তু তিনি মনে করতেন যে, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অতীন্দ্রিয় জগতকে জানা সম্ভব নয়। নির্বাণ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের যে অভিমত তা এই অতীন্দ্রিয়বাদকেই সমর্থন করে। বুদ্ধদেব বলতেন যে, নির্বাণ হল অস্তি-নাস্তির অতীত অবস্থা। নির্বাণ হল মানুষের চিন্তার অতীত এক অবস্থা এবং নঞর্থক বর্ণনার দ্বারাই একে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের কথায়—'এ হল সর্বাতীত নিঃশব্দ' (It is the silent beyond)।

কারও মতে এই নীরবতার মূলে সংশয়বাদ;—

কারও মতে এই নীরবতার মূলে অজ্ঞেয়তাবাদ

কারও মতে এই নীরবতার মূলে অতীন্দ্রিয়বাদ

বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে প্রায় তিরিশটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে ছিল। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে চারটি সম্প্রদায় দার্শনিক মতবাদের আলোচনার মুখ্য অংশ গ্রহণ করেছিল। এই চারটি দার্শনিক সম্প্রদায় বিশেষ করে দুটি বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত; যথা: (১) **হীনযান** ও (২) **মহাযান**।

দুটি প্রধান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়—হীনযান ও মহাযান

হীনযানিরা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে, সে কারণে তাদের বলা হয় সর্বাস্তিবাদী। অপর পক্ষে মহাযানীরা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। হীনযানীরা হল বস্তুবাদী (Realists) এবং মহাযানীরা হল ভাববাদী (Idealists)। মাধ্যমিকবাদ বা শূন্যবাদ ও যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদ দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্ত এবং সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক দার্শনিক মতবাদ প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত। সৌত্রান্তিকদের মতবাদকে বাহ্যানুমেয়বাদও বলা হয়; যেহেতু এদের মতানুসারে বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না, অনুমানের বাহ্য সহায়তায় জানতে হয়। বৈভাষিকদের মতে বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়, সেহেতু এদের অভিমতকে বলা হয় বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদ। এই শ্রেণীবিভাগকে একটি ছকের সাহায্যে নিম্নলিখিভাবে দেখান হচ্ছে:

বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক হীনযান সম্প্রদায়ের এবং যোগাচার ও মাধ্যমিক মহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত

বৌদ্ধ-সম্প্রদায়

- হীনযান (বস্তুবাদী) (Realist)
  - বৈভাষিক (বাহ্য-প্রত্যক্ষবাদ) (Doctrine of Direct Empiricism)
  - সৌত্রান্তিক (বাহ্যানুমেয়বাদ) (Doctrine of Representative Empiricism)
- মহাযান (ভাববাদী) (Idealist)
  - যোগাচার (বিজ্ঞানবাদ) (Subjective Idealism)
  - মাধ্যমিক (শূন্যবাদ) (Nihilism)

বিশেষ করে দুটি প্রশ্নকে ভিত্তি করে বৌদ্ধ-দর্শনের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটি তত্ত্বশাস্ত্রবিষয়ক, অর্থাৎ জাগতিক বা মানসিক কোন সত্তার (Reality) অস্তিত্ব আছে কি না? দ্বিতীয় প্রশ্নটি জ্ঞানবিষয়ক—অর্থাৎ সত্তাকে জানার উপায় কি? বিভিন্ন দর্শনসম্প্রদায় পূর্বোক্ত প্রশ্নের বিভিন্ন রকম উত্তর দিয়েছেন।

দুটি প্রশ্ন—কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব আছে কিনা এবং এই সত্ত্বাকে জানার উপায় কি?

(ক) **মাধ্যমিক মতবাদ ঃ** এই মতবাদ অনুযায়ী জড়বস্তু বা মন কোন কিছুরই সত্তা নেই, সবই শূন্য। এ কারণে **মাধ্যমিক-বাদকে শূন্যবাদ (Nihilism) বলা হয়।** জড়জগত এবং মনোজগত দুই-ই মিথ্যা।

মাধ্যমিক মতবাদ

(খ) **যোগাচার মতবাদ ঃ** এই মতবাদ অনুসারে জড়বস্তুর সত্তা নেই সত্য, কিন্তু চেতনার সত্তা আছে। ভারতীয় দর্শনে চেতনাকে বিজ্ঞান বলা হয়, সেহেতু এই মতবাদকে বিজ্ঞানবাদ নামেও অভিহিত করা হয়।

যোগাচার মতবাদ

(গ) **সর্বাস্তিবাদ ঃ** এই মতানুসারে সকল কিছুরই অস্তিত্ব আছে। জড়বস্তু ও মন বা চেতনা উভয়ই অস্তিত্বশীল। জড়জগতও সত্য, মনোজগতও সত্য। সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক মতবাদ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সর্বাস্তিবাদ

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন—বাহ্যবস্তুকে কি ভাবে জানা যায়? সর্বাস্তিবাদীরা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু কি ভাবে জানা যায় সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

সৌত্রান্তিকরা বলেন যে, বাহ্যবস্তুকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাদের অনুমানের সাহায্যে জানতে হয়। এ কারণে এদের বলা হয় বাহ্যানুমেয়বাদী, অপর দিকে বৈভাষিকদের মতে বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ ভাবে জানা যায়, এদের বলা হয় বাহ্য-প্রত্যক্ষবাদী।

সৌত্রান্তিক—বাহ্যানুমেয়বাদী; বৈভাষিক—প্রত্যক্ষবাদী

(ক) মাধ্যমিক মতবাদ বা শূন্যবাদ :

এই দর্শন-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন নাগার্জুন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে এঁর জন্ম হয়। নাগার্জুন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাধ্যমিককারিকায়' মাধ্যমিকদের শূন্যবাদ সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিধিবদ্ধ করেছেন। তার্কিক হিসেবে তিনি খুবই খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমিককারিকা তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তাঁর গ্রন্থের ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে চন্দ্রকীর্তি অন্যতম।

নাগার্জুন মাধ্যমিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা

এই মতবাদ অনুযায়ী কি বাহ্যবস্তু, কি মানসিক প্রক্রিয়া সবই শূন্য—বস্তু বা মন কোন কিছুরই সত্তা নেই। জড়গত এবং মনোজগত উভয়ই মিথ্যা। মাধ্যমিকগণ তাঁদের মতবাদ ব্যাখ্যা করার জন্য অনেকগুলি যুক্তি দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি যুক্তি হল—জ্ঞাতা (subject), জ্ঞেয় এবং জ্ঞান, এই তিনটি বিষয় পরস্পরনির্ভর, সেহেতু পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত। এই তিনটির মধ্যে একটিরও যদি অস্তিত্ব না থাকে বা একটি যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, তাহলে অপরগুলিও মিথ্যা হতে বাধ্য। যখন আমরা দড়িকে সাপ বলে জানি তখন প্রকৃতপক্ষে সাপের কোন অস্তিত্ব নেই। সুতারাং সাপের জ্ঞান মিথ্যা এবং যেহেতু মনের সাহায্যে এই জ্ঞান লব্ধ হয় সেহেতু মনও মিথ্যা। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, কি বাইরের জগতে, কি মনোজগতে আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি না, সবই মিথ্যা, সবই স্বপ্নবৎ অলীক। আমরা জেগে থেকেও স্বপ্ন দেখছি, সুতরাং কী বস্তু, কী মন কোন কিছুরই সত্তা নেই, সুতরাং এ জগত শূন্য।

এই মতবাদ অনুযায়ী বাহ্যবস্তু বা মন কারও কোন সত্বা নেই

জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান—এই তিনটির একটি মিথ্যা হলে অপরগুলিও মিথ্যা হবে

যোগাচার দার্শনিকগণ বলেন যে, বস্তুর অস্তিত্ব না থাকলেও চেতনার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু বস্তুই যদি না থাকে তাহলে চেতনার সত্তা কি ভাবে থাকতে পারে। জ্ঞেয় না থাকা মানেই ত জ্ঞাতার কোন সত্তা না থাকা। সুতরাং বস্তু এবং মন কোন কিছুরই সত্তা নেই।

মাধ্যমিকগণ আরও একটি যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, জ্ঞানের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সঙ্গে

আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু বস্তুর স্বরূপের মধ্যেই আত্মবিরোধ রয়েছে। আমরা কোন একটি ঘটকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করি কিন্তু ঘটটি কি একটি সমগ্র বস্তু—না অংশের সমষ্টি? যদি অংশের সমষ্টি হয় তাহলে এটি পরমাণুর (atom) সমষ্টি। কিন্তু পরমাণু যেহেতু দৃশ্যগোচর নয়, সেহেতু ঘটটিও দৃশ্যগোচর নয়। বলা হয়—এটি একটি সমগ্র বা অখণ্ড বস্তু, তাহলে অংশের সঙ্গে সমগ্রের বা খণ্ডের সঙ্গে অখণ্ডের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ঘটটির অস্তিত্ব আছে কি নেই, তাও বলা যায় না। ঘটটির যদি সকল সময়ই অস্তিত্ব থাকে তাহলে ঘটটি তৈরী করা হয়েছে এমন কথা কি ভাবে বলা চলে? আবার যদি বলা হয় যে ঘটটির অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্বশীল হয়েছে, তাহলে অস্তিত্বশীলতা এবং অস্তিত্বহীনতা বা সত্তা বা সত্তাহীনতা এই উভয় বিরুদ্ধগুণই একই ঘটে আরোপ করা কি ভাবে সম্ভব? তৃতীয়তঃ, কোন বস্তুকে জানতে হলে তাকে অপর বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ-যুক্ত করেই জানতে হয়। একটি বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করতে হলে বলতে হয় যে, বস্তুটি অপর একটি বস্তুর ডানদিকে বা বামদিকে, ওপরে কিংবা নীচে ইত্যাদি। বস্তুর নিজস্ব কোন স্বভাব নেই, সকল বস্তুই আপেক্ষিক। যা আপেক্ষিক তাই নিঃস্বভাব, যা নিঃস্বভাব তাই শূন্য। সুতরাং সবই শূন্য, বস্তুর কোন সত্তা নেই।

বস্তুর স্বরূপের মধ্যেই আত্মবিরোধ আছে

বস্তুর নিজস্ব কোন স্বভাব নেই, সকল বস্তুই আপেক্ষিক

নাগার্জুনের মতে যে কোন বস্তুকে জানতে হলেই বিভিন্ন সম্বন্ধের মাধ্যমেই জানতে হয়। তাঁর মতে বিভিন্ন সম্বন্ধ (relation) নিয়েই এই জগৎ। কিন্তু এসব সম্বন্ধ স্ববিরোধী এবং বোধগম্য নয়। দেশ, কাল, দ্রব্য ও কারণ; গতি ও স্থিরতা (rest), দ্রব্য ও গুণ, সবকিছুই স্ববিরোধী। সত্তা স্ববিরোধী হতে পারে না, কাজেই সম্বন্ধের কোন সত্তা নেই। সত্তা আর কিছু না হোক বোধগম্য হবে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা যে সব সম্বন্ধের দেখা পাই, এগুলি মোটেও বোধগম্য নয়। *Bradley*-র মতে এই দৃশ্যমান জগৎ অভাসমাত্র, এর কোন সত্যতা নেই। এই দৃশ্যমান জগতের সবকিছুই আত্মবিরোধে পূর্ণ

সম্বন্ধের কোন সত্ত্বা নেই যেহেতু সব সম্বন্ধই স্ববিরোধী

এবং সেহেতু অসত্য। নাগার্জুনের মতেও যে সব সম্বন্ধের মাধ্যমে সত্তা বোধগম্য হয়, সেগুলি স্ববিরোধী ও নিঃস্বভাবে। সব কিছুই পরিবর্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য, সবকিছুই আপেক্ষিক, সেহেতু সবই শূন্য।

মাধ্যমিকগণ 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' মতবাদের সাহায্যেও শূন্যবাদ প্রমাণ করেন। এই মতবাদ অনুসারে যার সত্তা আছে তা অবশ্যই স্ব-নির্ভর হবে। অন্য কোন কারণ থেকে উদ্ভূত হবে না বা অন্য কোন কারণের ওপর নির্ভর করবে না। কিন্তু আমাদের জানা সব বস্তুই অন্য কোন কারণের ওপর নির্ভর এবং যা অন্য কারণের ওপর নির্ভর তার কোন সত্তা থাকতে পারে না। সুতরাং এদের সত্তা আছে বলা যায় না। আবার এগুলি আকাশকুসুম বা শশকশৃঙ্গের মত অলীক বস্তু নয়, সুতরাং বস্তুর সত্তা আছে—এমন কথাও যেমন বলা যায় না, আবার সত্তা নেই—এমন কথাও বলা যায় না। সুতরাং সবই শূন্য। শূন্যতার অর্থ হল বস্তুর যথার্থ প্রকৃতিকে বা স্বভাবকে ব্যাখ্যা করা যায় না বা বর্ণনা করা যায় না। বস্তুর অস্তিত্বের আভাষ আমরা পাই, কিন্তু সেই অস্তিত্বের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হতে গেলেই আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

'প্রতীত্য সমুৎপাদ' মতবাদের সাহায্যে শূন্যবাদ প্রমাণ

শূন্যবাদ অর্থে বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি বা স্বভাব অবর্ণনীয়

মাধ্যমিক দর্শনের গভীরে প্রবেশ করলে কিন্তু দেখা যায় যে, মাধ্যমিক মতবাদকে শূন্যবাদ নামে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, সবই শূন্য—এ তাদের মতবাদ নয়। সব সত্তাই তারা অস্বীকার করে না; কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং পরিদৃশ্যমান এই জগতের সত্তাই তারা অস্বীকার করে। কিন্তু তারা স্বীকার করে যে, পরিদৃশ্যমান জগতের আড়ালে এমন এক সত্তা আছে যাকে জড় বা চেতনা কোন নামেই অভিহিত করা যায় না।

মাধ্যমিক মতবাদকে শূন্যবাদ নামে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়

এর কোন রূপময় প্রকৃতি নেই বলেই একে শূন্য বলা হয়। চরম সত্তাকে শূন্য বলা মানে এর সত্তাকে অস্বীকার করা নয়। সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে একে ব্যাখ্যা করা যায় না শূন্য কথাটির মাধ্যমে সেকথাই উক্ত হয়েছে।

পরিদৃশ্যমান জগতের আড়ালে এক অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে

বস্তুতঃ, মাধ্যমিক দর্শন বস্তু স্বীকার করে, কিন্তু বস্তুর সত্তা বা নিত্যতা স্বীকার করে না। কিন্তু কোন বস্তু নিত্য নয় বলে যে এর অস্তিত্ব নেই তা নয়। বস্তু ক্ষণস্থায়ী হলেও ক্ষণকালের জন্য এর অস্তিত্ব আছে। বস্তুর বিশুদ্ধ কোন স্বভাব নেই, বস্তু নিঃস্বভাব—তাই শূন্য। মাধ্যমিক দার্শনিকরা সকল বস্তুর বিনাশের কথা বলেছেন এবং সেহেতু তারা সর্ববৈনাশিক—কেউ কেউ এমন অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু তাদের সর্ববৈনাশিক এ কথা বলা চলে না। বস্তুতঃ, 'মাধ্যমিক' কথাটির মধ্যেই তাদের মূল বক্তব্য নিহিত আছে।

মাধ্যমিকরা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু নিত্যতা স্বীকার করে না

এই মতবাদকে মাধ্যমিক মতবাদ বলা হয় কেন? সাধারণতঃ বুদ্ধদেব 'মধ্যম পথ' বলতে যে পন্থার নির্দেশ করতেন—অর্থাৎ একদিকে অনাবশ্যক শারীরিক কৃচ্ছ্রতা এবং অপরদিকে ভোগলালসা—এই উভয়ের মধ্যবর্তী যে পন্থা—এখানে সেই পন্থাকে বোঝাচ্ছে না। এই মতবাদকে মাধ্যমিক বলা হয় এই কারণে যে এই মতবাদ যেমন একদিকে বস্তুর নিত্য, শাশ্বত বা সনাতন অস্তিত্ব স্বীকার করে না তেমনি অপরদিকে বস্তুর নিছক শূন্যতাকে স্বীকার করে না। বস্তুর অস্তিত্ব অন্য কারণের ওপর নির্ভর। 'প্রতীত্য সমমুৎপাদ'ই মধ্যম পন্থা।[1]

মাধ্যমিক মতবাদের নামকরণের কারণ

মাধ্যমিক দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই দর্শন কেবলমাত্র অবভাসিক (Appearance) জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই অবভাসিক জগতের আড়ালে এক পারমার্থিক জগতের সত্তাও স্বীকার করে। পরিবর্তনশীলতা, অনিত্যতা, কার্যকারণসম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলি অবভাসিক জগত (World of appearance) সম্পর্কেই প্রযোজ্য, পারমার্থিক জগত সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। সাধক যখন নির্বাণ লাভ করেন তখন তাঁর যে অভিজ্ঞতা, তাকে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা চলে না। এই পারমার্থিক জগত আমাদের বুদ্ধির অতীত, বেদান্তের কথায় এ হল—'অবাঙ্ মানসগোচর'। একে কেবলমাত্র স্বজ্ঞার (Intiuition) সাহায্যেই জানা যায়। নাগার্জুন 'মাধ্যমিক কারিকায়' বুদ্ধের ধর্মোপদেশের মূলে দুটি সত্যের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। একটি সংবৃতি সত্য

1. "The world is not absolutey real, nor is it absolute nothingness for the latter is an impossible conception. By sunya, therefore the Madhyamika does not mean absolute non-being, but only relative being".
—S. Radhakrisnan : Indian philosophy. vol. I. Page 661.

এবং অপরটি পারমার্থিক সত্য। এই উভয়বিধ সত্যের পার্থক্য অবগত না হলে বুদ্ধের ধর্মোপদেশের মর্মার্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ, এই উভয় সত্যের পার্থক্যের মাধ্যমেই নিছক শূন্যতা ও নৈতিক জীবনের মধ্যে যে বিরোধ তার থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কারণ সবই যদি শূন্য হয় তাহলে সাধক নির্বাণ লাভের জন্য সচেষ্ট হবে কেন? সবই যদি শূন্য হয়, তাহলে শূন্যতার ধারণাও শূন্য, তাহলে সত্য ও মিথ্যা, ভাল ও মন্দের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না। এর উত্তরে নাগার্জুন বলেন যে, পূর্বোক্ত সব প্রভেদই এই দৃশ্যমান জগতের সম্পর্কে প্রযোজ্য। সংবৃতি হল মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত। এই সংবৃতিই এই রূপময় জগত সৃষ্টি করে এবং সত্যকে আড়াল করে রাখে। স্বপ্ন ভঙ্গ হলেই যেমন জাগ্রত ব্যক্তি স্বপ্নের অলীকতা সম্পর্কে অবহিত হয়, সেরূপ পারমার্থিক সত্য সম্পর্কে অবহিত হলেই এই দৃশ্যমান জগতের অসত্যতা সম্পর্কে সে অবহিত হয়।

সংবৃতি সত্য থেকেই পারমার্থিক সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সাধক যখন নির্বাণ লাভ করে তখন সেই অভিজ্ঞতাকে জাগতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্ণনা করা যায় না। নির্বাণের কেবলমাত্র নঞর্থক বা অভাবাত্মক বর্ণনাই সম্ভব, সুতরাং এই পারমার্থিক সত্তার কোন ভাবাত্মক বর্ণনা সম্ভব নয়। নাগার্জুন বলেন, "চক্ষু একে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, মন একে চিন্তা করতে পারে না, এ হল চরম সত্য। যেখানে মানুষ প্রবেশ করতে পারে না, যে জগতে সকল বস্তুর পূর্ণ স্বরূপ লাভ করা যায়, তাকে বুদ্ধদেব বলেছেন পরমার্থ বা শাশ্বত সত্য, যাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।" নির্বাণ সম্পর্কে যা প্রযোজ্য, যিনি তথাগত বা নির্বাণ লাভ করেছেন তাঁর সম্পর্কেও সে কথাই প্রযোজ্য। এই তথাগত সম্পর্কেও সাধারণ জাগতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিছু বলা যায় না। তথাগত বিশেষ, কি নির্বিশেষ, তিনি নিত্য কি অনিত্য, শাশ্বত কি অ-শাশ্বত কিছুই বলা সম্ভব নয়। তিনি বুদ্ধির অতীত—এই কারণেই এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হলে বুদ্ধদেব নীরব থাকতেন। পারমার্থিক সত্তাকে সাধারণ লৌকিক শব্দের প্রয়োগে ব্যাখ্যা করা চলে না বলেই বুদ্ধদেব এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হলে নীরব থাকতেন।

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, মাধ্যমিক মতবাদের সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের শঙ্করের মতবাদের অনেক বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়। মাধ্যমিকগণ যেমন সংবৃত সত্য এবং পারমার্থিক সত্যের মধ্যে প্রভেদ করেছেন, শঙ্করও পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাষিক —এই তিনপ্রকার সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। মাধ্যমিকদের মতে এ জগতের কোন সত্যতা নেই, এ জগত অবভাসিক মাত্র। শঙ্করের মতেও এ জগত মায়িক, জগতের কোন পদার্থেরই শাশ্বত সত্তা নেই। জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা আছে। মাধ্যমিকদের মতে পারমার্থিক সত্যের উপলব্ধি হলে জগতের শূন্যতা উপলব্ধি করা যায়, শঙ্করের মতেও ব্রহ্মজ্ঞান হলে ব্যবহারিক সত্তার অস্তিত্ব থাকে না। মাধ্যমিকগণের মতে নির্বাণপ্রাপ্ত হলে সাধক পারমার্থিক সত্তায় লীন হয়ে যায় এবং সংবৃতি সত্য সম্পর্কে

যা প্রযোজ্য, পারমার্থিক সত্য সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়। শঙ্করের মতেও জগত সম্পর্কে যা প্রযোজ্য, ব্রহ্ম সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়। শঙ্করের মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে কেবল ব্রহ্মই সৎ, এ জগতের কোন সত্তা নেই। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের পারমার্থিক সত্তা নেই, নির্গুণ বা নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই পারমার্থিক সত্তা আছে। নাগার্জুনও ঈশ্বরকে অবভাস বলে মনে করেন। জগত এবং ঈশ্বর উভয়ই অবভাসিক, তবে নির্গুণ ব্রহ্মের যেমন অস্তিত্ব আছে, তেমনি নাগার্জুনও মহাযানী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ধর্মকায়কে স্বীকার করেছেন। ধর্মকায় জগতের মধ্যে নিজ দীপ্তিতে প্রতিভাত হচ্ছেন। নঞর্থক বর্ণনায় মাধ্যমেই যেমন ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করা হয়, তেমনি মাধ্যমিকদের পারমার্থিক সত্তাকেও নঞর্থক বর্ণনার মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা হয়। নির্বাণ বা তথাগতের কোন সদর্থক বা ভাবাত্মক বর্ণনা সম্ভব নয়।

(খ) যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদ

অসঙ্গ, বসুবন্ধু, মৈত্রেয়নাথ, দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি দার্শনিকরা যোগাচারবাদ বা বিজ্ঞানবাদের সমর্থক। তবে অসঙ্গের গুরু মৈত্রেয়নাথই সর্বপ্রথম এই মতবাদের একটি সুসংবদ্ধ রূপ দান করেছিলেন। যোগাচার দার্শনিকগণ মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। যোগ এবং সদাচারের সহায়তায় পরম সত্যের উপলব্ধি বা নির্বাণ লাভ সম্ভবপর বলেই এই মতবাদ যোগাচারবাদ নামে খ্যাত। এই মতবাদকে বিজ্ঞানবাদও বলা হয়, যেহেতু এই মতবাদ অনুযায়ী বিজ্ঞান বা চেতনারই একমাত্র সত্তা আছে। ভারতীয় দর্শনে চেতনাকে বিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে।

যোগ এবং সদাচারের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করা যায়, সেহেতু এই মতবাদ যোগাচারবাদ

এই মতবাদ বিজ্ঞানবাদ, যেহেতু এই মতানুসারে বিজ্ঞানই একমাত্র সত্তা

সৌত্রান্তিকদের দার্শনিক মতবাদের সমালোচনাই যোগাচার দার্শনিকদের মতবাদে টেনে নিয়ে আসে। সৌত্রান্তিকরা জড়বস্তু এবং চেতনা উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে, কিন্তু বস্তুর সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার করে না। মন কেবলমাত্র ধারণাকে জানতে পারে এবং এই ধারণার মাধ্যমে অনুমানের সাহায্যে বস্তুর অস্তিত্বের কথা সে জানতে পার। কিন্তু মন যদি কেবলমাত্র ধারণাকেই জানতে পারে এবং বস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে না পারে তাহলে বাইরের বস্তুর যে স্বতন্ত্র সত্তা আছে—তা সে কি ভাবে জানতে পারে? সৌত্রান্তিকদের

সৌত্রান্তিকরা বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার করে না, মন কেবলমাত্র ধারণাকেই জানে

মতে মনের বাইরে বস্তুর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। এই মনেতে অবস্থিত ধারণার যদি কোন কারণ স্বীকার করে নিতে হয় তাহলে কোন বাহ্য বস্তুই যে সেই কারণ হবে—এমন কথা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়।

যোগাচারবাদীরা মাধ্যমিক দার্শনিকদের সঙ্গে একমত যে বাহ্যবস্তুর কোন সত্তা নেই। কিন্তু মাধ্যমিকরা যখন বলেন যে, চেতনা বা মনের কোন সত্তা নেই, তখন যোগাচারবাদীরা তা স্বীকার করেন না। যোগাচারবাদীদের মতে চেতনার অস্তিত্ব কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। চেতনা বা মনের কোন অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহলে কোন যুক্তিতর্ক বা বিচারের সত্যতা প্রমাণ করা যাবে না। চিন্তা বা বিচারের সত্যতা প্রমাণের জন্যই মনের বা চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে।

যোগাচারবাদীদের মতে চেতনার অস্তিত্ব কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না

সুতরাং বিজ্ঞানবাদীদের প্রধান মত দুটি—বিজ্ঞানের বা চেতনার সত্যতা আছে, এবং বিজ্ঞান বা চেতনা অবভাষিক নয়। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য বস্তু নয়। প্রথমটি মাধ্যমিকবাদের ও দ্বিতীয়টি বস্তুবাদের বিরোধী। মন বা চিত্ত বলতে কি বুঝি? যোগাচারবাদীদের মতে চিন্তা, ভাব, ধারণা ও অনুভূতির প্রবাহ বা ধারাই হল চিত্ত। চিত্ত বা চেতনা ছাড়া অন্য কোন কিছুর সত্তা নেই। 'সর্বং বুদ্ধিময়ং জগৎ'। চেতনার বাইরে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। চেতনা-বহির্ভূত বাহ্যবস্তু, যেমন আমাদের এই দেহ বা জড়বস্তু মনের ভাব বা ধারণা মাত্র। ব্যক্তি স্বপ্নে অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু সে সব বস্তু ব্যক্তির মনের ভাব বা ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। অনুরূপভাবে বাহ্য জগতে যে সব বস্তুর অস্তিত্বের কথা আমরা চিন্তা করি সেগুলি মনেরই ধারণা মাত্র। বস্তু এবং বস্তুর চেতনা অভিন্ন—একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। চেতনার বিষয় নয় এমন কোন বস্তুর সত্তা প্রমাণ করা যায় না।

ভাব, ধারণা ও অনুভূতির প্রবাহই চিত্ত

চেতনা-বহির্ভূত বাহ্য-বস্তু মনের ধারণা মাত্র

বস্তু এবং বস্তুর চেতনা অভিন্ন

যোগাচারবাদীদের মতবাদকে **আত্মগত ভাববাদ** (Subjective Idealism) নামেও অভিহিত করা যেতে পারে। এই মতানুসারে জ্ঞানের

বিষয় ব্যক্তি-জ্ঞাতার (Individual subjective) মনের ভাব বা ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। যোগাচারবাদীদের মতবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক *Berkeley*-র আত্মগত ভাববাদের সাদৃশ্য আছে। *Berkeley*-র মতেও মন এবং ধারণাই একমাত্র সত্য। বস্তুর কোন সত্তা নেই। চেতনা বহির্ভূত বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা যেতে পারে না।

যোগাচারবাদীদের মতবাদের সঙ্গে Berkeley-র আত্মগত ভাববাদের সাদৃশ্য আছে

Berkeley-র মতনই যোগাচারবাদীরা জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকার করেছেন এবং বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তার বিশ্বাসকে মন থেকে দূর করতে বলেছেন। মনের ধারণার কারণ বা উৎস বাহ্যবস্তু—এ বোধ বা বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত নয়। জড়বস্তুও নিছক মনের ধারণা। বস্তু হল সংবেদনের সমষ্টি। দ্বিতীয়তঃ, বাহ্যবস্তু কি পরমাণু, না একটি যৌগিক পদার্থ? বাহ্যবস্তু পরমাণু হতে পারে না; যেহেতু পরমাণু দৃশ্যগোচর নয়। আবার, বস্তুটি যৌগিক পদার্থ হতে পারে না, যেহেতু আমরা জানতে পারি না যে, আমরা একটি অংশকে জানছি না, বিভিন্ন অংশের সমবায়ে গঠিত একটি যৌগিক পদার্থকে জানছি। কোন যৌগিক পদার্থের প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়, যেহেতু একই সময়ে বস্তুটির সকল অংশগুলি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। যদি মনে করা হয় বস্তুটি পরমাণুর সমষ্টি; সেক্ষেত্রে পরমাণুর সমষ্টি কি পরমাণু থেকে পৃথক? যদি পৃথক্ না হয় তাহলে তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, আর যদি পৃথক হয় তাহলে তাকে পরমাণুর সমষ্টি কি ভাবে বলা যেতে পারে? কিন্তু বস্তুটিকে যদি চেতনার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয় তাহলে এই সব সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় না। কারণ, অংশ এবং সমগ্রের প্রশ্ন চেতনার ক্ষেত্রে ওঠে না। তৃতীয়তঃ, বস্তু যদি ক্ষণিক হয় তাহলে বস্তু ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কাজেই বস্তুটির সম্পর্কে যখন জ্ঞান হয় তখন বস্তুটির অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই বস্তু ছাড়াও জ্ঞান সম্ভব। যদি বলা হয় যে, বস্তুটি বিলুপ্ত হয়ে যাবার পর বস্তুটি সম্পর্কে জ্ঞান হয়, তাহলে বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার করা যাবে কি ভাবে? চতুর্থতঃ, বস্তু এবং বস্তুর চেতনা—এ দুটিকে স্বতন্ত্র

বস্তু হল সংবেদনের সমষ্টি

বাহ্যবস্তুর সত্তা অস্বীকার করার স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি

অবস্থায় আমরা কখনও দেখতে পাই না ; উভয় বিষয়ই একই সময়ে কার্যকরী হয়। সুতরাং বস্তু এবং বস্তুর চেতনা স্বতন্ত্র নয়। লালরঙ্ ও লালরঙের চেতনা অভিন্ন, যেহেতু উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি না।

সুতরাং বাহ্যবস্তুর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। বাইরের জগতের এই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ সবই আমাদের মনের ভাব বা ধারণা মাত্র। ভাসমান মেঘের মত আমাদের মনোজগতে এদের আবির্ভাব এবং তিরোধান অনবরতই ঘটে চলেছে।

বিজ্ঞানবাদীদের একটি বিশেষ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যদি বস্তুর স্বতন্ত্র কোন সত্তা না থাকে এবং যদি বস্তু চেতনা-নির্ভর হয় তাহলে আমাদের ইচ্ছামত যে কোন সময়ে যে কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করতে পারি না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানবাদীরা বলে থাকেন যে মন হল ক্ষণিক চেতন-প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ এবং এই ধারা বা প্রবাহের মধ্যেই অতীত অভিজ্ঞতার সব সংস্কারই সম্ভাবনারূপে বিদ্যমান থাকে। কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে সেই মুহূর্তের উপযোগী একটি অতীত অভিজ্ঞতার সংস্কার চেতনার কেন্দ্রস্থলে এসে উপস্থিত হয় এবং সে কারণেই কোন একটি বিশেষ সময়ে আমরা একটি ধারণাকেই প্রত্যক্ষ করি। স্মৃতির ক্ষেত্রেও মনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে থাকলেও স্মৃতিপথে একটিমাত্র অভিজ্ঞতার উদয় হয়।

সুতরাং বাহ্য বস্তুর কোন সত্তা নেই। স্বপ্নে যেমন আমরা আমাদের মনের ধারণাকেই প্রত্যক্ষ করি, প্রকৃতপক্ষে কোন বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব নেই, জাগ্রত অবস্থায়ও আমরা আমাদের মনের ভাব বা ধারণাই প্রত্যক্ষ করি। এই সমগ্র বাহ্য জগত আভাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমাদের চেতনার দুটি কার্য আছে: (১) খ্যাতি বা প্রত্যক্ষণ এবং (২) বস্তুপ্রতিবিকল্প বা ব্যাখ্যান। এই উভয়ের সহায়তায় আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি।

যখন মাধ্যমিকরা বলে যে বিজ্ঞান বা চেতনার কোন সত্তা নেই, যেহেতু জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞাতার কোন সত্তা থাকতে পারে না, তখন যোগাচারবাদীরা বলেন যে তাহলে সত্যতা বা মিথ্যাত্ব বিচার করার কোন মানদণ্ড থাকে না। মাধ্যমিকরাই বা কি ভাবে প্রমাণ করতে পারবে যে তাদের মতবাদই সত্য? যখন মাধ্যমিকরা বলে যে সব শূন্য, তখন আমাদের মনে করতে হবে যে, কোন একটা কিছু আছে যা শূন্য এবং কোন কিছুর না থাকার জন্যই সেটি শূন্য। দড়িকে আমরা সাপ বলে ভুল করি। সাপের কোন অস্তিত্ব নেই সত্য, কিন্তু দড়ির অস্তিত্ব আছে। কোন একটা কিছুর ওপর ভিত্তি করেই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়র প্রভেদ সম্ভব। স্বপ্নে আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তার মূলে কোন বস্তুর সত্তা নেই, আমাদের মনের চিন্তাই বস্তুর রূপ লাভ করে। তাহলেই এই চিন্তার আধাররূপে কোন কিছুকে স্বীকার করা প্রয়োজন এবং তাই হল বিজ্ঞান বা চেতনা।

যোগাচারবাদীরা এক পারমার্থিক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই পারমার্থিক সত্তা হল বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা শুদ্ধ চৈতন্য (Pure Consciousness)। এই বিজ্ঞানের তিনটি স্তর—আলয়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং প্রবৃত্তি বা বিষয়বিজ্ঞান। আলয়বিজ্ঞান বাসনা বা বস্তুর বীজাবস্থার আশ্রয়। আলয়বিজ্ঞানে বস্তু বা বাসনা সম্ভাবনারূপেই বিরাজমান থাকে। মনোবিজ্ঞানের বিকারের ক্ষেত্রে বুদ্ধি সেগুলিকে বাস্তব আকার দান করে। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের বিকারের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি আমরা লাভ করি।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান থেকেই আলয় বিজ্ঞানের আবির্ভাব। এই আলয় বিজ্ঞান হল ব্যক্তির সব ধারণা বা সংস্কারের আলয় স্বরূপ। আলয় বিজ্ঞান সব বাসনা বা সব বস্তুর বীজাবস্থার আশ্রয়। এ আলয় বিজ্ঞান থেকেই জীব ও জগতের আবির্ভাব। এই জীব ও জগত প্রকৃতপক্ষে বাহ্যবস্তু নয়, কিন্তু বাহ্য মনে করেই এগুলিকে গ্রহণ করা হয়; চেতনার বাইরে এদের কোন অস্তিত্ব নেই। এই আলয়বিজ্ঞান আত্মার মত কোন সনাতন দ্রব্য নয়। এই আলয়বিজ্ঞান নিরন্তর পরিবর্তনশীল মানসিক ক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ। নদীর স্রোতের বা প্রদীপের শিখার অবিচ্ছিন্ন ধারার সঙ্গে এর তুলনা চলতে পারে। যোগ এবং সদাচারের মাধ্যমে যদি বাসনার বিলোপ ঘটে তাহলে আলয়বিজ্ঞান বাসনার প্রভাবে বিক্ষুব্ধ না হয়ে শান্ত সমাহিত অবস্থা ধারণ করে। বাসনার বিনাশ ঘটলে জীব নির্বাণ লাভ করে। বাসনার বিলোপ না হলে বাসনা, কামনা, মোহ—এই অলীক বাহ্য-জগতের প্রতি জীবের বন্ধনকে দৃঢ় করে তোলে। বস্তুতঃ, জীবের নির্বাণ লাভের মূলে এই আলয়বিজ্ঞান।

(গ) সৌত্রান্তিক দর্শন সম্প্রদায়ঃ

সূত্ত পিটককে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করার জন্য এই মতবাদ সৌত্রান্তিক মতবাদ নামে পরিচিত

তক্ষশিলার কুমারলাতকেই উপরোক্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষ এবং তার ব্যাখ্যা থেকেও এই দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কেই অনেক কথাই জানা যায়। সূত্ত পিটককে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করার জন্য এই দার্শনিক সম্প্রদায়কে **সৌত্রান্তিক**—এই নামে অভিহিত করা হয়। সৌত্রান্তিকরা হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত।

সৌত্রান্তিকরা সর্বাস্তিবাদী। এই দার্শনিকরা জড়বস্তু এবং মন উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। বিজ্ঞানবাদীরা বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে না। সৌত্রান্তিকরা কতকগুলি যুক্তির সাহায্যে বিজ্ঞানবাদীদের মতবাদকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। প্রথম যুক্তি হল এই যে, বাহ্যবস্তুর প্রকৃতই যদি

কোন অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে বাহ্যবস্তুর ভ্রান্তিমূলক অস্তিত্বের বিষয়টিকে প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। যদি বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বই না থাকে তাহলে চেতনা বাহ্যবস্তুর মতন প্রতিভাত হয়, একথা বলার কি যৌক্তিকতা আছে? সাপের অস্তিত্ব আছে বলেই দড়িটিকে সাপ বলে মনে হয়। প্রকৃত সাপের অস্তিত্ব না থাকলে 'একটি সাপের মতন'—এ জাতীয় উক্তির কোন অর্থ হয় না। এ উক্তি অনেকটা এরকম যে তাকে দেখতে বন্ধ্যা নারীর সন্তানের মতন। দ্বিতীয়তঃ, বস্তু ও বস্তুর চেতনা যেহেতু সমকালীন, তার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, বস্তু ও বস্তুর চেতনা অভিন্ন। যখন আমরা কোন ঘট প্রত্যক্ষ করি, তখন পূর্ব থেকেই আমাদের মনে এ বোধ থাকে যে, ঘট একটি বাহ্য বস্তু এবং চেতনা হল আভ্যন্তরিণ মানসিক প্রক্রিয়া। ঘট এবং ঘটের চেতনা যে স্বতন্ত্র এবং উভয় যে অভিন্ন বিষয় নয়—এ ধারণাই আমাদের ঘটের প্রত্যক্ষণকে সম্ভব করে তোলে। তা না হলে আমিই বস্তু বা ঘট—একথা বলতে বাধা কি? তৃতীয়তঃ, বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করলে বিভিন্ন চেতনার পার্থক্য বা বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা কি ভাবে সম্ভব হবে? লাল, নীল, হল্‌দে, সবুজ এই যে বিভিন্ন বর্ণের চেতনা—এ সম্ভব হয় যেহেতু বিভিন্ন বর্ণের স্বতন্ত্র সত্তা আছে।

বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করার জন্য সৌত্রান্তিকদের বিভিন্ন যুক্তি

চেতনা স্বরূপতঃ একই। বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার জন্যই চেতনাও বিভিন্ন হয়। নতুবা সমস্ত জগতের একটি রূপই আমরা দেখতে পেতুম, এর বৈচিত্র্য আমাদের চোখে পড়ত না। চতুর্থতঃ, বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করলে, চেতনা বস্তু অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তু যদি না থাকে, ধারণা সত্য কি মিথ্যা, কি ভাবে বোঝা যাবে? পঞ্চমতঃ, বস্তু আমাদের প্রয়োজন মেটায়, সে কারণেও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। কেবলমাত্র খাদ্যের ধারণা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুধা দূর করতে পারে না; এর জন্য প্রয়োজন আসল খাদ্যের। ষষ্ঠতঃ, এই বাহ্য-জগতের আবির্ভাব আমাদের খেয়াল-খুশীর ওপর নির্ভর করে না। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ করি তার জন্য এমন এক জগতের অস্তিত্বের

কথা স্বীকার করে নিতে হয়, যে জগত আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের সংবেদন ও সুখ-দুঃখরূপ অনুভূতি উৎপন্ন করতে পারে। এজন্য চেতনা-বহির্ভূত জগতের অস্তিত্ব কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না।

সৌত্রান্তিকদের মতে বস্তুর প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ জ্ঞান সম্ভব নয়। বস্তু আমাদের মনে যে ধারণার সৃষ্টি করে আমরা সাক্ষাৎভাবে কেবলমাত্র সেই ধারণাগুলিকেই জানি। এই ধারণাগুলি হল বস্তুর অনুলিপি (Copy)। এই ধারণাগুলি বস্তুর প্রতিনিধির কাজ করে ও এদের মাধ্যমে অনুমানের সাহায্যে আমরা বস্তুর অস্তিত্ব অবহিত হই। যদিও বস্তুর জ্ঞান অনুমানলব্ধ, তবু বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কারণ, বস্তু ছাড়া বস্তুর প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়। সৌত্রান্তিকদের এই মতবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক *Locke*-এর মতবাদের কিছু পরিমাণে সাদৃশ্য দেখা যায়। *Locke*-এর মতেও বস্তুকে সোজাসুজি জানা যায় না। মনের ভাব বা ধারণা (Ideas) হল বস্তুর অনুলিপি। ধারণা হল প্রতীক যার মাধ্যমে আমরা বস্তুকে জানি।

বস্তুর সাক্ষাৎ জ্ঞান সম্ভব নয়, বস্তুর জ্ঞান অনুমানলব্ধ

সৌত্রান্তিকরা যদিও মনে করে যে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব ছাড়া প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়, তবু তাঁদের মতে এসব বাহ্য বস্তু ক্ষণিক। বস্তুতঃ, সব কিছুই ক্ষণিক, নিয়ত পরিবর্তনশীল। বস্তু মনে সংবেদন সৃষ্টি করেই বিলুপ্ত হয়ে যায়, সুতরাং মনে যখন জ্ঞানের উদ্ভব হয় তখন প্রকৃতপক্ষে বস্তুই আর থাকে না। কিন্তু অনুমানের সাহায্যে আমরা উপলব্ধি করি যে, এই জ্ঞানের মূলে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, কারণ ছাড়া কার্য ঘটে না। তাহলে এই সব সংবেদন বা ধারণার উৎস কি ?—নিশ্চয়ই মন নয়। তাহলে অনুমানের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, মনোনিরপেক্ষ বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা আছে। সৌত্রান্তিকদের এই মতবাদকে **বাহ্যানুমেয়বাদ** (The Theory of the Inferability of External Objects) নামে অভিহিত করা হয়।

সব কিছুই ক্ষণিক এবং পরিবর্তনশীল

এই মতবাদকে বাহ্যানুমেয়বাদ বলা হয়

প্রশ্ন হল, বস্তু যদি ক্ষণিক হয় এবং এই জগত যদি নিত্য পরিবর্তনশীল হয় তাহলে বস্তুর স্থায়িত্বের (Permanence) ধারণা মনে উদিত হয় কেন ? এর উত্তরে সৌত্রান্তিকরা বলে যে বস্তুর এই অবিরাম যাওয়া আসা এত দ্রুত চলতে থাকে যে, আমাদের বোধশক্তিতে বস্তুর আকারগুলি একটির মধ্যে আর একটি প্রবেশ করে ; তার ফলে বস্তুর সমকালীনত্বের অলীক ধারণার উদ্ভব ঘটে। কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সবই ক্ষণিক। কোন শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব নেই, গতি বা প্রবাহই একমাত্র সত্য। আত্মা বলে কোন নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব মেই। সৌত্রান্তিকরা বিজ্ঞানের বা চেতনার আত্মসচেতনতা স্বীকার করে। মাধ্যমিক এবং বৈভাষিক মতবাদের বিরোধিতা করে সৌত্রান্তিকরা বলে যে জ্ঞান জ্ঞানের সাহায্যে নিজেকে জানতে পারে, চেতনা নিজের সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। যদিও আঙ্গুলের অগ্রভাগের দ্বারা ঐ আঙ্গুলেরই অগ্রভাগকে স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু প্রদীপ অন্য বস্তুকে প্রকাশিত করেও নিজেকে প্রকাশিত করতে পারে।

সৌত্রান্তিকদের মতে বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষণ চারটি শর্তের ওপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ বস্তু, দ্বিতীয়তঃ মন বা চেতনা, তৃতীয়তঃ ইন্দ্রিয়, চতুর্থতঃ সহায়ক অবস্থা। বস্তুর জন্যেই মনে ধারণার সৃষ্টি হয়। আবার মন না থাকলে বস্তুর ধারণা বা চেতনা কি ভাবে সম্ভব হবে? তৃতীয়তঃ ইন্দ্রিয়ের উপস্থিতিই নির্ধারণ করে চেতনা, কি দর্শনগত চেতনা না বস্তুগত চেতনা। চতুর্থতঃ সহায়ক অবস্থা, যেমন আলোক, বস্তুর অবস্থান ইত্যাদি, যা বস্তুর প্রত্যক্ষণকে সম্ভব করে তোলে। এই চারটি শর্ত একত্রে কার্যকরী হলেই প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয়। অবশ্য মন বস্তুটিকে সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করতে পারে না। মন চেতনায় বস্তুর ধারণাটিকে প্রত্যক্ষ করে এবং অনুমানের সহায়তায় বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

(ঘ) বৈভাষিক দর্শন সম্প্রদায়ঃ

অভিধর্মের ওপর **বিভাষা** নামে একটি ভাষ্য রচিত হয়েছিল। বৈভাষিকরা এই অভিধর্ম-বিভাষা বা ভাষ্য অনুসরণ করেই তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বৈভাষিকরা সূত্তকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ না করে কেবলমাত্র অভিধর্মকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে। সেকারণে এই দর্শনকে বৈভাষিক দর্শন বলা হয়ে থাকে। বৈভাষিকগণ হীনযান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

অভিধর্ম-বিভাষা অনুসরণ করার জন্যেই একে বৈভাষিক দর্শন বলা হয়

সৌত্রান্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের মত বৈভাষিকরাও সর্বাস্তিবাদী। তাঁরা জড়জগত এবং মনোজগত উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। তবে সৌত্রান্তিকদের মতে আমরা যে বস্তুর অস্তিত্ব অনুমানের সাহায্যে জানতে পারি সেকথা বৈভাষিকরা স্বীকার করেন না। বৈভাষিক দার্শনিকদের মতে

আমরা বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করি। বাহ্য বস্তুকে যদি পূর্বে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ না করা যায় তবে তার অস্তিত্ব অনুমান করা কখনও সম্ভব হত না। ধোঁয়া দেখে আমরা আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করি, কিন্তু পূর্বে যদি ধোঁয়া এবং আগুন এই দুটিকে একত্র প্রত্যক্ষ না করতুম, তাহলে বর্তমানে ধোঁয়া দেখে আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করা কখনও সম্ভব হত না। সুতরাং বস্তুকে আমরা সাক্ষাৎভাবেই প্রত্যক্ষ করি। বস্তুতঃ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ের সাহায্যেই বস্তুকে জানা যায়। অনুমানের সাহায্যে বস্তুকে জানা গেলেও প্রত্যক্ষণই বস্তুর অস্তিত্ব নির্দেশ করে। তাছাড়া, বস্তুকে যদি সাক্ষাৎভাবে না জানি তাহলে মনের ধারণাটি যে বস্তুর অনুলিপি এ কি ভাবে জানা যাবে? সৌত্রান্তিকদের মতে আমরা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করি ঘটের ধারণাটিকে এবং ঘটটির অস্তিত্ব অবহিত হই অনুমানের সাহায্যেই। কিন্তু ঘটটিকে যদি সাক্ষাৎভাবে আমি না জানি তাহলে আমার মনে ঘটের ধারণা এবং সে ধারণা যে ঘটেরই প্রতীকস্বরূপ বা ঘটের অস্তিত্বই সূচনা করে তা আমি জানবো কি ভাবে? যখন বলি—ধারণাটি বাহ্যবস্তুর মানসরূপ, তখন এ কথাই বুঝি যে, বাহ্যবস্তুটিকে আমি সোজাসুজি জেনেছি এবং আমার ধারণা সেই বস্তুটির মানসরূপ। নতুবা 'মানসরূপ' কথাটির কোন অর্থ হয় না। হয় আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, আমরা ধারণা ছাড়া আর কিছুই জানতে পারি না, নয়ত স্বীকার করে নিতে হবে যে, চেতনা-বহির্ভূত বস্তুর নিজস্ব সত্তা আছে এবং তাকে সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করা যায়। আত্মগত ভাববাদ বা বিজ্ঞানবাদই স্বীকার করে যে, মন কেবলমাত্র তার ধারণাকেই জানতে পারে। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখেছি যে, এ মতবাদ ভ্রান্ত। সুতরাং মেনে নিতে হয় যে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব আমরা সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করতে পারি। এই কারণেই বৈভাষিকদের বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদী বলা হয়ে থাকে। সুতরাং বৈভাষিকরা একদিকে বিজ্ঞানবাদ এবং অপরদিকে বাহ্যানুমেয়বাদ—এই উভয় মতবাদকে খণ্ডন করে নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে।

বস্তু যদি সাক্ষাৎভাবে জানা না যায়, তাহলে ধারণা যে বস্তুরই অনুলিপি কিভাবে জানা যাবে

বস্তু না থাকলে ধারণা বস্তুর মানসরূপ—এ কথা বলা অর্থহীন

বৈভাষিকরা দ্বৈতবাদী, যেহেতু তারা প্রকৃতি এবং মন এই উভয়ের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে। বস্তুতঃ, বৈভাষিকদের মতবাদকে সরল বা সাক্ষাৎ বস্তুবাদ (Naive or Direct Realism) নামেও অভিহিত করা যেতে পারে। এই মতবাদ অনুযায়ী আমরা বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে জেনে থাকি। বস্তুটি যেমন, আমাদের মনে ঠিক সেরূপ ধারণা হয়ে থাকে। জ্ঞানের কাজ সৃষ্টি করা নয়, যে বস্তু আছে তাকে প্রকাশ করা।

বস্তু ক্ষণকালের জন্যই অবস্থান করে, তবু প্রত্যক্ষণই যে বস্তু সৃষ্টি করে তা নয়। আমাদের প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভর না করেও বস্তুর নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। বস্তুর পরিবর্তন হয় সত্য, তবে সে পরিবর্তন হল বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার বা রূপের পরিবর্তন।

বৈভাষিকরা বাহ্য জগতের সত্তা স্বীকার করে। তাদের মতে বস্তুকে দুভাগে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে—বাহ্য এবং অভ্যন্তর। বাহ্য বস্তু বলতে আমরা ভূত বা উপাদানকে এবং ভৌতিক বা উপাদানে গঠিত বস্তুকে বুঝে থাকি। অভ্যন্তর বস্তু বলতে বুঝি চিত্ত বা বুদ্ধি এবং চৈত্ত বা চেতনাময় বস্তু। বৈভাষিকরা চারটি ভূত স্বীকার করে অর্থাৎ—ক্ষিতি, অপঃ, তেজ এবং মরুৎ।

বৈভাষিকরা পরমাণুবাদে বিশ্বাসী এবং তারা বহুবাদী। বৈভাষিকরা মনে করে পরমাণুর ছটি দিক আছে—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্ধ্ব এবং অধঃ। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরমাণু এক, কারণ পরমাণু অবিভাজ্য। রূপের সবচেয়ে ক্ষুদ্র আকারই হল পরমাণু। পরমাণু হল অবিভাজ্য, অতীন্দ্রিয়, অবিনাশী, অশ্রোত্যা, অনাস্বাদ্য এবং অস্পর্শনীয় (intangible)। পদার্থ দু প্রকার সংস্কৃত বা যৌগিক (compound) আর অসংস্কৃত বা অযৌগিক (uncompounded)।

কোন একটি পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। পরমাণুর সমষ্টিকেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রনেই যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি। যে সব পদার্থ প্রত্যক্ষ গোচর, সেগুলি জড় পরমাণুর সমষ্টি। পরমাণুর সংমিশ্রণেই দৃশ্য অণুর উদ্ভব। সংস্কৃত পদার্থ অনিত্য এবং পরিবর্তনশীল। আভ্যন্তরীণ বস্তুরূপে যে চিত্তকে আমরা প্রত্যক্ষ করি সে-চিত্ত নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই চিত্তের কোন নিত্য সত্তা নেই। এই চিত্ত পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি।

বৈভাষিকদের মতে নির্বাণ হল এক ভাবাত্মক অবস্থা (a positive condition) সর্বাস্তিবাদীরা তিনটি অসংস্কৃত ধর্ম এবং বাহাত্তরটি সংস্কৃত ধর্ম স্বীকার করে। ধর্ম কথাটি বৌদ্ধ-দর্শনে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্মের অর্থ অন্তিম উপাদান। এই উপাদান ক্ষণিক কিন্তু অনিত্য। এই বাহাত্তরটি সংস্কৃত ধর্ম পরস্পরের সহযোগে ক্রিয়া করে। তিনটি অসংস্কৃত ধর্ম হল—আকাশ, প্রতিসংখ্যা নিরোধ এবং অপ্রতি সংখ্যা নিরোধ। এগুলির কোন পরিবর্তন নেই এবং এগুলি অভাবাত্মক নয়—ভাবাত্মক। এগুলি পরস্পরের সহযোগে ক্রিয়া করে না। সৌত্রান্তিকরা এগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অভাবাত্মক ধারণারূপেই গ্রহণ করে। কারণ যার সত্তা আছে তা 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' নীতির অধীন। বৈভাষিকদের মতে এই ধর্মগুলি কোন কিছুর দ্বারা উৎপন্ন হয় না। প্রতিসংখ্যানিরোধের অর্থ হল চেতনা থেকে সকল রকম বাসনা, ক্লেশ এবং কলুষতার বিলোপ সাধন। প্রতিসংখ্যা বা পারমার্থিক জ্ঞানের সাহায্যেই এই নিরোধ সম্ভব।

এটি হল একটি ভাবাত্মক অবস্থা, যেহেতু নিরোধ হল একটি ভাবাত্মক অবস্থা। নিরোধের অর্থ যে দুটি বস্তু পূর্বে সংযুক্ত ছিল তাদের বিযুক্তি বা বিচ্ছিন্নতা। এই বিযুক্তি বা বিচ্ছিন্নতার অবস্থা অভাবাত্মক অবস্থা নয়, এ হল একটা ভাবাত্মক অবস্থা। অপ্রতিসংখ্যানিরোধ হল সেই নিরোধ যা পারমার্থিক জ্ঞানের সাহায্যে সাধিত হয় না। প্রত্যক্ষণের সাহায্যে ক্লেশগুলির কারণ বা হেতুগুলি দূর করার ফলে ক্লেশের উদ্ভব হয় না, ক্লেশের নিরোধ ঘটে। সুতরাং অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধও হল এক ভাবাত্মক অবস্থা।

বৈভাষিকদের মতে এই প্রতিসংখ্যানিরোধ বা ক্লেশের বিলোপই জীবনের পরমার্থ বা একমাত্র কাম্যবস্তু। নির্বাণ ও প্রতিসংখ্যানিরোধ হল অভিন্ন। (১) এই নির্বাণ হল এমন এক অবস্থা যাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নির্বাণপ্রাপ্ত সাধক নিজেই কেবলমাত্র এই অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করতে পারে। ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের মতে "বৈভাষিকদের মতে নির্বাণ হল এক শাশ্বতঃ স্থিতি যা নিজে উৎপাদিত হয় না বা কিছু উৎপাদন করে না। এ হল পরিদৃশ্যমান জগতের অপূর্ণতা ও অশুদ্ধতা হতে মুক্ত এক পূর্ণ ও পার্থক্যবিহীন সত্তা।"

কারও কারও মতে নির্বাণের এই অবস্থা হল চৈতন্যহীন বা চৈতন্যমুক্ত। চৈতন্যহীন, কেননা চেতনার কোন বিষয় বস্তু থাকে না। তবে চৈতন্যহীন অবস্থা হলেও এ হল ভাবাত্মক অবস্থা।

(৬) বৌদ্ধধর্ম-সম্প্রদায় (The Religious Schools of Buddhism):

বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থায় বৌদ্ধগণের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ দেখা দিলেও বা তাদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হবার যে একটা প্রবণতা প্রকাশ হলেও তা বুদ্ধদেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তেমন কার্যকরী হতে পারেনি। কিন্তু বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর এই মতভেদের বিষয়টি আর চাপা থাকল না। এই মতভেদ দূর করার জন্য বৈশালীতে বৌদ্ধগণের একটা সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল, কিন্তু সে সম্মেলন সফল হল না। প্রাচীনপন্থী গোঁড়া বৌদ্ধগণ যাঁরা স্থবিরবাদী নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় আচার-ব্যবহারের কঠোরতা শিথিল করার বিরোধী ছিলেন এবং মতভেদের জন্য বহুসংখ্যক ভিক্ষুককে সংঘ থেকে বহিষ্কৃত করলেন। এই বিতাড়িত ভিক্ষুরা এক পৃথক সম্মেলনে সম্মিলিত হলেন এবং মহাসঙ্গিক নামে একটি পৃথক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সম্প্রদায়ই পরবর্তীকালে মহাযান সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়েছিল। প্রাচীন-পন্থী স্থবিরবাদীরাই হীনযান সম্প্রদায় নামে পরিচিত হলেন।

হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়

বুদ্ধদেব বাহ্যিক যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। তিনি নৈতিক শুচিতা, অন্তরের পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম এবং কামনা ও ভোগতৃষ্ণা পরিহার করে সংযত জীবনযাপন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। জীবের একমাত্র লক্ষ্য নির্বাণ বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ এবং ঈশ্বর বা অপর ব্যক্তির করুণার প্রার্থী না হয়ে নিজের আন্তরিক চেষ্টায় এই নির্বাণ লাভ করতে হবে। বুদ্ধদেব কর্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষ যেমন কর্ম করবে তেমনই ফলভোগ করবে। এই কর্মবিধি অলঙ্ঘনীয়।

বুদ্ধদেব কর্মের ওপর গুরুত্ব দিতেন

কাজেই চিরমুক্তি লাভের জন্য যে পথ বুদ্ধদেব নির্দেশ করেছিলেন তার জন্য প্রয়োজন কঠোর সংযম, আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়সংকল্প ও নৈতিক শুচিতা। সাধারণ দুর্বলচিত্ত মানুষের পক্ষে এই পথ অনুসরণ করা সকল সময় সহজ ছিল না। সে কারণে বুদ্ধদেবের জীবিতকালে বৌদ্ধধর্ম অনুসরণকারীর সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু বুদ্ধদেবের তিরোধানের পরে সম্রাট অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্ম রাজানুগ্রহের সমর্থন লাভ ক'রে দেশে দেশে প্রচারিত হতে লাগল এবং পরবর্তীকালে রাজা কণিষ্কের উৎসাহ ও প্রেরণার ফলে এই সম্প্রদায়ের শিষ্য সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে একটি বৃহৎ সংখ্যায় পরিণত হল। কিন্তু পূর্বে যাঁরা বুদ্ধদেবের নির্দেশিত পন্থা বা আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সংখ্যায় অল্প হলেও, তাঁরা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সংযমী, নীতিনিষ্ঠ, ত্যাগী, বিবেকী ও আত্মনির্ভরশীল। কিন্তু পরবর্তীকালে শিষ্যসংখ্যা বর্ধিত হলেও, তাঁদের অনেকেরই মধ্যে পূর্বোক্ত সদ্গুণগুলির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হল। এই সকল ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্মের নীতি-বিরোধী কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল না সংযমের দৃঢ়তা, ছিল না অন্তরের পবিত্রতা বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় আচার-ব্যবহার অনুসরণ করার মত চিত্তের দৃঢ়তা। ফলে বৌদ্ধধর্মের সুমহান আদর্শের সঙ্গে তাঁদের কার্যকলাপের অসংগতি অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকট হয়ে উঠল।

দুর্বলচিত্ত মানুষের পক্ষে বুদ্ধদেব নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা কঠিন ছিল

বৌদ্ধদের সংখ্যা বাড়লেও, অনেকেই বৌদ্ধনীতি-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে লাগল

প্রাচীনপন্থীরা এই অবস্থাকে স্বাগত জানাতে পারল না। তাঁদের মতে শিষ্যসংখ্যা যদি কমও হয় ক্ষতি নেই, তবুও বুদ্ধের মহান আদর্শ ও বাণীর অবমাননা এবং ধর্মের বিশুদ্ধতা নষ্ট হতে দেওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। অপরপক্ষে নবীনপন্থীরা সকলকেই স্বাগত জানাতে অভিলাষী এবং তার জন্য যদি উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বৌদ্ধধর্মের কঠোরতাকে কিছু শিথিল করতে হয় এবং তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনতে হয়, তাহলে তাও শ্রেয়। এইভাবে বৌদ্ধদের মধ্যে প্রাচীন-পন্থী ও নবীনপন্থী—এই দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। প্রাচীনপন্থীরা বুদ্ধদেবের নীতি ও আদর্শকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত করতে রাজী নন এবং এঁরা হলেন হীনযানী। নবীনপন্থীরা ছিলেন পরিবর্তনের পক্ষপাতী এবং এঁরা হলেন মহাযানী।

প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী—এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল

হীনযান কথাটির অর্থ ক্ষুদ্র যান। হীনযানীদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তি কেবলমাত্র আত্মমুক্তির জন্য চেষ্টা করবে, পরের মুক্তির জন্য নয়। মুক্তির জন্য বাইরের সাহায্যের আশা না করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা মুক্তিলাভের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। হীনযানীদের মতে এরূপ ব্যক্তিই হলেন অর্হৎ। অর্হৎ-যান হচ্ছে এমন একটি ক্ষুদ্র (হীন) যান যাতে একজন মাত্র যাত্রীই আরোহণ করে এই দুঃখময় সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করতে পারে। বুদ্ধযান বা বোধিসত্ত্বযান হচ্ছে এমন একটি বৃহৎ (মহা) যান যে যানে সাধক অন্য ব্যক্তিকেও সহযাত্রী-হিসেবে গ্রহণ ক'রে এই দুঃখময় সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করতে পারে। হীনযান এবং মহাযান কথা দুটিকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধারণতঃ হীনযান হল হীন বা নিম্নমার্গ এবং মহাযান হল মহান বা উচ্চমার্গ।

হীনযান ও মহাযান শব্দের অর্থ

হীনযান সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য: হীনযান বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, তাঁরা কর্মবাদে বিশ্বাসী। এই কর্মবাদ অনুসারে যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফললাভ করবে। মানুষের কর্মফল কখনও বিনষ্ট হয় না, এই কর্মফল মানুষকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এর জন্য মানুষ পুনর্জন্মগ্রহণ করে এবং দেহ ধারণ করে।

হীনযান বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়

হীনযান বৌদ্ধগণ বুদ্ধের ধর্মোপদেশ, নীতি ও বাণী যথাযথ অনুসরণ করার পক্ষপাতী। সকল রকম ভোগবাসনা পরিহার করে, আত্মনির্ভরশীল হয়ে বুদ্ধের আদর্শকে অনুসরণ করাই তাঁরা কর্তব্য মনে করেন। নির্বাণ লাভের জন্য প্রয়োজন, ইন্দ্রিয়সংযম ও সকল রকম বাসনাকে জয় করা এবং এর জন্য কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে হয় না। নির্বাণ-প্রাপ্ত সাধক হলেন অর্হৎ বা পূজনীয়। এই নির্বাণের জন্য অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নয়। নিজের মুক্তি নিজেকেই অর্জন করতে হবে। 'আত্মদীপোভব' বুদ্ধদেবের এই উক্তির ওপর হীনযান বৌদ্ধগণ খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। "নিজেকে নিজেই তুমি আলো দেখাও, নিজের মুক্তির পথ নিজেই সন্ধান করে নাও, অপরের সাহায্যের বা করুণার প্রত্যাশী হয়ো না।"

নিজের চেষ্টায় নির্বাণ লাভ করতে হবে

হীনযান বৌদ্ধগণের মতে প্রত্যেক ব্যক্তিই পরের মুক্তির জন্য চিন্তা না করে নিজের মুক্তির জন্য চিন্তা করবে। আত্মমুক্তিই হবে প্রতিটি ব্যক্তির লক্ষ্য।

হীনযানীরা সাধারণ মানুষের জীবনধারা থেকে নিজেদের দূরে নির্বাসিত করে নির্জন স্থানে ধ্যানের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ করার কথা বলে থাকেন। বুদ্ধদেবের আর্যসত্য চতুষ্টয়ের অনুধাবন এবং ধ্যানই নির্বাণ লাভের উপায়। হীনযানীরা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাপন নিষিদ্ধ বলেই মনে করেন। সামাজিক জীবনযাপনের ফলেই স্নেহ, মায়ামমতার উদ্ভব হয় এবং তার পরিণতি দুঃখ। হীনযানীরা এতখানি কঠোরতা অবলম্বন করতে চান যে বাহ্যজগতের সৌন্দর্য থেকে দৃষ্টিকে অপসারিত করার জন্য পথ পরিক্রমণ করার সময় তাঁরা চোখ বুজে চলার পক্ষপাতি। জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে বিবাহিত জীবনযাপন থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ বিবাহিত জীবন জলন্ত চুল্লীর সমতুল্য।

হীনযানীরা পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-যাপনের বিরোধী

নির্বাণের অর্থ বিজ্ঞান বা চেতনার নিবৃত্তি। চেতনা হল কোন কিছুকে লাভ করার জন্য অনুভূতি এবং তার ফলেই বন্ধন সূচিত হয়। নির্বাণ হল চরমবিলুপ্তি, সুতরাং নির্বাণ হল অভাবাত্মক।

হীনযানীরা সর্বাস্তিবাদী, অর্থাৎ তারা জড়জগৎ এবং মনোজগত উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে। হীনযানীদের মতে সব কিছুই ক্ষণিক, যার সত্তা আছে, তা ধর্মের দ্বারা গঠিত। ধর্ম কথাটিকে এখানে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্ম হচ্ছে সত্তার অন্তিম উপাদান। এগুলি অসংস্কৃত, এদের আর কোন ক্ষুদ্রতর উপাদান হয় না। কোন সনাতন চেতন সত্তার অস্তিত্ব নেই, চিন্তা এবং অনুভূতিরই অস্তিত্ব আছে ; এর অন্তরালে কোন শাশ্বত আত্মা বা চেতন সত্তার অস্তিত্ব নেই। আত্মা হল পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ।

হীনযানীরা সর্বাস্তিবাদী

হীনযান বুদ্ধগণের বৌদ্ধমতকে দক্ষিণ দেশীয় বৌদ্ধমত নামেও অভিহিত করা হয়, যেহেতু সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ প্রভৃতি দক্ষিণ দেশেই এই ধর্মমত প্রচলিত হয়েছিল। মহায়ান বুদ্ধগণের বৌদ্ধমতকে উত্তরদেশীয় বৌদ্ধমত নামে অভিহিত করা হয়, যেহেতু তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে এই ধর্মমতের প্রচলন হয়েছে। কিন্তু *Rhys Davids*-এর মতে এ-জাতীয় শ্রেণীবিভাগের মূলে অভিমতগত বা ভাষাগত কোন সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না।

হীনযানীদের মতবাদ পালি ভাষায় লিখিত। হীনযানীরা ত্রিপিটককেই প্রামাণ্য বলে মনে করে এবং সেহেতু তাদের ধর্মমত ত্রিপিটকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে হীনযান মতবাদকে অনেকেই প্রাচীন বৌদ্ধমতবাদ বলে স্বীকার করেন। প্রাচীনপন্থী স্থবিরদের মতবাদ বলে অনেকে এই মতবাদকে স্থবিরবাদ বা সেরাবাদ নামেও অভিহিত করেন। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক দর্শন-সম্প্রদায় হীনযান-সম্প্রদায়ভুক্ত।

হীনযানীদের মতবাদ স্থবিরবাদ বা সেরাবাদ নামেও পরিচিত

(চ) মহাযান সম্প্রদায়ঃ

সম্রাট অশোকের সময় থেকে কণিষ্কের সময় পর্যন্ত মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটে এবং তার পরবর্তী সময়ে এই ধর্মমত বিশেষভাবে প্রসার লাভ করতে থাকে।

হীনযান সম্প্রদায় ধর্মমত অনুসরণ করার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করতেন। কোন প্রকারেই ধর্মের বিশুদ্ধতা তাঁরা নষ্ট হতে দিতে চান না। এর ফলে মানুষের উচ্চতর সত্তার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা তাকে তারা উপেক্ষা করেছেন এবং মানুষের আধ্যাত্মিক দিকটির প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। মানুষের এই উপেক্ষিত আধ্যাত্মিক দিকটি শুষ্ক বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। হীনযানীরা বুদ্ধকে সাধারণ মানুষ বলেই মনে করতেন, মহাযানীদের মতে বুদ্ধই ভগবান। মহাযানীরা নির্বাণকে চরম বিলুপ্তি বলে মনে করেন, কিন্তু চরম বিলুপ্তির প্রতি সাধারণ মানুষের স্বভাবতঃই কোন আকর্ষণ থাকতে পারে না। সে কারণে হীনযানীদের ধর্মমত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারল না। আধ্যাত্মিকতার অনুপস্থিতি, কল্পনার অভাব, শুষ্ক বিচারবুদ্ধি, জীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য অস্বাস্থ্যকর উপায় অনুসরণ, নির্বাণকে চরম বিলুপ্তিতে পরিণত করা এবং নৈতিক জীবন যাপনের জন্য অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্রতা ও কঠোরতা অবলম্বন করার জন্য হীনযানীদের ধর্মমত সাধারণ মানুষের মনে প্রেরণা জাগাতে পারেনি। এই ধর্ম ছিল স্বল্প কয়েকজন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিরই উপযোগী। অনুভূতিপ্রবণ, উপাসনা-ইচ্ছুক এবং অধ্যাত্মতৃষ্ণায় আকুল ব্যক্তি একটি উদার ধর্মমতের জন্য লালায়িত। তার সে অভাব পূরণ করল মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্মমত। ঈশ্বর, আত্মা এবং মানুষের অদৃষ্ট সম্পর্কে মহাযানীরা ভাবাত্মক ধারণা মানুষের কাছে উপস্থাপিত করল।

হীনযানী সম্প্রদায় মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি সুবিচার করতে পারেনি

মহাযান সম্প্রদায় ঈশ্বর, আত্মা এবং মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবাত্মক ধারণা উপস্থাপিত করল

মহাযানীরা আত্মমুক্তির কথা প্রচার না করে সকলের মুক্তির কথা বলে থাকেন। বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করার পরও বিশ্বের দুঃখপীড়িত মানুষের দুঃখমুক্তির জন্য তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

মহাযানীরা বুদ্ধদেবের মহৎ জীবন ও কার্যাবলী থেকেই তাঁদের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং সে কারণে তাঁদের লক্ষ্য ছিল মাত্র নিজের দুঃখমুক্তি নয়, সর্বসাধারণের দুঃখমুক্তি। মহাযানীরা হীনযানীদের আদর্শ বা লক্ষ্যকে উচ্চ আদর্শরূপে গণ্য

বিশ্বের লোকের দুঃখমুক্তিই মহাযানীদের লক্ষ্য

করতে পারতেন না, যেহেতু তাঁরা কেবলমাত্র আত্মমুক্তির কথাই প্রচার করতেন, কিন্তু মহাযানীদের মতে বিশ্বের লোকের দুঃখমুক্তিই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মহাযান সম্প্রদায়ের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই এই সম্প্রদায়ের ধর্মমতের প্রকৃত স্বরূপটি জানা যাবে।

(ক) **বোধিসত্ত্বের আদর্শঃ** মহাযানীরা মনে করতেন যে, আত্মমুক্তির আদর্শটি স্বার্থদুষ্ট, যেহেতু বিশ্বের অসংখ্য দুঃখপীড়িত লোকের দুঃখপরিত্রাণের কথা এতে নেই। সে কারণে মহাযানীরা অর্হৎ-এর আদর্শ পরিহার করে বোধিসত্ত্বের আদর্শকেই গ্রহণ করেছিল। বোধিসত্ত্ব কথারটি ণরাধাস অর্থ—যার সত্তা হল পরম জ্ঞান বা বোধি, কিন্তু বোধিসত্ত্ব বলতে সাধারণতঃ বোঝায় সেই ব্যক্তিকেই যিনি পরমজ্ঞান বা বোধি অর্জনের পথে বা বুদ্ধত্ব লাভের পথে উপনীত হতে চলেছেন। গৌতম বুদ্ধ যখন বুদ্ধত্বের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন তখন তাঁর সম্পর্কে এই শব্দটি উক্ত হয়েছিল। বোধিসত্ত্বের আদর্শ হল পরমজ্ঞান লাভ করা এবং এই পরম জ্ঞান বা প্রজ্ঞা ও ভালবাসার দ্বারা বিশ্বের দুঃখজর্জরিত মানুষের দুঃখ দূর করে তাদের মোক্ষ লাভের জন্য সহায়তা করা। সুতরাং তিনিই বোধিসত্ত্ব যাঁর সত্যোপলব্ধি ঘটেছে, যিনি প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছেন এবং অপরের মুক্তির জন্য যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। করুণা এবং প্রজ্ঞাই হল তাঁর জীবনের পাথেয়। বোধিসত্ত্বরা অপরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য বার বার জন্ম ও মৃত্যুর অধীন হন। কিন্তু বার বার জন্ম-মৃত্যুর অধীনস্থ হলেও সংসারের মায়া, মোহ, পাপ, পঙ্কিলতা তাদের স্পর্শ করতে পারে না। পদ্মের জন্ম পাঁকে, কিন্তু পাঁকের মলিনতা যেমন শুচি-শুভ্র পদ্মকে স্পর্শ করতে পারে না, সেরূপ এ জগতের পাপ ও পঙ্কিলতা তাদের স্পর্শ ক'রে তাদের মধ্যে কোনরূপ মালিন্য সৃষ্টি করতে পারে না। অপরের কর্মফলের সঙ্গে নিজেদের সৎকর্মের ফলগুলিকে তাঁরা বিনিময় করে নেন। অপরকে দুঃখমুক্ত করার জন্য তাদের অপরের কর্মের ফলভোগ করতে হয়।

বোধিসত্ত্বের আদর্শ

মহাযানীদের মতে দান, বীর্য, (ধৈর্য) শীল, ক্ষান্তি, (ক্ষমা) ধ্যান এবং সর্বোপরি প্রজ্ঞা হল নৈতিক জীবনের নীতি। মহাযানীরা বৌদ্ধ সংঘের কঠোরতার পক্ষপাতী নন। ভিক্ষু হওয়া বা না হওয়া ব্যক্তির চরিত্র এবং প্রবণতার ওপর নির্ভর করে। বিবাহিতের পক্ষেও বোধিসত্ত্বের আদর্শ গ্রহণ করা সম্ভব। বুদ্ধের নীতি অনুসরণ করাই হল মোক্ষ লাভের পথ। মহাযানীরা কেবলমাত্র নিজ শক্তির সাহায্যেই মোক্ষ লাভে বিশ্বাসী নয়। একজন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন। হীনযানীদের মতে যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই নির্বাণ লাভ করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র ভিক্ষুজীবন যাপনের মাধ্যমে স্বল্প কয়েকজন দৃঢ় চিত্ত ব্যক্তির পক্ষেই নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। সাধক বোধিসত্ত্বরূপে সাধনা আরম্ভ করে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারে—এরূপ ধারণাকে হীনযানীরা সমর্থন করতেন না। মহাযানীদের মতে যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই বোধিসত্ত্ব হওয়া সম্ভব, এমন কি নীচ জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির পক্ষেও বুদ্ধের বাণী অনুসরণ করে বোধিসত্ত্ব হওয়া সম্ভব। মহাযানীদের এই মানবিকতা ও বিশ্বজনীনতার আদর্শ প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বুদ্ধদেবের নিজের ইচ্ছাই ছিল সকল মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করা, সে কারণে তিনি ভিক্ষুদের, মানুষের মঙ্গলের জন্য তাঁর বাণী প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হীনযানীদের কাছে নৈতিকতা হল নঞর্থক, বা অভাবাত্মক, যেহেতু নৈতিকতা বলতে তাঁরা মনে করতেন মনকে কামনা, বাসনা, ভোগতৃষ্ণা থেকে মুক্ত করা। কিন্তু মহাযানীদের বোধিসত্ত্বের আদর্শ কেবলমাত্র চিত্ত থেকে ভোগ বাসনা দূর করা নয়, নিজের কর্মের সৎফলগুলিকে অপরের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করা।

মহাযানীরা নির্বাণ লাভের ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে বোধি অর্জনের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। মহাযানীদের মতে নির্বাণ স্থির বিলুপ্তি নয়, এ হল পরমাত্মা বা মহাত্মার সঙ্গে পরম মিলন (Union with the great soul of the Universe or Mahatman)। নির্বাণ হল পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি, জন্ম-মৃত্যুরূপ চক্র থেকে মুক্তি, বাসনা, অজ্ঞতা ও ক্রোধের অপসারণ। নির্বাণ হল পর নির্ভরশীল সত্তা (Unconditioned being)। নির্বাণ অস্তিত্বহীনতা নয়, এ হল অজ্ঞানতাকে জয় করে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা।

(খ) বুদ্ধই ঈশ্বর : সাধারণ মানুষ জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত হয়ে দুঃখ দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হয়ে ঈশ্বরের চরণতলেই আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। ঈশ্বরের করুণার জন্য তার তৃষিত মন হাহাকার করে ওঠে। সেই কারণে যে-ধর্মে ঈশ্বরের স্থান নেই, সেই ধর্ম তার কাছে কোন সান্ত্বনা বহন করে আনতে পারে না। সেই কারণেই হীনযান সম্প্রদায়ের ধর্মমত সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেনি, যেহেতু হীনযানীরা কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় এবং তাদের মতে অপরের কোন রকমের সাহায্যের

মুখাপেক্ষী না হয়ে—এমনকি ঈশ্বরের করুণার কথাও চিন্তা না করে মোক্ষ লাভের কথা চিন্তা করতে হবে।

মহাযান সম্প্রদায় সাধারণ মানুষের এই আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মেটাবার জন্য সচেষ্ট হলেন। তাঁদের মতে বুদ্ধই ভগবান। মহাযানীরা এক পরম সত্তায় বিশ্বাসী। বুদ্ধ তাঁরই অবতার—এই পরম সত্তা বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মের মতন অবাঙ মানসগোচর। তিনি বর্ণনার অতীত। ভাষায় তাকে প্রকাশ করা যায় না। তিনি এক অতীন্দ্রিয় সত্তা, তিনি বিশ্বকে অতিক্রম করেই বর্তমান। তিনি নিরাকার, নির্গুণ এবং জ্ঞানের অতীত ; কিন্তু বিশ্বকে অতিক্রম করে থাকলেও, তিনি বিশ্বের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন সগুন ব্রহ্ম বা ঈশ্বররূপে নিজেকে প্রকাশিত করে, এই অতীন্দ্রিয় পরম সত্তাও ধর্মকায়ের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করে। ধর্মকায়রূপে তিনি এই জগতকে নিয়ন্ত্রিত করেন। বুদ্ধ ত একজন নন, গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও আরও অনেক বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেছে এবং মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য যুগে যুগে তারা আবির্ভূত হয়েছেন। বুদ্ধ ঈশ্বরের অবতার, সুতরাং পরম সত্তা ধর্মকায় রূপে বিশ্বের লোককে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করার জন্য সহায়তা করে।

বুদ্ধই ঈশ্বর

মহাযানীরা ধর্মকায়রূপে বুদ্ধকে ভগবানের আসনে বসিয়ে সাধারণ মানুষের ঈশ্বরের অভাব পূরণ করলেন, যাতে সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের মতনই বুদ্ধের কাছে করুণা, ভালবাসা এবং সাহায্যের জন্য প্রার্থী হতে পারে। যেহেতু বুদ্ধই ভগবান—সেহেতু মানুষের আধ্যাত্মিক অতৃপ্তির আর কোন কারণ থাকল না।

(গ) সনাতন আত্মার ধারণা : প্রাচীন বৌদ্ধমতে কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব নেই। আত্মা হল আমাদের চিন্তা, ভাব, ধারণা, অনুভূতি প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার প্রবাহ বা ধারা। সাধারণ মানুষ চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার অন্তরালে এই সব মানসিক প্রক্রিয়ার আধাররূপে আত্মারূপ কোন নিত্য পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে। প্রাচীন বৌদ্ধগণ এই জাতীয় মানসিক প্রক্রিয়ার আধাররূপে কোন স্থায়ী সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়।

সাধারণ মানুষ আত্মার অস্তিত্বহীনতায় কোনমতে বিশ্বাসী হতে পারে না। আত্মাই যদি না থাকে তবে মানুষের ব্যক্তিসত্বা বলে কিছু থাকে না, তাহলে মানুষ কার জন্য কর্ম করবে? মানুষের মুক্তিলাভের সাধনাই বা কার জন্য?

সনাতন আত্মার ধারণা

মহাযানীরা আত্মার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষের এই অভাবও পূরণ করল। মহাযানীদের মতে জীবাত্মার (Individual self) কোন সত্তা নেই, জীবাত্মা মিথ্যা। এ হল তুচ্ছ, ক্ষুদ্র; এর কোন নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এই জীবাত্মা হল মহাত্মা বা পরমাত্মার প্রকাশ। এই পরমাত্মা হল এক অতীন্দ্রিয় সত্তা, যা সকল জীবের আত্মাস্বরূপ। এই পরমাত্মাই সত্য। এই পরমাত্মা সকল জীবের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করছে। জীবাত্মা যখন মহাত্মা বা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় তখনই তার মহানির্বাণ ঘটে।

মহাযানীদের দার্শনিক মতবাদের আলোচনা শূন্যবাদ এবং বিজ্ঞানবাদের আলোচনায় ইতিপূর্বে করা হয়েছে। কোন কিছুরই সত্তা নেই, মহাযানীরা এই মতবাদ স্বীকার করে না। মহাযানীরা 'ভূততথতার' সত্তা স্বীকার করে। এই সত্তাই হল ধর্মকায়। এ হল সর্বোচ্চ নীতি যা সকল অসঙ্গতির মধ্যে সামাঞ্জস্য স্থাপন করে, একেই বলা হয় নির্বাণ। এই হল বোধি বা জ্ঞান। এই, জগতের উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত করে। জগতের সকল বস্তুর উৎস এই সত্তা। একে ভাষার দ্বারা বর্ণনা করা যায় না।

এ জগত অবভাসিক, এর কোন সত্তা নেই। একে স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তবে এ যে একেবারেই অর্থহীন তা নয়। এ জগতের অস্তিত্ব নেই, তা নয়, তবে এর কোন চিরন্তন সত্তা নেই। এই জগত ক্ষণস্থায়ী এবং অনবরত পরিবর্তনশীল, যেহেতু পরমসত্তা সকল কিছুর মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করছে। প্রতি ব্যক্তিরই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। ব্যক্তি-আত্মা বা জীবাত্মা পরম সত্তারই প্রকাশ।

মহাযান সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ

অবিদ্যাই জগতের কারণ, অবিদ্যা থেকেই জগত-প্রক্রিয়ার শুরু। এই জগত পরমসত্তারই প্রকাশ, তা না হলে এ জগত একেবারেই অর্থহীন হত বা অলীক বস্তুর পর্যায়ে গিয়ে পড়ত।

মহাযানীদের ধর্মমত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং উত্তর দেশেই এই ধর্মমতের প্রচার ঘটেছিল।

(ছ) উপসংহারঃ

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা আমরা এখন সংক্ষেপে বুঝে নিতে পারি।

হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য

হীনযানীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, কিন্তু মহাযানীদের মতে বুদ্ধই ঈশ্বর বা ভগবান। হীনযানীদের মতে কোন শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব নেই। মহাযানীদের মতে জীবাত্মার কোন পৃথক সত্তা নেই সত্য, তবে পরমাত্মার আছে এবং জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রকাশ। হীনযানীদের মতে আত্মমুক্তিই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত, মহাযানীদের মতে বিশ্বের সকল লোকের মুক্তিই কাম্য। হীনযানীরা বৌদ্ধ ধর্মমতের কোনরকম পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়, যেহেতু তাঁদের মতে পরিবর্তনের ফলে ধর্মের বিশুদ্ধতা নষ্ট হবে। কিন্তু মহাযানীরা নৈতিক নিয়মানুবর্তীতার কঠোরতাকে কিছুটা শিথিল করে দিয়ে তাদের ধর্মমতকে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় সকলের উপযোগী করে তুলতে ইচ্ছুক।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদের দরুন তিক্ততার সৃষ্টি

বর্তমানেও দেখা যায় এই দুই সম্প্রদায় তাদের মতভেদের দরুন অনেক সময় পরস্পরকে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টায় নিজেদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করে। কিন্তু এ জাতীয় মনোভাব সমর্থনযোগ্য নয়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, উভয়েরই লক্ষ্য উচ্চ, ক্ষুদ্র নয়। হীনযানীরা ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্যই সকল রকম কঠোরতা ও কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনের পক্ষপাতী। আর মহাযানীদের লক্ষ্য হল মানবিকতা ও বিশ্বজনীনতা। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মুক্তি নয়, বিশ্বজনের মুক্তিই তাঁদের লক্ষ্য।

উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরেরর পরিপূরক

সুতরাং এই দুই লক্ষ্যের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। যে কোন ধর্মমতের বিশুদ্ধতা রক্ষার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে তাকে উদার এবং বিশ্বজনীন ক'রে তোলা, তাকে সর্বব্যাপক করে তোলা। সুতরাং এক হিসেবে উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক।

চতুর্থ অধ্যায়

ন্যায়-দর্শন

১। ভূমিকা (Introduction) :

ন্যায়-দর্শন আস্তিক বস্তুবাদী দর্শন। একে আস্তিক বলা হয়, যেহেতু এ বেদকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে এবং এ দর্শন বস্তুবাদী, যেহেতু এর মতে জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুর স্বাধীন সত্তা আছে। কিন্তু ন্যায়-দর্শন বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করলেও স্বাধীন চিন্তা ও বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মহর্ষি গৌতম ন্যায়-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অক্ষপাদ নামেও পরিচিত। তাঁর নামানুসারে তাঁর দর্শনকে অক্ষপাদ দর্শনও বলা হয়। ন্যায়-দর্শন প্রধানতঃ যথাযথ জ্ঞান লাভের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। কি উপায়ে বা কোন্ কোন্ বিধি অনুসরণ করে যুক্তি-তর্ক করলে আমরা যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারি—ন্যায়-দর্শন প্রধানতঃ তারই আলোচনা করে। এই কারণে ন্যায়-দর্শনকে 'তর্কশাস্ত্র' বা বাদবিদ্যাও বলা হয়। যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালীকে 'প্রমাণ' বলা হয়। ন্যায়-দর্শন 'প্রমাণ' নিয়ে আলোচনা করে বলে, ন্যায়-দর্শনকে প্রমাণশাস্ত্রও বলা হয়ে থাকে। 'আন্বীক্ষিকী[1] ন্যায়-দর্শনের আর একটি নাম। প্রত্যক্ষ বা শ্রুতির সাহায্যে যা জানা যায়, সে বিষয় পরে আলোচনা করার নাম হল অন্বীক্ষা। ন্যায়-শাস্ত্র প্রত্যক্ষ বা শ্রুতির সাহায্যে লব্ধ জ্ঞানকে পুনরায় বিচার করে দেখে বলেই তাকে আন্বীক্ষিকী বলা হয়। ন্যায়-দর্শনের ভাষ্যকার বাৎসায়ন আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে 'সকল বিদ্যার প্রদীপ'[2] বলে অভিহিত করেছেন।

ন্যায়-দর্শন আস্তিক বস্তুবাদী দর্শন

মহর্ষি গৌতম ন্যায়-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা

ন্যায়-দর্শনকে তর্কশাস্ত্র, বাদবিদ্যা, প্রমাণশাস্ত্র, আন্বীক্ষিকী নামেও অভিহিত করা হয়

---

1. অন্বীক্ষা—অনু-অর্থে পশ্চাৎ এবং ঈক্ষ্ অর্থে দর্শন।
2. সেয়মান্বীক্ষিকী—
   "প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্
   আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্তিতা"
   —বাৎসায়ন। ন্যায়ভাষ্য।

যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করলেও যুক্তি-তর্ক করাই ন্যায়-শাস্ত্রের কেবলমাত্র কাজ নয়। ন্যায়-শাস্ত্র তত্ত্ববিদ্যার বিভিন্ন সমস্যা,— যেমন জীব ও জগত, আত্মা ও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কেও আলোচনা করে। কি ভাবে মানুষ তার জীবনের পরমার্থ (Sumum Bonum) বা মোক্ষলাভ করতে পারে তা হল ভারতীয় দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ন্যায়শাস্ত্র তত্ত্ববিদ্যার বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও আলোচনা করে

এই মোক্ষ বা মুক্তি ন্যায়-দর্শনেরও আলোচ্য বিষয়। কিন্তু মোক্ষ বা মুক্তিলাভ করতে হলে তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য যথার্থ জ্ঞানের প্রণালী নিরূপণ করা দরকার। সে কারণে ন্যায়-শাস্ত্রে জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) আলোচনাও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে

সুতরাং যদিও অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মত ন্যায়-শাস্ত্র জীবনদর্শন ও জগর্দশন, তবুও তর্কশাস্ত্রের এবং জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাই ন্যায়-শাস্ত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে।

ন্যায়-দর্শনের ওপর একাধিক রচনা বর্তমান। গৌতমের 'ন্যায়সূত্রই' ন্যায়-দর্শনের প্রথম রচনা। পরবর্তী বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে বাৎসায়নের 'ন্যায়ভাষ্য', উদ্দ্যোতকরের 'ন্যায়-বার্তিক', বাচস্পতি মিশ্রের 'ন্যায়-বাতিক তাৎপর্য টীকা', উদয়নের 'ন্যায়-বার্তিক তাৎপর্য-পরিশুদ্ধি' এবং 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি', জয়ন্তভট্টের 'ন্যায়-মঞ্জরী' এবং ভাসর্বজ্ঞের 'ন্যায়-সার'-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ন্যায়ের দুটি শাখা—প্রাচীন ন্যায় এবং নব্য ন্যায়। উপরোক্ত রচয়িতারা সকলেই প্রাচীন ন্যায়-দর্শন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সব নৈয়ায়িকদের প্রধান কাজ ছিল—ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা করা এবং প্রতিপক্ষের সমালোচনা খণ্ডন করা। গঙ্গেশের 'তত্ত্বচিন্তামণি'কে কেন্দ্র করে নব্য ন্যায়ের উদ্ভব। গঙ্গেশের পুত্র বর্ধমান 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি প্রকাশ' এবং 'ন্যায়-নিবন্ধ প্রকাশ' নামে দুটি ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এ ছাড়াও রুচিদত্ত মিশ্র তত্ত্বচিন্তামণির ওপর 'প্রকাশ' এবং ন্যায়-কুসুমাঞ্জলির ওপর 'মকরন্দ' রচনা করেছিলেন। জয়দেব মিশ্রের 'আলোক', মথুরানাথ তর্কবাগীশের 'রহস্য', রঘুনাথ শিরোমণির 'দীধিতিপ্রকাশ', জগদীশ তর্কালঙ্কারের 'তর্কামৃত ও মাথুরী' এবং গদাধর ভট্টাচার্যের 'গাদাধরী' উল্লেখযোগ্য রচনা। বিশ্বনাথের 'ন্যায়তারিকা' ও 'সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নব্য ন্যায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন ন্যায়ের জনপ্রিয়তা অনেকাংশে কমে গেল।

নব্য নৈয়ায়িকগণ ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের সমন্বয়-সাধন করলেন এবং বৈশেষিকদের সাতটি পদার্থকে স্বীকার করে নিলেন।

ন্যায়-দর্শনের আলোচনায় চারটি অংশ লক্ষ্য করা যেতে পারে ; যথা— (১) জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা (২) জড়জগত সম্পর্কে আলোচনা (৩) জীবাত্মার স্বরূপ ও মোক্ষ সম্পর্কে আলোচনা এবং (৪) ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা।

২। পদার্থঃ

ন্যায়-দর্শনের উদ্দেশ্য জীবকে ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা। পদার্থ কাকে বলে ?—'পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ'। পদ দ্বারা যে বিষয় নির্দিষ্ট হয়, তাই পদার্থ। মোক্ষ লাভ জীবের লক্ষ্য এবং পদার্থ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান জীবের মোক্ষ লাভের পক্ষে প্রয়োজন। এই ষোলটি পদার্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হচ্ছে :

ষোল প্রকার পদার্থ

(১) **প্রমাণ** ঃ যিনি জ্ঞাতা তাকে বলা হয় প্রমাতা। প্রমাতা যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, তাকে বলা হয় প্রমেয়। যে প্রণালী দ্বারা যথার্থ জ্ঞান বা 'প্রমা' জন্মে তাকে প্রমাণ বলা হয়। প্রমাণ চার প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ।

প্রমাণ

প্রমতা, প্রমেয় ও প্রমাণ—এই তিনটির কোন একটির অভাব হলে জ্ঞান সম্ভব হয় না।

(২) **প্রমেয়** ঃ প্রমেয় হল জ্ঞানের বিষয়। ন্যায়-দর্শন অনুসারে জ্ঞানের বিষয় মোট বারটি। যথা—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বিষয় বা অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি (activity), দোষ, প্রেত্যভাব অর্থাৎ পুনর্জন্ম ও পুনঃপুনঃ মৃত্যু, ফল, দুঃখ এবং মোক্ষ।

প্রমেয়

(৩) **সংশয় বা সন্দেহ** ঃ অনিশ্চিত জ্ঞানই হল সংশয়। একই সময়ে একই বস্তুতে যখন বিপরীত ধর্ম বা গুণের উপস্থিতির কথা চিন্তা করা হয়, তখনই সংশয় দেখা দেয়। চার্বাকরা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। নৈয়ায়িকরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু একই সময়ে আত্মার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ই স্বীকার করা চলে না ; সেহেতু সংশয় দেখা দেয়, আত্মা আছে কি নেই। দূরে একটি বস্তুকে দেখে মনে হয় ওটি দড়িও হতে পারে, সাপও হতে পারে। সুতরাং বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়। সংশয় হল অযথার্থ জ্ঞান।

সংশয় বা সন্দেহ

(৪) **প্রয়োজন**ঃ যে উদ্দেশ্যে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাকেই প্রয়োজন বলে।

(৫) **দৃষ্টান্ত**ঃ দৃষ্টান্ত হল এমন একটি উদাহরণ যার সম্পর্কে কোন মতভেদ

দৃষ্টান্ত থাকে না। দৃষ্টান্ত হল প্রমাণসিদ্ধ। বাৎসায়ন এবং জয়ন্তের সংজ্ঞামতে দৃষ্টান্তকে বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ই স্বীকার করে নেয়।

(৬) **সিদ্ধান্ত**ঃ যে বিষয়কে যুক্তিতর্ক ও প্রমাণের দ্বারা সুনিশ্চিত

সিদ্ধান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাকেই সিদ্ধান্ত বলে। সিদ্ধান্ত হল কোন বিষয় সম্পর্কে স্বীকৃত সত্য।

(৭) **অবয়ব**ঃ অবয়ব হল ন্যায়ের আশ্রয় বাক্য (The constituent

অবয়ব propositions of syllogism)। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন—এই পাঁচটিকে ন্যায়ের অবয়ব বলা হয়।

(৮) **তর্ক**ঃ তর্ক হল এক প্রাকল্পিক যুক্তি (a hypothetical argument)। প্রমাণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেই সিদ্ধান্তের বিপরীতকে অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেখান হয় তাকেই

তর্ক তর্ক বলা হয়। একটি জ্বলন্ত প্রদীপকে একটি আবরণ দিয়ে আবৃত করার জন্য প্রদীপটা নিভে গেল। সিদ্ধান্ত করা হল যে, বায়ুর অভাবেই প্রদীপ নিভে গেল। এই সিদ্ধান্ত যদি কেউ অস্বীকার করে, তখন তার বিরুদ্ধে এই ভাবে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে 'যদি বাতাস না থাকে, তাহলে প্রদীপ জ্বলতে পারে না'। এই যুক্তিকেই বলা হয় তর্ক।

(৯) **নির্ণয়**ঃ পরস্পর-বিরোধী মতামত বিচার করে সিদ্ধান্ত করাই হল

নির্ণয় নির্ণয়। এ হল সেই যুক্তি যে যুক্তির সাহায্যে একপক্ষের মতকে গ্রহণ করা হয় এবং অপরপক্ষের মতকে বর্জন করা হয়।

(১০) **বাদ**ঃ বাদ হল সত্যতা নির্ধারণ করার জন্য উভয়পক্ষের নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করা। জয়ের কথা চিন্তা না করে যখন সত্যতা নির্ধারণের জন্য কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে নিজ নিজ মত

বাদ প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন তাহল বাদ। যেমন আত্মার অস্তিত্ব আছে আবার নেই, উভয় সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য হতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ করার জন্য যে আলোচনা তাই হল বাদ।

(১১) **জল্প**ঃ জল্প হল কেবলমাত্র জয়লাভের উদ্দেশ্যে বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। শাস্ত্ররীতি লঙ্ঘন করে যে বিচার করা হয় তাকেই জল্প বলে।

জল্প

(১২) **বিতণ্ডা**ঃ বিতণ্ডা হল বাজে তর্ক। অপরের মত খণ্ডনের জন্য বাজে তর্কের অবতারণা, অথচ যুক্তিতর্কের সাহায্যে নিজ মত প্রতিষ্ঠার কোন প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না।

বিতণ্ডা

জল্প ও বিতণ্ডা উভয়ই অত্যন্ত নিন্দনীয় বিষয়।

(১৩) **হেত্বাভাস**ঃ অনুমান সংক্রান্ত অনুপপত্তিগুলিকেই হেত্বাভাস বলে। যা আসলে হেতু নয়, অথচ হেতুরূপে প্রতিভাত হয় তাকেই হেত্বাভাস বলে। হেত্বাভাস হল দোষযুক্ত হেতু।

হেত্বাভাস

(১৪) **ছল**ঃ বাক্‌চাতুরী বা শ্লেষ প্রয়োগের দ্বারা প্রতিপক্ষের বাক্যের দোষ দেখান হল ছল। বাদী এক অর্থে একটি শব্দ ব্যবহার করে, প্রতিপক্ষ শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক হওয়ার জন্য শব্দটিকে অন্য অর্থে গ্রহণ করে। ছল তিন প্রকার ; যথা—**বাক্‌ছল, সামান্যছল ও উপচারছল**। দণ্ড কথাটিকে সময়ের অংশ—এই অর্থে গ্রহণ করে বাদী বলল যে দণ্ড হল ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু দণ্ড শব্দটির আর একটি অর্থ হল শাস্তি—এই অর্থে যদি তাকে প্রতিবাদী গ্রহণ করে তাহলে বাক্‌ছল হবে।

ছল

(১৫) **জাতি**ঃ ব্যাপ্তির ওপর ভিত্তি না করে কেবলমাত্র সাধর্ম (Similarity) বা বৈধর্মের ভিত্তিতে যখন কোন অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি উপস্থাপিত করা হয় তখন তাকে জাতি বলে। 'ঘটের মত উৎপত্তিশীল বলে আকাশ অনিত্য'—বাদীর এই যুক্তি ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য যদি প্রতিবাদী এই যুক্তি উপস্থাপিত করে যে, 'আকাশ নিত্য, কারণ ঘটের যেমন আকৃতি আছে, আকাশের সেরূপ আকৃতি নেই', তাহলে একে বৈধর্ম সমজাতি বলা হবে। প্রতিবাদীর যুক্তিটি কেবলমাত্র ঘটের সঙ্গে আকাশের বৈষম্য বা বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। সাধর্মসম, বৈধর্মসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম, বিকল্পসম, সাধ্যসম, প্রাপ্তিসম, অপ্রাপ্তিসম প্রভৃতি চব্বিশ রকমের জাতি আছে।

জাতি

(১৬) নিগ্রহস্থান ঃ বিচারে পরাজয়ের কারণকেই নিগ্রহস্থান বলে। এই কারণ নানা ভাবে উদ্ভূত হতে পারে। যদি কোণ ব্যক্তি প্রতিপক্ষের মতকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করতে না পারে বা প্রতিপক্ষ কর্তৃক নিজমত খণ্ডিত হওয়ার ফলে তাকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে, তবে সে কারণ হবে নিগ্রহ-স্থান। অজ্ঞানতা বা বিপরীত জ্ঞানই পরাজয়ের কারণ। প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, হেত্বান্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অপার্থক প্রভৃতি চব্বিশ প্রকারের নিগ্রহস্থান আছে। 'আকাশ অনিত্য, যেহেতু ঘটকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, আকাশকেও প্রত্যক্ষ করা যায়।' এই অনুমানের ভ্রান্তি দেখাবার জন্য যদি প্রতিবাদী বলে, 'আকাশ নিত্য, যেহেতু জাতির (genus) মত আকাশকেও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় এবং জাতি হল নিত্য'। এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদী ঘটের নিত্যতা স্বীকার করেছে, কারণ জাতি যদি নিত্য হয়, ঘটও নিত্য হবে, এ হল প্রতিজ্ঞাহানির উদাহরণ।

নিগ্রহস্থান

৩। যুক্তিমূলক বস্তুবাদ (Logical Realism) ঃ

নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী। বস্তুবাদ বলতে আমরা কি বুঝি? বস্তুবাদ অনুসারে এ জগতের বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাতার জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। ধরা যাক আমাদের সামনে আমরা একটি গাছ দেখছি। এই গাছটির অস্তিত্ব কি আমাদের জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে? অর্থাৎ আমরা যদি এই গাছটিকে নাও জানি তবুও এই গাছটির অস্তিত্ব আছে—এমন কথা কি বলা যাবে না? ভাববাদীদের মতে জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তুর কোন সত্তা নেই। তাঁরা বলেন, জ্ঞানের বস্তু বা বিষয়, জ্ঞান বা জ্ঞাতার ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি-চেতনাই হোক বা বিশ্বচেতনাই হোক, চেতনা-নিরপেক্ষ বস্তুর কোন সত্তা নেই। বস্তুবাদীদের মতে বস্তুর অস্তিত্ব কি ব্যক্তি-চেতনা বা কি বিশ্ব-চেতনা—কোন চেতনার ওপরই নির্ভরশীল নয়। বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের জানা না জানার ওপর নির্ভর করে না। যে গাছটিকে আমরা দেখছি, সেই গাছটি যদি কারও জ্ঞানের বিষয় না হয়, তাহলেও তার অস্তিত্ব

বস্তুবাদ কাকে বলে?

থাকবেই। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, বস্তুবাদীদের মতে বস্তুর মনো-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা আছে।

ন্যায়-দর্শনও বস্তুবাদী দর্শন; যেহেতু নৈয়ায়িকরা বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করে। তবে নৈয়ায়িকরা শব্দ বা শ্রুতি বা অনুভূতির ভিত্তিতেই বস্তুর এই জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্বের কথা মেনে নেয় না। নিছক বিশ্বাসের খাতিরেই তারা চেতনা-নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

যুক্তিমূলক বস্তুবাদ

যুক্তিতর্ক বিচারের মাধ্যমেই তারা বস্তুর এই অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। সেকারণে নৈয়ায়িকদের বস্তুবাদ যুক্তিমূলক বস্তুবাদ। নৈয়ায়িকদের মতে মানুষের জীবনের পুরুষার্থ হল মোক্ষ। কিন্তু বস্তুর যথার্থ জ্ঞানলাভ করতে না পারলে এই মোক্ষলাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আমাদের পক্ষে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা কি সম্ভব? তাহলেই আলোচনা করা প্রয়োজন যে, জ্ঞান কাকে বলে? যথার্থ জ্ঞানের সঙ্গে অযথার্থ জ্ঞানের প্রভেদ কি, যার দ্বারা যথার্থ জ্ঞান জন্মে সেই প্রমাণই বা কয় প্রকার? সংক্ষেপে তত্ত্ববিদ্যার আলোচনার পূর্বে জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) আলোচনা অপরিহার্য। সুতরাং ন্যায়-দর্শনের যে বস্তুবাদ তা হল যুক্তিমূলক বস্তুবাদ (Logical Realism)।

৪। জ্ঞানতত্ত্ব বা প্রমাশাস্ত্র (Theory of Knowledge):

ন্যায়-দর্শনে জ্ঞানকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে—'প্রমা' বা যথার্থ জ্ঞান এবং 'অপ্রমা' বা অযথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞান লাভের যে প্রণালী তাকে বলা হয় 'প্রমাণ'।

প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ

নৈয়ায়িকদের মতে প্রমাণ চার প্রকার; যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন—জ্ঞান কাকে বলে, জ্ঞান কয় প্রকার এবং যথার্থ জ্ঞানকে অযথার্থ জ্ঞান থেকে কি ভাবে প্রভেদ করা যেতে পারে। নীচে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) জ্ঞানের সংজ্ঞা এবং শ্রেণীবিভাগ (Definition and Classification of Knowledge): জ্ঞান বা বুদ্ধি হল বিষয়ের উপলব্ধি।

বিষয়ের প্রকাশই হল জ্ঞানের স্বরূপ। জ্ঞানের মাধ্যমে বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। প্রদীপের আলোক যেমন কোন বস্তুকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে, তেমনি জ্ঞানেরও কাজ হল অর্থপ্রকাশ অর্থাৎ বিষয়ের রূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত করা।

জ্ঞান কাকে বলে?

জ্ঞানকে সাধারণতঃ দু ভাগে ভাগ করা হয়—প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান এবং অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান। প্রমাকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়—প্রত্যক্ষণ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। অপ্রমাকেও চার ভাগে ভাগ করা হয়—স্মৃতি, সংশয়, ভ্রম বা বিপর্যয় এবং তর্ক।

প্রমা ও অপ্রমা

প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলতে বোঝায় বিষয়ের যথার্থ অনুভব। 'যথার্থানুভবঃ প্রমা'। আমি আমার সামনে একটি বৃক্ষকে দেখছি। এক্ষেত্রে বৃক্ষ সম্পর্কে আমার যে জ্ঞান তাকে আমি যথার্থ জ্ঞান বলব। কারণ এখানে আমার বৃক্ষের জ্ঞান সম্পর্কে কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ নেই। কোন বিষয়ের যে গুণ সেই গুণ জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে যথাযথ আছে, এরূপ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। যখন আমরা কোন ঘট প্রত্যক্ষ করি এবং জানি যে বস্তুতঃ ঘটের মধ্যে ঘটত্ব বর্তমান, তখন আমাদের জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান।

যথার্থ জ্ঞান কাকে বলে?

কিন্তু কোন বস্তুর মধ্যে যে গুণের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে নেই, কোন বস্তুতে সেই গুণ, যখন আমরা জানি, তখন আমাদের জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান। যখন আমরা দড়ির মধ্যে সাপের গুণ উপলব্ধি করি, যা প্রকৃতপক্ষে দড়িতে বর্তমান নেই, তখন আমাদের জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান। স্মৃতি যথার্থ জ্ঞান নয়. যেহেতু স্মৃতির ক্ষেত্রে বস্তুটি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয় না, বস্তুটি কেবল মানসপটে জাগরিত হয়। সংশয়কেও যথার্থ জ্ঞান বলা যেতে পারে না। কারণ, সংশয় হল অনিশ্চিত জ্ঞান। একটি বস্তুর মধ্যে বিপরীত গুণের অবস্থিতির ধারণা সংশয়ের সৃষ্টি করে; যেহেতু বিষয়ের যথার্থ অনুভবই জ্ঞান। ভ্রমকে যথার্থ জ্ঞানরূপে অভিহিত করা যেতে পারে না। যখন দড়িকে আমরা সাপ বলে মনে করি তখন তা অযথার্থ জ্ঞান নয়, যেহেতু দড়ি ত সাপ নয় এবং দড়িকে যখন সাপ বলে ভ্রম করি, তখন বিষয়ের যথার্থ অনুভব হচ্ছে না।

তর্কও যথার্থ জ্ঞান নয়, যেহেতু তর্কে আমরা বিষয়ের কোন জ্ঞান লাভ করি না। প্রমাণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেই সিদ্ধান্তের বিপরীতকে অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেখান হয়, তাকেই তর্ক বলা হয়। ধরা যাক আমি বললাম 'আত্মা নিত্য নয়, অনিত্য'। তখন আমি এই যুক্তি দিলাম যে, 'আত্মা যদি নিত্য না হয়, তাহলে কর্মের ফলভোগ সম্ভব হয় না ; এবং দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ ঘটবে'। সুতরাং এই যুক্তি পরোক্ষভাবে আত্মার নিত্যতা প্রমাণ করে। কিন্তু তর্ককে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা বলা যেতে পারে না, যেহেতু এই যুক্তির দ্বারা আত্মার নিত্যতার জ্ঞান লাভ করা যায় না। তর্ক সুনির্দিষ্ট জ্ঞান নয় এবং সেকারণে তর্কের দ্বারা বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যায় না। তর্ক প্রমাণ নয়, প্রমাণের সহায়ক।

তর্ক কাকে বলে ?

যথার্থ জ্ঞানকে অযথার্থ জ্ঞান থেকে কি ভাবে পৃথক্ করা যায় ? বিষয়ের স্বভাবের সঙ্গে যখন জ্ঞানের মিল থাকে, তখনই জ্ঞান যথার্থ হয়, তা না হলে জ্ঞান অযথার্থ হয়। গাছের পাতাটিকে আমি সবুজ বলে জানছি, যদি গাছের পাতাটির প্রকৃতই রঙ সবুজ হয়, তাহলে আমার জ্ঞান যথার্থ হবে। আর যদি গাছের পাতাটি সবুজ না হয়ে হল্‌দে হয় তাহলে ঐ জ্ঞান অযথার্থ হবে। পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যখন সবুজ গাছের পাতাটিকেও হল্‌দে দেখে, তখন তার জ্ঞান অযথার্থ। কারণ, পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্যই সে সবুজ পাতাকে হল্‌দে দেখছে। সুতরাং নৈয়ায়িকদের মতে বিষয়ের স্বভাবের সঙ্গে যখন জ্ঞানের সংগতি থাকে, অর্থাৎ জ্ঞান যখন বিষয়ের অনুরূপ হয়, তখনই জ্ঞান হয় সত্য। সুতরাং তদানুরূপতাই (Correspondence) সত্যতা, তদানুরূপতার অভাবই (Non-correspondence) ভ্রান্তি। কিন্তু প্রশ্ন হল, জ্ঞানের সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করার মানদণ্ড কি ? কিসের ওপর ভিত্তি করে বিচার করা যাবে যে, জ্ঞান যথার্থ হল কি অযথার্থ হল ? নৈয়ায়িকদের মতে 'প্রবৃত্তি সংবাদ' এবং 'প্রবৃত্তি বিসংবাদের' সাহায্যে জ্ঞানের সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব নির্ধারণ করা যায়। প্রবৃত্তি সংবাদ অর্থে ক্রিয়ার সফলতা অর্থাৎ যখন

যথার্থ জ্ঞান ও অযথার্থ জ্ঞানের পার্থক্য

প্রবৃত্তি সংবাদ ও প্রবৃত্তি বিসংবাদ

মনের ধারণাটি সফল কাজের সহায়ক হয় আর 'প্রবৃত্তি বিসংবাদ' অর্থে ক্রিয়ার বিফলতা অর্থাৎ যখন মনের ধারণাটি সফল কাজের সহায়ক হয় না। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক। তৃষ্ণার্থ পথিক দূর হতে যে বস্তুকে জল বলে ধারণা করল, কাছে গিয়ে যদি সে দেখে সত্যই তা জল, তবে সে তা পান করে। এক্ষেত্রে তার জলের জ্ঞান যথার্থ; এখানে কার্যের সফলতাই তার জ্ঞানকে যথার্থ বলে প্রমাণ করেছে। কিন্তু কোন পথিক যখন মরিচিকাকে জল মনে করে কাছে গিয়ে দেখে তা জল নয় এবং তার দ্বারা তার তৃষ্ণা নিবারণ করা সম্ভব নয়, তখন তার জ্ঞান যে অযথার্থ সেবিষয়ে তার আর সন্দেহ থাকে না। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের মতে বিষয়ের স্বরূপের সঙ্গে জ্ঞানের সংগতি এবং অসংগতির ওপর জ্ঞানের সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব নির্ভর করে এবং কার্যের সফলতা বা বিফলতার দ্বারা জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যায়।

নৈয়ায়িক মতবাদের সঙ্গে বস্তুবাদী প্রয়োগ-বাদের সাদৃশ্য

নৈয়ায়িকদের মতবাদের সঙ্গে আধুনিক যুগের বস্তুবাদী প্রয়োগবাদের (Realistic pragmatism) সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তুবাদীদের মতে জ্ঞানের সংগে জ্ঞান-বহির্ভূত বস্তুর যখন সংগতি বা মিল থাকে, তখন জ্ঞান যথার্থ এবং যখন অসংগতি থাকে তখন জ্ঞান অযথার্থ হয়। প্রয়োগবাদীদের মতে ক্রিয়ার সফলতা (Fruitful activity) এবং ক্রিয়ার অসফলতাই যথাক্রমে সত্যতা ও মিথ্যাত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি।

জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য ও পরতঃ প্রামাণ্য

নৈয়ায়িকরা জ্ঞানের পরতঃ প্রামাণ্য (Extrinsic validity) স্বীকার করে, জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য (Intrinsic validity) স্বীকার করে না। জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য অর্থে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, অন্য কোন শর্তের ওপর নির্ভর নয়। নৈয়ায়িকদের মতে জ্ঞানের কাজ কেবলমাত্র বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ করা। জ্ঞান নিজে নিজেই যথার্থ বা অযথার্থ হতে পারে না। জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য জ্ঞান থেকেই উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ নয়, পরতঃ অর্থাৎ অন্য শর্তের ওপর নির্ভর। প্রবৃত্তি সামর্থ্যই জ্ঞানের মাপকাঠি, অর্থাৎ জ্ঞান যদি সফল প্রবৃত্তির কারক হয় তাহলেই জ্ঞান যথার্থ হবে, নতুবা

ভা.—৮

নয়। যে শর্তের ওপর জ্ঞানের উদ্ভব নির্ভর করে সেই শর্তস্থিত কোন উৎকর্ষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে যথার্থ করে এবং অপরদিকে শর্তের মধ্যে প্রকৃত দোষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে অযথার্থ করে।[1]

৫। প্রত্যক্ষ (Perception):

নৈয়ায়িকদের মতে প্রত্যক্ষ হল অন্যতম প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালী। নৈয়ায়িকদের মতে প্রমাণ চার প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। এই চার প্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষের স্থান সর্বপ্রথম।

প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা: গৌতমের সংজ্ঞানুযায়ী প্রত্যক্ষ হল বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত বিষয়ের নিশ্চিত এবং যথার্থ জ্ঞান।[2] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়েরও বিষয়ের সংযোগ থেকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব। আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের; এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যখন সংযোগ ঘটে তখনই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মনই আত্মা এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করে অর্থাৎ আত্মার সংগে সংযুক্ত মন যদি ইন্দ্রিয়ের সংগে যুক্ত হয় তবেই জ্ঞান উৎপন্ন হবে। গভীর পাঠে যখন মগ্ন তখন বাতাসের শব্দ আমরা শুনতে পাই না, যদিও বাতাস শ্রবণেন্দ্রিয়র ওপর কার্য করছে। এর কারণ মনোযোগের অভাব। বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ না ঘটলে জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। যেমন, ঘট সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ আমার দর্শন-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঘটের সন্নিকর্ষ বা সংযোগ এবং আমার সুনিশ্চিত ধারণা যে, যে-বস্তুটিকে আমি প্রত্যক্ষ করছি সেটি একটি ঘট।

প্রত্যক্ষ হল ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজনিত বিষয়ের নিশ্চিত এবং যথার্থ জ্ঞান

বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগই যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান—প্রত্যক্ষণের এই সংজ্ঞা ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকরা মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু কোন কোন নৈয়ায়িক এবং বৈদান্তিকরা প্রত্যক্ষের

1. "Validity (প্রামাণ্য) depends upon some positive excellence in the generating conditions of knowledge. Invalidity (অপ্রামাণ্য) depends upon some positive defect (দোষ) in the generating conditions of knowledge."
—Introduction to Indian Philosophy : Dr. J. N. Sinha, Page 32.

2. "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।"
—ন্যায় সূত্র ১।১।৪

পূর্বোক্ত সংজ্ঞাকে স্বীকার করে নেয়নি। তাদের মতে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ছাড়াও প্রত্যক্ষণ সম্ভব। যেমন, ঈশ্বর সকল কিছুই প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু ঈশ্বরের কোন ইন্দ্রিয় নেই। যোগীদের প্রত্যক্ষণও সকল ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সাধিত হয় না। সে কারণে বিশ্বনাথ[1] প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান যা অন্য জ্ঞানের মাধ্যমে লব্ধ হয় না। সে জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যা অন্য জ্ঞানের ওপরে নির্ভর করে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্য জ্ঞান করণ (Instrument) নয়। মানুষের প্রত্যক্ষণ বা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষণ উভয় প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রেই এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। অনুমান, উপমান ও শব্দ অন্য জ্ঞানের ওপর নিভর, যেহেতু এই তিন প্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্য জ্ঞান করণরূপে ক্রিয়া করে। অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি জ্ঞান, উপমানের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য এবং শব্দ বা শ্রুতির ক্ষেত্রে শব্দই হল করণ।

কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান

সুতরাং এই সংজ্ঞানুযায়ী প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ প্রতীতি। এই মতবাদ নব্য নৈয়ায়িকদের মতবাদ। গঙ্গেশও প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 'প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারিত্বম লক্ষণম্'। প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান। যখন শুক্তি দেখে রজত বলে ভ্রম হয় তখন প্রকৃতপক্ষে রজতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন সংযোগ ঘটে না। কোন রকম ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ছাড়াই আমরা সুখ-দুঃখরূপ অনুভূতিগুলিকে প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ নয়, সাক্ষাৎ জ্ঞানই প্রত্যক্ষণের বৈশিষ্ট্য। সেকারণে প্রত্যক্ষণ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান।

৬। প্রত্যক্ষণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Perception) : প্রত্যক্ষকে নানাভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ; যথা, (১) **লৌকিক** ও (২) **অলৌকিক**। লৌকিক প্রত্যক্ষও আবার দু'প্রকার ; যথা, (১) **বাহ্য** এবং (২) **মানস**। অলৌকিক প্রত্যক্ষ আবার তিন প্রকার ; যথা, (১) **সামান্য প্রত্যক্ষ**, (২) **জ্ঞান লক্ষণ** এবং (৩) **যোগজ**।

লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ

1. "জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্"—**সিদ্ধান্তমুক্তাবলী : বিশ্বনাথ**

আবার, লৌকিক প্রত্যক্ষকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা, (১) **নির্বিকল্প**, (২) **সবিকল্প** এবং (৩) **প্রত্যভিজ্ঞা**।

এইবার এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক্।

লৌকিক প্রত্যক্ষ (Ordinary Perception) : প্রত্যক্ষ দু'প্রকার—লৌকিক ও অলৌকিক। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ তাকেই লৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। অলৌকিক প্রত্যক্ষে বিষয়বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সাক্ষাৎ বা সংযোগ ঘটে না, অলৌকিক সংযোগ ঘটে।

লৌকিক প্রত্যক্ষ দু'প্রকার—বাহ্য (external) এবং মানস (internal)। চক্ষু, জিহ্বা, কর্ণ, নাসিকা ও ত্বক—এই পাঁচটি বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন বিষয়ের সংযোগ ঘটে, তখনই তাকে বাহ্য-প্রত্যক্ষ বলা হয়। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আমরা বাইরের জগতের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ প্রত্যক্ষ করি। মনের সঙ্গে যখন চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার সংযোগ ঘটে তখন তাকে মানস-প্রত্যক্ষ বলা হয়। মন হল অন্তরীন্দ্রিয়। এই অন্তরীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আত্মা মানসিক অবস্থার সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করে। ব্যহ্য-প্রত্যক্ষ এবং মানস-প্রত্যক্ষ উভয়ই লৌকিক প্রত্যক্ষ, যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। সুতরাং লৌকিক প্রত্যক্ষ ছ'রকম : চাক্ষুষ (visual), শ্রোত (auditory), স্পর্শন (tactual), রাসন (gustatory), ঘ্রানজ (olfactory) এবং মানস (internal)।

লৌকিক প্রত্যক্ষ দু' প্রকার—বাহ্য ও মানস

লৌকিক প্রত্যক্ষ ছ' প্রকার

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে মন ছাড়া কোন প্রত্যক্ষই সম্ভব নয়। কেবলমাত্র মানস-প্রত্যক্ষই যে মনের মাধ্যমে সাধিত হয়, তা নয়, বাহ্য-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ না ঘটলে বাহ্য-প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না।

মন ছাড়া কোন প্রত্যক্ষই সম্ভব নয়

নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, মীমাংসক এবং জৈন সকলের মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় হল ছটি। পাঁচটি বাহ্য-ইন্দ্রিয় এবং একটি অন্তরীন্দ্রিয়। পাঁচটি বাহ্য-ইন্দ্রিয় হল : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক। চক্ষুর দ্বারা আমরা দেখি, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ

করি, নাসিকার দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ করি, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করি এবং ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করি। এই পঞ্চ বাহ্য-ইন্দ্রিয় এক একটি ভূতের দ্বারা গঠিত। চক্ষু তেজস্-এর দ্বারা গঠিত; তেজস্ এর ধর্ম হল বর্ণ, সে কারণে চক্ষু বর্ণ প্রত্যক্ষ করে। শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যোমের (ether) দ্বারা গঠিত, সে কারণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দ প্রত্যক্ষ করা হয়, শব্দ আকাশের ধর্ম। ঘ্রাণেন্দ্রিয় হল ক্ষিতির দ্বারা গঠিত, এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আঘ্রাণ করা হয়, আঘ্রাণ করা ক্ষিতির ধর্ম। রসনেন্দ্রিয় অপের দ্বারা গঠিত, সে কারণে এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আস্বাদন করা হয়। অপের বা জলের ধর্মই হল আস্বাদন। স্পর্শেন্দ্রিয় মরুৎ-এর দ্বারা গঠিত, সে কারণে স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্পর্শন প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। স্পর্শন হল মরুৎ-এর ধর্ম। সুতরাং বাহ্য-ইন্দ্রিয়গুলি ভৌতিক এবং সেই সব ভূত বা উপাদানের দ্বারাই গঠিত যেগুলির বিশেষ গুণ বা ধর্ম (specific quality) এই ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষ করে।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি ভূতের দ্বারা গঠিত

মন হল অন্তরীন্দ্রিয়। মন বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের মত ভূতের দ্বারা গঠিত নয়। মন আত্মার ধর্মগুলি (qualities of the soul) যেমন—ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান প্রত্যক্ষ করে। বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এক একটি ইন্দ্রিয় একটি গুণই প্রত্যক্ষ করতে পারে যেমন দর্শনেন্দ্রিয় দর্শনই করতে পারে, আস্বাদন করতে পারে না। মনের ক্ষেত্রে এরকম কোন সীমা নেই। মন বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের তদারক করে, সব রকম জ্ঞানের ক্ষেত্রে যথাবিহিত ভাবে সুবিন্যস্ত করার কাজ হল মনের।

মন অন্তরীন্দ্রিয়, কোন ভূতের দ্বারা গঠিত নয়

প্রত্যক্ষের বেলায় বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ তা ছ' প্রকার ; যথা—(১) সংযোগ—যখন ঘট প্রত্যক্ষ করি, তখন যে সম্বন্ধ তা হল সংযোগ সম্বন্ধ। (২) সংযুক্ত-সমবায়—ঘটের রূপ যখন প্রত্যক্ষ করা হয় তখন তা হল সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ। (৩) সংযুক্ত-সমবেত সমবায়—ঘটের সঙ্গে তার কোন বিশেষ বর্ণের যে সম্পর্ক তা হল সমবায় সম্পর্ক এবং এই বিশেষ বর্ণের যে জাতিধর্ম যা বর্ণে থাকে তার সঙ্গে বর্ণেরও সমবায় সম্বন্ধ। সুতরাং ঘটের বর্ণ যেমন শুক্ল প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে যখন আমরা শুক্লত্বকে প্রত্যক্ষ করি তখন তা হল সংযুক্ত সমবেত সমবায় সম্পর্ক। (৪) সমবায়-সম্বন্ধ—শ্রবণেন্দ্রিয় হল আকাশ, আবার আকাশেই শব্দ থাকে, সুতরাং শব্দের প্রত্যক্ষ হল সমবায়-সম্বন্ধ। (৫) সমবেত-সমবায়—শব্দত্ব ধর্ম শব্দে থাকে। শব্দত্ব প্রত্যক্ষের

বেলায় যে সম্বন্ধ তা হল 'সমবেত-সমবায় সম্বন্ধ'। (৬) সংযুক্ত বিশেষণ—'অভাব' (negation) প্রত্যক্ষ করার সময় এই সম্বন্ধ দেখা দেয়। আমি দেখি মাটির ওপর কোন ঘট নেই। মাটির সঙ্গে আমার ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটছে এবং মাটির ওপর ঘটের অভাব মাটির একটি গুণ বিশেষ। শূন্য মাটি প্রত্যক্ষ করার সময় আমি এই গুণটিও প্রত্যক্ষ করি।

অলৌকিক প্রত্যক্ষ

লৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ বা সংযোগ ঘটে। অলৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক সন্নিকর্ষ ঘটে। এই অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার—সামান্য লক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজলক্ষণ।

সামান্য লক্ষণ

(ক) **সামান্য লক্ষণ (Perception of a class)**ঃ সামান্য ধর্ম কাকে বলে? যে গুণ বা ধর্ম কোন একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের মধ্যেই বর্তমান থাকে এবং যে ধর্ম বা গুণের উপস্থিতির জন্য জাতিকে অন্য জাতি থেকে পৃথক করা সম্ভব হয় তাকেই সামান্য ধর্ম বলে। যেমন 'মানুষ' একটা জাতি, এই জাতির সামান্য ধর্ম হল মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্ব মানুষ জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে বর্তমান। অনুরূপভাবে সিংহের সামান্য ধর্ম হল সিংহত্ব। বৃক্ষের সামান্য লক্ষণ হল বৃক্ষত্ব, গোরুর গোত্ব ইত্যাদি। ব্যক্তিগতভাবে এ জগতের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের নানা বিষয়ে প্রভেদ থাকলেও, তাদের সকলের মধ্যে, একই সামান্য ধর্ম, মনুষ্যত্ব বর্তমান। সে কারণেই মানুষকে দেখামাত্রই আমরা তাকে মানুষ বলে চিনতে পারি। নৈয়ায়িকদের মতে কোন একটি মানুষকে প্রত্যক্ষ করার অর্থ সকল মানুষকে অর্থাৎ মনুষ্য জাতিকে প্রত্যক্ষ করা, নতুবা তাকে মানুষ বলে চিনতে পারতাম না। মনুষ্যত্বের মাধ্যমে সকল মানুষকে প্রত্যক্ষ করাই হল সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ, কারণ মনুষ্যত্ব হল সামান্য ধর্ম।

সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ অলৌকিক প্রত্যক্ষ যেহেতু 'মনুষ্যত্ব'—এই সামান্য ধর্মকে লৌকিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা হয় না। দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সকল লোকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটছে না। মনুষ্যত্ব ধর্মের মাধ্যমে অলৌকিক ভাবে সকল মানুষকে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। কোন একটি বিশেষ মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু মনুষ্যত্ব তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

(খ) **জ্ঞানলক্ষণ (Acquired Perception)**ঃ আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে 'বরফ দেখতে ঠাণ্ডা' বা 'আমটা দেখতে কি মিষ্টি'। সাধারণতঃ বরফের ঠাণ্ডা ভাব এবং আমের মিষ্টত্ব যথাক্রমে স্পর্শন ও আস্বাদনের সাহায্যেই জানা সম্ভব। অথচ এখানে আমরা বলছি যে এইগুলি আমরা চোখের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করছি। এ জাতীয় প্রত্যক্ষণকে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষণ বলা হয়। এই প্রত্যক্ষণ অলৌকিক, যেহেতু এখানে যে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ কোরে বস্তুর যে গুণ প্রত্যক্ষণ করছি, সেই ইন্দ্রিয় ঐ গুণ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। বস্তুতঃ, জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষণ পূর্ব প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভর। পূর্বে আমরা যখন স্পর্শনের সাহায্যে জেনেছি যে বরফ ঠাণ্ডা, তখন তার সঙ্গে দর্শনগত প্রত্যক্ষণও যুক্ত ছিল। এইভাবে দর্শনগত প্রত্যক্ষণ ও স্পর্শনগত প্রত্যক্ষণ পূর্বে একত্রে ঘটেছে। এখন দর্শনগত প্রত্যক্ষণ স্পর্শনগত প্রত্যক্ষণের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলছে।

জ্ঞানলক্ষণ

মনোবিজ্ঞানী *Stout* একে বলেছেন 'বিজড়ন' (Complication)। *Sully* একে বলেছেন অর্জিত প্রত্যক্ষণ (Acquired Perception)।

(গ) **যোগজ প্রত্যক্ষণ (Yogaja Perception)**ঃ যে সব যোগী যোগভ্যাসের দ্বারা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন তাঁদের পক্ষেই এই যোগজ প্রত্যক্ষণ সম্ভব। অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য যোগীরা অতীত এবং ভবিষ্যত, দূরবর্তী এবং অতি সূক্ষ্ম বস্তুও প্রত্যক্ষ করেতে পারেন, যেগুলি সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। যোগীরা স্বজ্ঞার (intuition) সাহায্যে তা প্রত্যক্ষ করেন। ইন্দ্রিয় ও অনুমানের সাহায্য ছাড়া কোন বিষয়ের সাক্ষাৎ জ্ঞান হল স্বজ্ঞা।

যোগজ প্রত্যক্ষণ দু' প্রকার—যুক্ত এবং যুঞ্জান (Yungana)। যে যোগী যোগসাধনায় পূর্ণতা লাভ করেছে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করেছে তিনিই হলেন যুক্ত এবং তিনি সকল সময়েই সকল বিষয়ের অলৌকিক প্রত্যক্ষ করে থাকেন। তাঁর ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষণ অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ক্রিয়া করে এবং তাঁরাই হলেন যুঞ্জান বা বিযুক্ত যোগী যাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য লাভের জন্য সচেষ্ট এবং

যোগজ প্রত্যক্ষণ

যাঁরা যোগসাধনার পূর্ণতা লাভের পথে। এঁরা গভীর মনোযোগের সহায়তায় অলৌকিক প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এঁদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কার্যকরী হয় না।

৭। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ, সবিকল্প প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যভিজ্ঞা (Indeterminate Perception, Determinate Perception and Recognition):

আর এক বিভাগ অনুসারে লৌকিক প্রত্যক্ষকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়— নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ (Indeterminate Perception) এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ (Determinate Perception)। বস্তুতঃ, নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষের দুটি ভিন্ন স্তর।

লৌকিক প্রত্যক্ষ নির্বিকল্প ও সবিকল্প

লৌকিক প্রত্যক্ষে আমরা বস্তুটিকে প্রথমে নিছক বস্তু বলেই জানি অর্থাৎ কেবলমাত্র তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করি। বস্তুটির জাতি, ধর্ম বা নামের কোন পরিচয় লা ভ করি না। প্রত্যক্ষের প্রথম স্তরে কোন বস্তু— ধরা যাক্ একটি গোলাপ ফুলের সঙ্গে যখন আমার ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে, তখন কেবলমাত্র আমি এটিকে একটি বস্তু বলেই জানছি। এটি যে একটি গোলাপ ফুল, তার যে লাল রঙ রয়েছে, সুগন্ধ রয়েছে, এসব বিষয়ের জ্ঞানলাভ করি না। সে জ্ঞান আসে পরের স্তরে, তখন নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ সবিকল্প প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। সুতরাং নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে বস্তুর সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট জ্ঞান হয় না। এ জাতীয় প্রত্যক্ষে কোন বচনের সাহায্যে জ্ঞানকে ব্যক্ত করা হয় না বা যায় না। নির্বিকল্প হল সহজ উপলব্ধি (Simple apprehension) মাত্র।

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ

গৌতম একপ্রকার প্রত্যক্ষের কথা বলেছেন যে প্রত্যক্ষ কোন নামের সঙ্গে যুক্ত নয়। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা একেই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ বলেছেন। নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশের মতে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ হল সম্পর্ক-বিযুক্ত প্রত্যক্ষ—যে প্রত্যক্ষ নাম, জাতি বা ঐ জাতীয় কোন কিছুর অনুষঙ্গ বা সংযোগ থেকে মুক্ত।

সবিকল্প প্রত্যক্ষে আমরা বস্তুর ধর্ম বা জতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করি এবং বস্তুটির প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করি। সবিকল্প প্রত্যক্ষে আমরা জানি যে কোন বস্তু যেমন, গোলাপ ফুল, তার লাল রঙ আছে, সুগন্ধ আছে। অর্থাৎ বস্তুটির প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা অনেক সংবাদ লাভ করি। আমরা বস্তুটির জাতিধর্ম, বিশেষ গুণ, নাম ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হই। 'বিকল্প' কথাটির অর্থ বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব, সবিকল্প প্রত্যক্ষে এই বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব থাকে, যা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষে থাকে না।

সবিকল্প প্রত্যক্ষ

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ ছাড়া সবিকল্প প্রত্যক্ষ হয় না। কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথমে বোধ না হলে সে বস্তুটি যে গোলাপ ফুল এবং তার যে বিভিন্ন গুণ আছে, তা জানা সম্ভব নয়।

বস্তুর সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে এবং পূর্ব-প্রত্যক্ষের দ্বারা উৎপন্ন যে সংস্কার অবচেতন মনে বিরাজ করে, সেগুলি যুক্ত হলেই সবিকল্প প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং সবিকল্প প্রত্যক্ষকে বলা যেতে পারে উপস্থাপনমূলক-পুনরুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়া (Presentative-Representative process)। বস্তুটি ইন্দ্রিয়ের কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে, যার ফলে ইন্দ্রিয়-সংযোগ ঘটছে, আবার এই সংযোগের ফলে অতীতলব্ধ অন্যান্য অভিজ্ঞতা যেগুলি বস্তুর সঙ্গে যুক্ত সেগুলি পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে।

নির্বিকল্প এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ ছাড়াও ন্যায়শাস্ত্রে আরও একপ্রকার প্রত্যক্ষের কথা বলা হয়েছে, যাকে বলা হয় 'প্রত্যভিজ্ঞা'। প্রত্যভিজ্ঞা হল বস্তুকে কেবলমাত্র জানা নয়, বস্তুকে পূর্বপরিচিত বস্তু বলে চিনতে পারা। যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে আমাদের পরিচিত বন্ধু বলে চিনতে পারি, তখন সে অভিজ্ঞতাকে বলা হবে প্রত্যভিজ্ঞা। পূর্বে জেনেছি এই জ্ঞানই হল প্রত্যভিজ্ঞা, এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান —স্মৃতি নয়। কারণ অবচেতন মনের সংস্কারের দ্বারাই স্মৃতি উৎপন্ন হয়। স্মৃতির ক্ষেত্রে বস্তু সাক্ষাৎ ভাবে ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত থাকে না।

প্রত্যভিজ্ঞা

নৈয়ায়িকদের লৌকিক প্রত্যক্ষের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ বৈশেষিক, সাংখ্য এবং মীমাংসকগণ স্বীকার করলেও বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শন স্বীকার করে না।

অলৌকিক প্রত্যক্ষ সবসময়ই সবিকল্প, যেহেতু এ প্রত্যক্ষ, সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিব্যক্ত।

৮। অনুমানের সংজ্ঞা (Definition of Inference):

যখন কোন জ্ঞাত বিষয়ের ভিত্তিতে এবং তার দ্বারা সমর্থিত হয়ে আমরা কোন অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি তখন তাকে অনুমিতি বলা হয়। অনুমিতি হল পরোক্ষ জ্ঞান। কোন একটি বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে অপর একটি অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রক্রিয়াকেই অনুমান বলে। অনু শব্দের অর্থ পশ্চাৎ আর 'মান' শব্দের অর্থ জ্ঞান। সুতরাং অনুমান কথাটির সাধারণ অর্থ হল সেই জ্ঞান যা অন্য জ্ঞানকে অনুসরণ করে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক—পর্বতটি বহ্নিমান, যেহেতু পর্বতটি ধূমবান এবং যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি, অথবা আর একটি উদাহরণ, রাম মরণশীল, কারণ রাম একজন মানুষ এবং সকল মানুষ মরণশীল। প্রথম উদাহরণে আমরা পাহাড়ে ধূমের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করছি এবং এই অনুমানের ভিত্তি হল ধূম এবং বহ্নির নিয়ত সম্বন্ধ সম্পর্কে আমাদের পূর্বার্জিত জ্ঞান। দ্বিতীয় উদাহরণে আমরা রামের মরণশীলতা প্রত্যক্ষ করছি না, কিন্তু যেহেতু মরণশীলতার সঙ্গে মনুষ্যত্বের নিয়ত সম্বন্ধ আছে, সেহেতু রামের মনুষ্যত্ব প্রত্যক্ষ করে আমরা জানছি যে রাম মরণশীল। সুতরাং অনুমান হল এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় আমরা কোন একটি চিহ্ন (অথবা হেতু বা লিঙ্গ)—যেমন ধূম প্রত্যক্ষ করে, তারই মাধ্যমে আর একটি বস্তু বহ্নি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি, যেহেতু সেই বস্তুটিতে হেতু অবস্থিত এবং হেতু ও সেই বস্তুটির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ (invariable relation) বর্তমান। দ্বিতীয় উদাহরণে মানুষ হল চিহ্ন অর্থাৎ হেতু বা লিঙ্গ এবং বস্তু মরণশীলতা এবং ব্যাপ্তি হল মানুষ ও মরণশীলতার মধ্যে অব্যাভিচারী সম্বন্ধ।

জ্ঞাত বিষয়ের ভিত্তিতে অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করাই হল অনুমিতি

কোন চিহ্ন প্রত্যক্ষ করে তারই মাধ্যমে অপর একটি বস্তু যাতে ঐ চিহ্নটি বর্তমান তার জ্ঞান লাভ করার প্রক্রিয়াই অনুমান

৯। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে প্রভেদ (Distinction between Perception and Inference) ঃ

প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ই প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালী। প্রত্যক্ষ পূর্ববর্তী কোন জ্ঞানের ওপর নির্ভর নয়, কিন্তু অনুমানকে পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করতে হয়। লিঙ্গ বা হেতুর জ্ঞানের জন্য এবং হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞানের জন্য অনুমানকে প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করতে হয়। বাৎসায়নের মতে প্রত্যক্ষণের অভাবে কোন অনুমান সম্ভব হয় না। ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান তখনই আমরা লাভ করি যখন দুটি বস্তুর মধ্যে সংযোগ আমরা অনেকবার প্রত্যক্ষ করি, যার ফলে একটিকে প্রত্যক্ষ করলে আমরা অপরটিকে অনুমান করে নিতে পারি। সুতরাং প্রত্যক্ষ হল অপরোক্ষ জ্ঞান, অনুমান হল পরোক্ষ জ্ঞান।

যৌগিক প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্যান্য প্রত্যক্ষণ সব একই রকমের, যেহেতু যে বিষয়টি দেওয়া আছে তার জ্ঞানই হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের ব্যাপ্তি সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকমের অনুমান করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ আমাদের সে সব বস্তুরই জ্ঞান দেয় যেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ের সীমানার মধ্যে উপস্থিত থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষণ বর্তমান বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের ভিত্তিতে আমরা অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। আমাদের জ্ঞান বর্তমান ছাড়া অতীত ও ভবিষ্যতের দিকেও প্রসারিত হয়। প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে, কিন্তু আমরা সেই সব সম্পর্কই অনুমান করি যেগুলিকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। যাকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাকে অনুমানের সাহায্যে জানার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে অনুমান করি তাকে প্রত্যক্ষের সাহায্যে সমর্থন করার প্রয়োজন আছে। যাকে সুনিশ্চিতভাবে জানি বা যা একেবারেই অজানা, সে সব ক্ষেত্রে অনুমান কার্য করে না। যে সব বিষয় সন্দেহজনক সে সব ক্ষেত্রেই অনুমান কাজ করে।

১০। অনুমানের অবয়ব (The Constituents of Inference) ঃ

অনুমানে তিনটি পদ ও তিনটি বচন

প্রত্যেক অনুমানে তিনটি পদ এবং কমপক্ষে তিনটি বচন থাকবেই। যে বচনগুলির দ্বারা অনুমান গঠিত হয় সেই বচনগুলিকে অনুমানের অবয়ব[1] বলা হয়।

এই তিনটি পদকে বলা হয় সাধ্য (major term), পক্ষ (minor term) এবং হেতু (middle term)। হেতুর অপর নাম লিঙ্গ বা সাধন। হেতুর

1. অবয়ব বলতে বস্তুর অংশকে বোঝায়, কিন্তু এখানে অবয়ব শব্দটি পারিভাষিক।

সাহায্যে যাকে লাভ করতে চাই তাই হল সাধ্য, যেখানে সাধ্যের অস্তিত্ব স্থির করা হয়, তার নাম পক্ষ। হেতু সাধ্য এবং পক্ষের মধ্যে যোগসাধন করে। পর্বতের ধূম দেখে আমরা অনুমান করছি সেখানে বহ্নি আছে, যেহেতু যেখানে ধূম, সেখানেই বহ্নি। এখানে পর্বত হল পক্ষ (minor term), কারণ পর্বতেই বহ্নির অস্তিত্ব স্থির করা হচ্ছে, বহ্নি হল সাধ্য, যেহেতু পর্বতে বহ্নির অস্তিত্বই আমরা প্রমাণ করতে চাই, অর্থাৎ বহ্নিই হল অনুমান দ্বারা নির্ণেতব্য বিষয়। ধূম হল হেতু বা মধ্যম পদ, কারণ এই পদের মাধ্যমেই পক্ষের সঙ্গে সাধ্যের সম্পর্ক প্রমাণিত হচ্ছে। হেতু হল মধ্য পদ, যেহেতু হেতুর মধ্যস্থতায় সাধ্য ও পক্ষের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হচ্ছে। অনুমিত বচনে পক্ষ হল উদ্দেশ্য, সাধ্য হল বিধেয়। ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা যে কোন নির্ভুল অনুমিতির পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন। ব্যাপ্তি হল হেতু বা লিঙ্গের সঙ্গে সাধ্যের অব্যাভিচারী সম্পর্ক এবং পক্ষধর্মতা হল পক্ষে হেতুর অবস্থিতি। কেবলমাত্র সাধ্য বা কেবলমাত্র পক্ষের জ্ঞানই যথার্থ অনুমিতিকে সম্ভব করে তুলতে পারে না। হেতু বা লিঙ্গের জ্ঞান, অর্থাৎ হেতুর সঙ্গে সাধ্যের অব্যাভিচারী সম্পর্কে এবং হেতুর পক্ষে (minor term) অবস্থান—এই উভয়ের জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। এই জ্ঞানকে লিঙ্গ পরামর্শ বলা হয়।[1]

সাধ্য, পক্ষ ও হেতু

অনুমানে তিনটি শব্দ এবং তিনটি বচন থাকবেই। প্রথম বচনে সাধ্য ও পক্ষের সম্বন্ধের কথা বলা হয় এবং সাধ্যকে পক্ষের বিধেয় করা হয়। যেমন, পর্বত বহ্নিমান; দ্বিতীয় বচনে পক্ষের সঙ্গে হেতুর সম্বন্ধের কথা বলা হয়, কারণ পর্বত ধূমবান; আর তৃতীয় বচনে হেতুর সঙ্গে সাধ্যের নিয়ত সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির কথা বলা হয়ে থাকে যেখানে ধূম আছে সেখানেই বহ্নি আছে। সুতরাং অনুমানে কমপক্ষে তিনটি বচন থাকবেই। এই তিনটি বচন নিরপেক্ষ (Categorical) হবে এবং এই বচন সদর্থক বা নঞর্থক উভয়ই হতে পারে।

অনুমানে তিনটি শব্দ এবং তিনটি বচন থাকবে

1. হেতুর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে—পক্ষধর্মতা, স্বপক্ষত্ব, বিপক্ষত্ব, অবাধিত বিষয়ত্ব, অসৎ-প্রতিপক্ষত্ব।

ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্র উল্লিখিত অনুমানের সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের (Syllogism) সাদৃশ্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। অ্যারিস্টটলীয় তিন অবয়বযুক্ত ন্যায়েরও তিনটি বচন থাকে—প্রধান বচন বা সাধ্যবাক্য, অপ্রধান বচন বা পক্ষ বাক্য এবং সিদ্ধান্ত। তবে তিন অবয়বযুক্ত ভারতীয় ন্যায়ের ক্রম তিন অবয়বযুক্ত অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের ক্রমের বিপরীত। ভারতীয় ন্যায়ে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের সিদ্ধান্তকে প্রথমে রাখা হয় এবং প্রধান বচন বা সাধ্য বাক্যকে (major premise) সর্বশেষে রাখা হয়।

ভারতীয় ন্যায়ের সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের তুলনা

ভারতীয় নৈয়ায়িকদের মতে অনুমান দু'প্রকার—স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান। যখন কোন ব্যক্তি নিজের জন্য অনুমান করে তখন তাকে বলা হয় স্বার্থানুমান আর যখন অপরের জন্য অনুমান করা হয় অর্থাৎ অপরের কাছে কোন সত্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় তখন তাকে বলা হয় পরার্থানুমান। স্বার্থানুমানের ক্ষেত্রে অনুমানটিকে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে অনুমানকে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করা প্রয়োজন। যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করার অর্থ হল অনুমানের বা ন্যায়ের ন্যায়শাস্ত্রসম্মত রূপটি প্রকাশ করা।

স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান

অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়ের উল্লেখযোগ্য প্রভেদ আছে। অ্যারিস্টটলীয় ন্যায় তিন অবয়ববিশিষ্ট—প্রথমে সাধ্যবাক্য, তারপর পক্ষবাক্য, তারপর সিদ্ধান্ত। ভারতীয় ন্যায় পাঁচটি অবয়ববিশিষ্ট। এই পাঁচটি অবয়ব হল—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন। নীচে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে—

ভারতীয় ন্যায়ের সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের প্রভেদ

(১) পর্বত বহ্নিমান (প্রতিজ্ঞা)

(২) কারণ পর্বত ধূমবান (হেতু)

(৩) যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি—যেমন পাকশালা (উদাহরণ)

(৪) পর্বত ধূমবান (উপনয়)

(৫) সুতরাং পর্বত বহ্নিমান (নিগমন)

প্রথম বচনটি হল প্রতিজ্ঞা বা প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়টিকেই প্রমাণ করতে হবে। দ্বিতীয় বচন হল হেতু। হেতুই প্রতিজ্ঞার কারণটি নির্দেশ করে। তৃতীয় বচনটি হল উদাহরণ। এই তৃতীয় বচনে প্রতিজ্ঞা এবং হেতুর মধ্যে যে ব্যাপ্তি বা নিয়ত অব্যাভিচারী সম্বন্ধ সেটিকে প্রকাশ করা হয় এবং পরিচিত দৃষ্টান্তের দ্বারা এই ব্যক্তি-সম্বন্ধকে সমর্থন করা হয়। দৃষ্টান্ত হল প্রমানসিদ্ধ এবং সর্বজনস্বীকৃত, সেহেতু দৃষ্টান্ত সম্পর্কে কোন মতভেদ থাকে না। চতুর্থ বচনটি হল—উপনয়। উপনয় হল সামান্য বচনটিকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। পঞ্চম বা সর্বশেষ বচনটি হল—নিগমন। পূর্ববর্তী বচনগুলির ভিত্তিতে বা বচনগুলির দ্বারা সমর্থিত হয়ে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় সেটিই হল নিগমন।

ভারতীয় ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব

পাশ্চাত্ত্য ন্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়ের তুলনা এবং ভারতীয় পাঁচ অবয়ববিশিষ্ট ন্যায়ের সুবিধা ঃ ভারতীয় ন্যায়ের সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। উভয় ন্যায়েই তিনটি পদ আছে ; যথা—(১) সাধ্য (Major), (২) পক্ষ (Minor) এবং (৩) হেতু (Middle)। ভারতীয় ন্যায় যদিও পাঁচ অবয়ববিশিষ্ট, তবু এ ন্যায়ে তিন অবয়ববিশিষ্ট অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের মতন তিনটি বচনই রয়েছে। প্রতিজ্ঞা এবং হেতু দু'বার উল্লিখিত হচ্ছে। উভয় ন্যায়ই ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমানের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করে।

পাশ্চাত্ত্য ন্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়ের সাদৃশ্য

উভয় ন্যায়ের মধ্যে কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও আছে। যারা উভয় ন্যায়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ভারতীয় ন্যায়ের বিকাশের মূলে অ্যারিস্টটলীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ করে থাকেন, তাঁরা এদের বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করেন না। প্রথমতঃ, ভারতীয় ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব, অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের তিনটি অবয়ব। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় তিন অবয়ব-বিশিষ্ট ন্যায়ের বচনের ক্রম অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের বচনের ক্রমের বিপরীত। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় ন্যায়ের মূল সূত্র হল ব্যাপ্তি বা সাধ্য ও হেতুর মধ্যে অব্যাভিচারী সম্বন্ধ। অ্যারিস্টটল-এর ন্যায়ের মূল সূত্র হল—"সব এবং কিছুই নয় সম্বন্ধে নিয়ম" (Dictum de Omni et

পাশ্চাত্ত্য ন্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়ের অসাদৃশ্য

Nullo)। চতুর্থতঃ, পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানের হেতুর সংজ্ঞা ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের হেতু বা লিঙ্গের সংজ্ঞার সঙ্গে অভিন্ন নয়। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানীদের মতে যে পদ উভয় আশ্রয় বাক্যে ব্যবহৃত হয়েও সিদ্ধান্তে ব্যবহৃত হয় না, তাকেই হেতু বা মধ্যপদ বলে। আর ভারতীয় নৈয়ায়িকদের মতে লিঙ্গ বা হেতু হল একটি চিহ্ন, যার সাহায্যে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে এমন কোন সংবাদ জানা যায় যা প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানা যায় না। পঞ্চমতঃ, অ্যারিস্টটল ন্যায়ের বিভিন্ন সংস্থান বা আকার (figure) এবং বিভিন্ন মূর্তি (mood) স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভারতীয় নৈয়ায়িকরা ন্যায়ের বিভিন্ন সংস্থান ও মূর্তি স্বীকার করেন না। ষষ্ঠতঃ, অ্যারিস্টটলীয় ন্যায় কেবলমাত্র আকারগত সত্যতাই (formal truth) প্রতিষ্ঠা করে, বস্তুগত যাথার্থ প্রমাণ করে না। কিন্তু ভারতীয় ন্যায় আকারগত ও বস্তুগত উভয় প্রকার সত্যতাই প্রমাণ করে। ভারতীয় ন্যায়ে অবরোহ অনুমান ও আরোহ অনুমান উভয়ের সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হল **পাঁচটি অবয়ববিশিষ্ট ভারতীয় ন্যায়ের সুবিধা কি?** এই ন্যায় আকারগত ও বস্তুগত উভয়বিধ সত্যতাই প্রমাণ করতে পারে। যে বচনটিতে উদাহরণ দেওয়া হয়, সে বচনটি ভারতীয় ন্যায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সূচনা করে। কেননা, এই বচনটিতেই আকারগত ও বস্তুগত সত্যের সমন্বয় দেখা যায়, যেহেতু ব্যাপ্তি বচনটি দৃষ্টান্ত অর্থাৎ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হয়। ভারতীয় ন্যায়ের চতুর্থ বচনটিরও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বচনটিতে অ্যারিস্টটলীয় ন্যায়ের প্রধান বচন (major premise) এবং অপ্রধান বচনের (minor premise) সমন্বয় সাধিত হয়[1] এবং উভয় বচনে যে একই মধ্যপদ বা হেতু ব্যবহার করা হয়, তা স্পষ্টভাবে দেখান হয়। এই বচনটি থেকে জানা যায়

পাঁচটি অবয়ববিশিষ্ট ভারতীয় ন্যায়ের সুবিধা

1. "As such it is a synthesis of the second and third members of the syllogism. It shows that the middle which is universally related to the major term is also present in the minor term and is therefore very useful for the purpose of proof".
—Nyaya Theory of Knowledge : S. C. Chatterjee, Page 301.

যে, একই হেতু যা সাধ্যপদের সঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত, পক্ষপদেও অবস্থিত এবং বিষয়টি প্রমাণের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। ন্যায়ের শেষ বচনটিও প্রথম বচন বা প্রতিজ্ঞার অর্থহীন পুনরাবৃত্তি নয়। যে বচনটি প্রথমে ছিল কেবলমাত্র একটি আনুমানিক ধারণা সেটিই সিদ্ধান্ত ও একটি সুনিশ্চিত প্রমাণিত সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হল।[1] সুতরাং ভারতীয় ন্যায়ের যুক্তিগুলির সত্যতা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় এবং এই প্রকার যুক্তিবাক্যের দ্বারা সমর্থিত হয়ে আমরা এমন একটি অবশ্য স্বীকার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হই, যার বস্তুগত সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না।

১১। ব্যাপ্তি (Vyapti) :

ব্যাপ্তি কাকে বলে (What is the nature of Vyapti)?

'হেতু' ও 'সাধ্য'-র মধ্যে যে নিয়ত সম্বন্ধ তার নাম হল ব্যাপ্তি। যেমন, 'যেখানেই ধূম, সেখানেই বহ্নি'। এই বচনে ধূম এবং বহ্নির মধ্যে যে সামান্য সম্বন্ধ (universal relation) স্থাপন করা হয়েছে তাই ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিই অনুমানের ভিত্তি বা অনুমান পদ্ধতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ। অনুমান দুটি শর্তের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ, হেতুর (ধূম) পক্ষতে (পর্বত) অবস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান; এবং দ্বিতীয়তঃ, হেতু (ধূম) ও সাধ্যের (বহ্নি) মধ্যে ব্যাপ্তি বা অব্যাভিচারী সম্বন্ধ, হেতু ও সাধ্যের মধ্যে এই অব্যাভিচারী সম্বন্ধ বর্তমান থাকলেই আমরা 'পর্বত বহ্নিমান' —এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে পারি।

হেতু ও সাধ্যর নিয়ত সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলে

ব্যাপ্তির স্বরূপ কি?: ব্যাপ্তি কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি, অর্থাৎ যা সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে রয়েছে বা ছড়িয়ে রয়েছে। যা সর্বত্র পরিব্যাপকক্ষম তাকেই ব্যাপ্ত বলি। আরও একটু সহজ করে বলা যেতে পারে যে একটি বিষয় আর একটি বিষয়ে ব্যাপ্ত; এর অর্থ হল যে একটি

1. "It should not be supposed that the conclusion is an unmeaning repetition of the first proposition. What is at first put forward as a hypothesis or rare assertion is asserted in the conclusion as a firmly established truth."

—S. C. Chatterjee: Nyaya Theory of Knowledge, Page 301.

নৈয়ায়িকদের অনুমানের শ্রেণীবিভাগ ভিন্নতর। ভারতীয় অনুমান পদ্ধতি অবরোহ ও আরোহ অনুমানের মিলিত প্রণালী এবং অনুমানের ভিন্ন ধরনের তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। নীচে এই শ্রেণীবিভাগের কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

ভারতীয় অনুমান অবরোহ ও আরোহের মিলিত প্রণালী

(১) **স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান ঃ** অনুমান যে উদ্দেশ্য সাধন করে তারই ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

যখন ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে অনুমান করা হয় তখন তাকে স্বার্থানুমান বলা হয়। যেহেতু এ ক্ষেত্রে পরের উপলব্ধি বা জ্ঞানের জন্য অনুমান করা হচ্ছে না, সেহেতু অনুমানটিকে যথার্থভাবে লেখার বা বলার প্রয়োজন হয় না।

স্বার্থানুমান

যখন অপরের কাছে কোন সিদ্ধান্ত প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অনুমান করা হয়, তখন তাকে পরার্থানুমান বলে। এক্ষেত্রে পরের কাছে প্রমাণ করার জন্য অনুমান করা হচ্ছে বলে অনুমানটিকে যথার্থভাবে লেখার বা বলার প্রয়োজন আছে—অর্থাৎ ভারতীয় ন্যায়ের যে পাঁচটি অবয়বের কথা বলা হয়েছে, সেই পাঁচটি অবয়ব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে হবে, কোনটি উহ্য থাকলে চলবে না। এ বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

পরার্থানুমান

(২) **পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট ঃ** হেতু ও সাধ্যের মধ্যে যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ তারই ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। পূর্ববৎ ও শেষবৎ অনুমানের পার্থক্য কার্যকারণ নীতিকে অবলম্বন করে করা হয়েছে।

কারণ যেখানে প্রত্যক্ষ এবং তার থেকে যখন অপ্রত্যক্ষ কার্যের কথা অনুমান করা হয় তখন তাকে বলা হয় পূর্ববৎ অনুমান। পূর্ব দৃষ্টান্ত বা পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অনুমান করা হয়। যেমন, আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখে আমরা অনুমান করি যে, বৃষ্টি হবে। এখানে মেঘ হল কারণ, বৃষ্টি হল কার্য।

পূর্ববৎ অনুমান

আবার কার্য যেখানে প্রত্যক্ষ এবং তার থেকে যখন অপ্রত্যক্ষ কারণের কথা অনুমান করা হয় তখন তাকে বলা হয় শেষবৎ অনুমান। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যখন দেখি গাছের পাতা ভিজে রয়েছে, তখন অনুমান করি রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছে।

শেষবৎ অনুমান

কার্যকারণ সম্বন্ধের ওপর ভিত্তি না করে, কেবলমাত্র পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে যখন অনুমান করা হয় তখন তাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলা হয়। যেমন—শিং যুক্ত কোন প্রাণী দেখে আমরা অনুমান করি যে, তার দ্বিখণ্ডিত খুর আছে। এই অনুমানে হেতু এবং সাধ্যের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়নি। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও সাদৃশ্যজ্ঞানের ওপর নির্ভর করেই এই অনুমান করা হয়েছে। পূর্বে দেখেছি গরু ও মহিষের শিং আছে, তাদের খুরও দ্বিখণ্ডিত। তার থেকে অনুমান করলাম যে, এক্ষেত্রেও শিং-ওলা প্রাণীর খুর দ্বিখণ্ডিত।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান

(৩) কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী ও অন্বয় ব্যতিরেকী : হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করার বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে উপরোক্ত অনুমানের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, যেখানে হেতু সেখানেই সাধ্য।

কেবলমাত্র অন্বয়ী দৃষ্টান্তের ওপর ভিত্তি করে (অর্থাৎ যেখানে হেতু সেখানেই সাধ্য) যখন অনুমান করা হয় তখন সেই অনুমানকে কেবলান্বয়ী অনুমান বলা হয়। কেবলান্বয়ী অনুমানে কোন নঞর্থক বা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এই অনুমানে হেতু ও সাধ্যের উপস্থিতির অন্বয়ই ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভিত্তি। উদাহরণস্বরূপ—

কেবলান্বয়ী অনুমান

সব ধূমবান বস্তুই বহ্নিমান
পর্বত ধূমবান
∴ পর্বত বহ্নিমান।

এই অনুমানে সাধ্য বাক্যটি একটি সামান্য বচন, যে বচনে 'বহ্নিমান' এই বিধেয়টি সব ধূমবান বস্তু সম্পর্কেই স্বীকার করা হয়েছে। এমন কোন ধূমবান বস্তু দেখা যায় না, যা বহ্নিমান নয়, অর্থাৎ কোন ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

কেবলব্যতিরেকী অনুমান

কেবলমাত্র ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের ওপর ভিত্তি করে (অর্থাৎ যেখানে সাধ্যের অভাব, সেখানেই হেতুর অভাব) যখন অনুমান করা হয় তখন সেই অনুমানকে কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান বলা হয়। এই অনুমানে হেতু ও সাধ্যের অনুপস্থিতি বা অভাবের সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণ,

কোন অ-বহ্নিমান বস্তুই নয় ধূমবান
পর্বত হয় ধূমবান
∴ পর্বত হল বহ্নিমান

অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান

হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেক—এই উভয় প্রকার দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে যখন অনুমান করা হয় তখন তাকে বলা হয় অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান। এই প্রকার অনুমানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে উপস্থিতি ও অভাব—উভয় প্রকার সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। উদাহরণ—

অন্বয়ী	**ব্যতিরেকী**
সব ধূমবান বস্তুই বহ্নিবান	কোনো অ-বহ্নিমান বস্তুই নয় ধূমবান।
পর্বত ধূমবান।	পর্বত হয় ধূমবান।
∴ পর্বত বহ্নিমান।	∴ পর্বত হয় বহ্নিমান।

দোষযুক্ত হেতুকেই হেত্বাভাস বলে

হেত্বাভাস (Fallacies of Inference): অনুমান-সংক্রান্ত নিয়ম বা বিধি লঙ্ঘন করার জন্য যুক্তির ক্ষেত্রে যে সব দোষ বা অনুপপত্তি দেখা দেয়, সেগুলিকেই হেত্বাভাস বলা হয়। সদোষ হেতুকেই হেত্বাভাস বলে। যা প্রকৃতপক্ষে যথার্থ যুক্তি বা হেতু নয় অথচ যুক্তি বা হেতু বলে প্রতীয়মান হয়, তাই হেত্বাভাস। নৈয়ায়িকরা পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস স্বীকার করেন—(১) সব্যাভিচার (২) বিরুদ্ধ (৩) সৎপ্রতিপক্ষ (৪) অসিদ্ধ এবং (৫) বাধিত।

(১) **সব্যাভিচার হেত্বাভাস ঃ** অনুমানের নিয়ম হল যে হেতু সাধ্যের দ্বারা ব্যাপ্য হবে অর্থাৎ যেখানে হেতু উপস্থিত সেখানে সাধ্যও উপস্থিত থাকবে। যেমন, যেখানেই ধূম, সেখানেই বহ্নি। কিন্তু এই নিয়ম যদি লঙ্ঘন করা হয় তাহলে সব্যাভিচার হেত্বাভাস ঘটে। যেমন,

সব্যাভিচার হেত্বাভাস

সকল বস্তুই হয় বহ্নিমান
পর্বত হল একটি-বস্তু
∴ পর্বত হল বহ্নিমান।

এখানে হেতু 'বস্তু' বহ্নিমান পাকঘর ও অ-বহ্নিমান হ্রদ উভয় ক্ষেত্রেই উপস্থিত। সব বস্তুই বহ্নিমান নয়। হ্রদ একটি বস্তু, কিন্তু হ্রদ বহ্নিমান নয়। যথার্থ অনুমানে হেতুর ব্যাপকতা সাধ্যের ব্যাপকতার সমান হতে পারে বা তার থেকে কম হতে পারে, কিন্তু কখনও বেশি হতে পারে না। উপরোক্ত উদাহরণে বস্তুর ব্যাপকতা বহ্নিমান বস্তুর ব্যাপকতা থেকে অধিক, যেহেতু অনেক অ-বহ্নিমান বস্তু (non-fiery object) আছে। এই হেত্বাভাসকে অনৈকান্তিক হেত্বাভাসও বলা হয়, যেহেতু হেতু, সাধ্যের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ের সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত। সব্যাভিচার হেত্বাভাস তিন প্রকার ঃ (১) সাধারণ, (২) অসাধারণ ও (৩) অনুপসংহারী।

সব্যাভিচার হেত্বাভাস তিন প্রকার

যে অনুমানে হেতুর ব্যাপকতা সাধ্যের ব্যাপকতার তুলনায় অধিক, তাকে সাধারণ সব্যাভিচার হেত্বাভাস বলা হয়। উপরোক্ত উদাহরণটি এরূপ একটি হেত্বাভাসের উদাহরণ।

সাধারণ

যে অনুমানে হেতুর ব্যাপকতা এতই কম সংকীর্ণ যে, হেতু কেবলমাত্র পক্ষে উপস্থিত থাকে, কিন্তু সাধ্যে উপস্থিত থাকে না, তাকে অসাধারণ সব্যাভিচার হেত্বাভাস বলা হয়। যেমন,

অসাধারণ

যা কিছুতে শব্দত্ব আছে, তা হল নিত্য
শব্দতেই শব্দত্ব আছে
∴ শব্দ হল নিত্য।

এই অনুমান যথার্থ নয়, যেহেতু 'হেতু' শব্দত্ব কেবলমাত্র শব্দেই বিদ্যমান, অন্য কিছুতে বিদ্যমান নয়। শব্দ নিত্য বস্তু 'আত্মা' বা অনিত্য বস্তু 'ঘট' প্রভৃতিতে বিদ্যমান থাকে না। সুতরাং শব্দত্ব এবং নিত্যতার মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ স্থাপন করা চলে না।

যে অনুমানে হেতু এমন 'সর্বব্যাপক' যে স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কোনরূপ দৃষ্টান্তের অনুপসংহারী দ্বারা হেতুকে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, সেই অনুমানকে অনুপসংহারী সব্যাভিচারী হেত্বাভাস বলা হয়। যেমন,

যা কিছু জ্ঞেয়, তাই অনিত্য
সব বস্তুই হয় জ্ঞেয়
∴ সব বস্তুই হয় অনিত্য।

এখানে যেহেতু পক্ষ হল 'সব বস্তু', কাজেই স্বপক্ষে বা বিপক্ষে এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে না, যা সব বস্তুর অন্তর্গত নয়। সুতরাং হেতুকে কোনরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যাচ্ছে না।

বিরুদ্ধ হেত্বাভাস ঃ যে অনুমানে হেতু বিরুদ্ধ অর্থাৎ হেতু সাধ্যের অস্তিত্বের দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না, তাকেই বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলে। হেতুর কাজ পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করা, কিন্তু এই অনুমানে হেতু পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমান না করে তার অভাবই প্রমাণ করে, যেহেতু বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হেতুর সঙ্গে সাধ্যের অভাবের সঙ্গেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকে। যেমন—শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দ উৎপন্নশীল। এই উদাহরণে হেতু 'উৎপন্নশীল' সব সময়ই অনিত্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, নিত্য বস্তুর সঙ্গে নয়। সুতরাং যা কিছু উৎপন্নশীল, তাই নিত্য, এই উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব নয়।

সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস ঃ এই হেত্বাভাস তখনই দেখা যায় যখন কোন একটি অনুমানের হেতু যে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, তারই বিরোধী আর একটি হেতু অপর একটি অনুমানে সেই সাধ্যেরই সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস অভাব প্রমাণ করে। যেমন প্রথম অনুমানে বলা হল, শব্দ নিত্য, কারণ শব্দের শব্দত্ব আছে (audible)। আবার আর একটি অনুমানে

এই সিদ্ধান্ত অযথার্থ প্রমাণ করা হল এরূপ অনুমান করে যে, শব্দ অনিত্য, যেহেতু শব্দ উৎপত্তিশীল এবং যা কিছু উৎপত্তিশীল তাই অনিত্য।

অসিদ্ধ হেত্বাভাস : যে অনুমানে হেতু সিদ্ধ নয়, অসিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে, সেই অনুমানকে অসিদ্ধ হেত্বাভাস বলা হয়। যেমন আকাশকুসুম সুন্দর, যেহেতু স্বাভাবিক কুসুমের মত তার সৌন্দর্য আছে। কিন্তু আকাশকুসুম বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, সুতরাং এই অনুমানটি অসিদ্ধ।

অসিদ্ধ হেত্বাভাস

অসিদ্ধ হেত্বাভাস তিন প্রকার : (১) আশ্রয়াসিদ্ধ হেতু, (২) স্বরূপাসিদ্ধ হেতু এবং (৩) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেতু।

আশ্রয়াসিদ্ধ হেতু হল সেই হেতু, যে হেতুর পক্ষে (minor) কোন আশ্রয় নেই, কারণ পক্ষই (minor) হল হেতুর আশ্রয়। উপরোক্ত উদাহরণটি আশ্রয়াসিদ্ধ হেতুর উদাহরণ।

স্বরূপাসিদ্ধ হেতু হল সেই হেতু যার পক্ষে (minor) অবস্থান সম্ভব নয়। যথার্থ হেতুর সকল সময়ই পক্ষধর্মতা থাকবে, কিন্তু হেতুর স্বভাব যদি এমনই হয় যে পক্ষের সঙ্গে তার অসংগতি থাকে তাহলে হেতুর পক্ষে (minor) অবস্থিত থাকা সম্ভব নয়। যেমন, শব্দ হল রূপের মত একটি গুণ, যেহেতু শব্দকে চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু শব্দকে চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, সুতরাং এরূপ হেতু স্বরূপতেই অসিদ্ধ।

ব্যাপ্যাত্বসিদ্ধ হেতু হল সেই হেতু, সাধ্যের সঙ্গে যার ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি শর্তনিরপেক্ষ বা অনৌপাধিক নয়, অন্য শর্ত নির্ভর। যেমন, 'পর্বত ধূমবান' যেহেতু পর্বত বহ্নিমান। এই অনুমানে, সামান্য বচনটিতে, যেখানেই বহ্নি সেখানেই ধুম, ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ অন্য উপাধি বা শর্তের ওপর নির্ভর। সেই শর্ত হল যদি বহ্নি আদ্র ইন্ধনের সঙ্গে যুক্ত হয়। আদ্র ইন্ধনের অনুপস্থিতিতেই কেবলমাত্র আমরা ধূমহীন বহ্নি দেখতে পাই।

বাধিত হেত্বাভাস : বাধিত হেতু হল সেই হেতু যা অন্য প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। এই হেতু সাধ্যের অস্তিত্ব

প্রমাণ করতে চায় কিন্তু অন্য প্রমাণের দ্বারা সাধ্যের অভাবের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ : যখন অনুমান করা হয় যে বহ্নি শীতল, যেহেতু বহ্নি হল একটি দ্রব্য, তখন এই অনুমানকে বাধিত হেত্বাভাস বলা হয়। কারণ হেতু 'দ্রব্য', যা সাধ্যে অর্থাৎ বহ্নিতে শীতলতার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায় তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, যেহেতু প্রত্যক্ষের দ্বারা সাধ্যের অভাব অর্থাৎ উষ্ণতা প্রমাণিত হয়।

ব্যাধিত হেত্বাভাস

সৎ প্রতিপক্ষ হেত্বাভাসে একটি অনুমান অপর একটি অনুমানের দ্বারা অযথার্থ প্রমাণিত হয়। কিন্তু বাধিত হেত্বাভাসে একটি অনুমান প্রত্যক্ষের দ্বারা বা অনুমান নিরপেক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অযথার্থ প্রমাণিত হয়।

কার্যকারণ সম্বন্ধ (Causal Relation) : কার্যকারণ নিয়মের অর্থ হল—'সকল কার্যই কোন কারণ থেকে উদ্ভুত।' প্রত্যেকটি ঘটনার একটা সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। কারণ কাকে বলে? কার্য কাকে বলে? যখন কোন বস্তু বা ঘটনা অপর কোন বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে প্রথমটির অস্তিত্বের ওপর দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব নির্ভর করে বা প্রথমটি ঘটলে দ্বিতীয়টি ঘটে, তখন তাদের সম্বন্ধকে কার্যকারণ সম্বন্ধ বলে। প্রথমটি কারণ, দ্বিতীয়টি কার্য। কারণকে সেজন্য এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, **কারণ কার্যের অব্যবহিত, শর্তান্তরহীন, অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা।** কারণ কার্যের 'পূর্ববর্তী' ঘটনা। যখন দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়, তখন পূর্ববর্তী বা অগ্রগামী ঘটনাটি কারণ এবং পরবর্তী বা অনুবর্তী ঘটনাটি কার্য। যদিও কারণ পূর্ববর্তী ঘটনা তবুও কার্যের যে কোন পূর্ববর্তী ঘটনাকেই কারণ বলা যাবে না। কারণ কার্যের 'অপরিবর্তনীয়' পূর্ববর্তী ঘটনা। যে ঘটনা সর্বদাই কার্যের পূর্বে বর্তমান থাকে তাকেই অপরিবর্তনীয় ঘটনা বলে। কারণ ও কার্যের মধ্যে নিয়ত (Universal) সম্বন্ধ থাকবে। আবার কার্যের যে কোন অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ বলা যেতে পারে না। তাহলে দিনকে রাত্রির কারণ এবং রাত্রিকে দিনের কারণ বলা যেত। কারণ কেবল-মাত্র কার্যের অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা নয় কারণ কার্যের 'শর্তান্তরহীন'

কারণ কার্যের অব্যবহিত, শর্তান্তরহীন, অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা

অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা। উপরন্তু কারণ হল 'অব্যবহিত' পূর্ববর্তী ঘটনা। কারণ ও কার্যের মধ্যে যদি দীর্ঘ ব্যবধান ঘটে, তাহলে সে সময়ের মধ্যে অন্য কোন ঘটনা ঘটতে পারে যা কার্যটির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

সুতরাং **কারণ হল কার্যের অপরিবর্তনীয় শর্তান্তরহীন অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা** (Invariable, unconditional immediate antecedent)।

নৈয়ায়িকেরা বহুকারণবাদ স্বীকার করেন না। বহুকারণবাদ অনুসারে একই কার্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণের দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে।

নৈয়ায়িকরা বহুকারণবাদ স্বীকার করেন না

কিন্তু নৈয়ায়িকদের মতে একই কারণের একটিমাত্র কার্য থাকতে পারে এবং একই কার্যের একটিমাত্র কারণ থাকতে পারে। তাঁদের মতে একটি বিশেষ কারণের একটি বিশেষ কার্যই থাকতে পারে, অনুরূপভাবে একটি বিশেষ কার্যের একটি বিশেষ কারণ থাকতে পারে।

বাচস্পতি এবং জয়ন্তের মতে কারণকে কারণ-সামগ্রী (an aggregate of operative conditions) রূপেই বিচার করা দরকার। অর্থাৎ কারণ হল কতকগুলি শর্তের সমষ্টি। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানী *Mill* কারণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, কারণ হল সদর্থক ও নঞর্থক শর্তের সমষ্টি (The sum total of conditions, positive and negative taken together)।[1]

নৈয়ায়িকদের মতে কারণ হল তিন প্রকার: **(১) সমবায়ি কারণ, (২) অসমবায়ি কারণ এবং (৩) নিমিত্ত কারণ।**

সমবায়ি কারণ বা উপাদান কারণ (Material Cause) হল দ্রব্য বা উপাদান যার সাহায্যে কার্য উৎপন্ন হয়। যেমন—ঘট হল কার্য, তার সমবায় কারণ হল নরম মাটি বা কাদা। বস্ত্র হল কার্য, সূত্র হল তার সমবায় কারণ।

1. যে শর্তকে বাদ দিলে কার্যের ব্যাঘাত ঘটে তাকে সদর্থক শর্ত বলে। যে শর্তকে অন্তর্ভুক্ত করলে কার্যের ব্যাঘাত ঘটে তাকে নঞর্থক শর্ত বলে। কোন লোক জলে ডুবে মারা গেল, এক্ষেত্রে লোকটির শারীরিক দুর্বলতা, ডুবন্ত জলে যাওয়া প্রভৃতি সদর্থক শর্ত। লোকটির সাঁতার না জানা, ডুবে যাওয়ার সময় কাছে কোন বন্ধুর উপস্থিতি না থাকা হল নঞর্থক শর্ত। সদর্থক শর্তের উপস্থিতি এবং নঞর্থক শর্তের অনুপস্থিতি যুক্ত হয়েই কার্যটিকে সংঘটিত করেছে।

বস্ত্রের সঙ্গে সূত্রের সম্পর্ক হল সমবায় (inference) সম্পর্ক। সূত্র ছাড়া বস্ত্রের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, যদিও বস্ত্র ছাড়া সূত্রের অস্তিত্ব সম্ভব। অসমবায় কারণ হল সূত্রের সংযোগ যার দ্বারা বস্ত্রখণ্ড নির্মিত হয়। অসমবায়ি কারণ কোন গুণও হতে পারে ; যেমন—সূত্রের গুরুত্ব। সূত্র হল বস্ত্রের সমবায়ি কারণ ; সূত্রের সংযোগ, যা সূত্রকে আশ্রয় করে থাকে, তা হল বস্ত্রের অসমবায়ি কারণ। সমবায়ি কারণ হল কোন দ্রব্য, অসমবায়ি কারণ হল কোন গুণ বা ক্রিয়া। নিমিত্ত কারণ হল কর্তা যার প্রচেষ্টায় উপাদানের সাহায্যে কার্য উৎপন্ন হয়, তাঁতই হল বস্ত্রের নিমিত্ত কারণ।

কারণ তিন প্রকার—সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত কারণ

কার্যকারণ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে—সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্যবাদ। কার্য সম্পর্কে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। কার্য উৎপত্তির পূর্বে কার্য কি কারণে নিহিত থাকে বা কার্যকারণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কোন্ নতুন সৃষ্টি ? সাংখ্যকারদের মতে কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে নিহিত থাকে। এই মতবাদ সৎকার্যবাদ নামে পরিচিত। নৈয়ায়িকদের মতে কার্যোৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্য বিদ্যমান থাকে না, কার্য সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি। এই মতবাদ অসৎকার্যবাদ নামে পরিচিত। নৈয়ায়িকগণের মতে 'প্রাগভাব প্রতিযোগি কার্যম্'। কার্য হল কোন দ্রব্য, গুণ বা ক্রিয়া, যা সৃষ্টি হবার পূর্বে কারণে বিদ্যমান ছিল না। উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অস্তিত্ব থাকে না, কার্যের অভাবই থাকে। কার্য সৃষ্ট হওয়ার অর্থই তার প্রাগভাব (non-existence) বা পূর্ববর্তী অভাব বিনষ্ট হওয়া। কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে নিহিত থাকে না, কার্য সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি বা আরম্ভ। এই কারণে এই মতবাদকে আরম্ভবাদও বলা হয়।

সৎকার্যবাদ না অসৎকার্যবাদ ?

অদ্বৈত বৈদান্তিকদের মতে কার্য হল কারণের বিবর্ত (a mere appearance) এবং সাংখ্যাকার ও বৈদান্তিকদের মতে কারণ ও কার্য অভিন্ন। নৈয়ায়িকদের মতে কারণ ও কার্য উভয়ের সত্তা আছে এবং কারণ ও কার্য বিভিন্ন ; কার্য যদি কারণ থেকে ভিন্ন না হত তাহলে আমরা কারণ থেকে কার্যকে পৃথক করতে

অদ্বৈত বেদান্ত মত

পারতাম না। আমরা বস্ত্রের সূত্র বা তন্তুর মধ্যে কোন বস্ত্র দেখতে পাই না, কারণের সাহায্যে বস্ত্র নতুন ভাবে সৃষ্ট হয়।

মীমাংসকদের মতে কারণের মধ্যে এমন এক অদৃষ্ট শক্তি নিহিত থাকে, যা কার্য উৎপন্ন করে। নৈয়ায়িকরা কারণের মধ্যে কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

মীমাংসকদের মত

নৈয়ায়িকরা সাধরণ কারণ ও বিশিষ্ট কারণ—এই দু'প্রকার কারণ স্বীকার করে। দেশ, কাল, ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা, ধর্ম এবং অধর্ম (merit and demerit), পূর্বজন্ম প্রভৃতি সাধারণ কারণ, যার অনুপস্থিতিতে কোন কার্যই ঘটতে পারে না। কিন্তু সাধারণতঃ কোন ঘটনার কারণ বলতে আমরা বিশিষ্ট কারণই বুঝে থাকি, এই বিশিষ্ট কারণকে অসাধারণ কারণও বলা যেতে পারে। ঘট নির্মাণের জন্য কুম্ভকারের দণ্ডটি হল করণ (instrument)। এই করণটি হল অসাধারণ কারণ।

নৈয়ায়িকদের মত

১৩। উপমান (Comparison):

নৈয়ায়িকরা উপমানকে যথার্থ জ্ঞানলাভের একটি বিশিষ্ট উপায় বা প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। 'প্রসিদ্ধ সাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনম্ উপমানম্'। পূর্বপরিচিত কোন একটি বস্তুর সঙ্গে নতুন ও অপরিচিত কোন বস্তুর সধর্ম বা সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যখন নতুন বস্তুটি সম্পর্কে আমরা জ্ঞানলাভ করি, তখন জ্ঞানলাভের এই প্রণালীকে উপমান বলা হয়। উপমার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করার প্রণালী হল উপমান এবং এই প্রণালীর দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করা যায় তাকে উপমিতি বলা হয়। 'সংজ্ঞা সংজ্ঞি সম্বন্ধজ্ঞানম্ উপমিতি'। সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞির মধ্যে যে সম্বন্ধ তার জ্ঞানই হল উপমিতি। কোন বস্তুর বিশদ বিবরণই হল সংজ্ঞা এবং সেই সংজ্ঞা দ্বারা যে বস্তু নির্দিষ্ট হয় তাকেই সংজ্ঞী বলা হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক্। কোন ব্যক্তি হয়ত পূর্বে 'গবয়পশু' (নীলগাই) প্রত্যক্ষ করেনি। কোন একজন আরণ্যক তাকে বলল 'গো সাদৃশ গবয়', অর্থাৎ গরুর সঙ্গে গবয়ের

উপমানের সংজ্ঞা

সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞির সম্বন্ধ জ্ঞানই উপমিতি

সাদৃশ্য আছে। ব্যক্তিটি অরণ্যে গিয়ে একটি নতুন প্রাণী প্রত্যক্ষ করল এবং লক্ষ্য করল যে, প্রাণীটির সঙ্গে গরুর সাদৃশ্য আছে। তখন সে নতুন প্রাণীটিকে গবয় বলে চিনতে পারল। আরণ্যকের সংজ্ঞার সাহায্যেই সে এই নতুন প্রাণীটিকে অর্থাৎ সংজ্ঞীকে চিনতে পেরেছে। সে পূর্বে গরু প্রত্যক্ষ করেছে, কোন গবয় প্রত্যক্ষ করেনি, কিন্তু গরুর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে 'গবয়' সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছে। উপমানের সাহায্যেই এই নতুন জ্ঞান সে লাভ করল। সুতরাং উপমানের দুটি বিষয় আছে—(১) পূর্বে প্রত্যক্ষ করা হয়নি এমন একটি নতুন ও অপরিচিত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং (২) পূর্ব পরিচিত একটি বস্তুর সঙ্গে এই নতুন ও অপরিচিত বস্তুটির সাদৃশ্যের জ্ঞান।

উপমান হল নামের সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধের জ্ঞান

সুতরাং উপমান হল, একটি শব্দ এবং সেই শব্দ একই অর্থে যে বস্তু শ্রেণীর ওপর প্রযোজ্য হয় তার সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধের জ্ঞান (The knowledge of the denotative relation between a word and a certain class of objects)। উপমান বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সাদৃশ্য জ্ঞান নয়, একটি নামের সঙ্গে তার বস্তুর সম্বন্ধের জ্ঞান (The knowledge of the relation between a name and its object)। কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা কোন একটি শব্দের বিশেষ বিবরণ লাভ করি এবং তারই ভিত্তিতে সেই বিশেষ বিবরণটি প্রযোজ্য হয় এমন একটি নতুন বস্তু যাকে আমরা পূর্বে প্রত্যক্ষ করিনি, তার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানীদের সাদৃশ্যমূলক অনুমান (Analogy) এবং ভারতীয় নৈয়ায়িকদের উপমান এক নয়। যদিও উভয় ক্ষেত্রে সাদৃশ্য জ্ঞানের ভিত্তিতেই নতুন জ্ঞান লাভ করা যায়, তবুও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানীদের সাদৃশ্যমূলক অনুমানের একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা অনুমান করি যে, যেহেতু পৃথিবীতে জীবের বাস আছে, সেহেতু মঙ্গল গ্রহেও জীবের বাস আছে। পাশ্চাত্ত্য তর্কবিজ্ঞানীদের সাদৃশ্যমূলক অনুমানে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা হয়, কিন্তু নৈয়ায়িকদের উপমান হল সংজ্ঞার সঙ্গে সংজ্ঞীর সম্বন্ধের জ্ঞান।

নৈয়ায়িকরা উপমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করলেও, ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ উপমানকে প্রমাণরূপে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। চার্বাকদের মতে উপমানকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায় না, সেহেতু উপমানের সাহায্যে শব্দের বাচ্যার্থ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা যায় না। চার্বাকদের কাছে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বৌদ্ধগণ উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার না করে তাকে প্রত্যক্ষ ও শব্দেরই অন্তর্গত বলে ধারণা করেন। বৈশেষিক এবং সাংখ্য দার্শনিকরা উপমানকে অনুমানরূপেই ব্যাখ্যা করে। জৈন দার্শনিকদের মতে উপমান হল প্রত্যভিজ্ঞার অন্তর্গত। মীমাংসকরা উপমানকে যথার্থ প্রমাণ বলে স্বীকার করেন তবে তার ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। মীমাংসকদের মতে উপমানের সাহায্যে জ্ঞান আমরা তখনই লাভ করি যখন পূর্বে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে এমন কোন বস্তুর সঙ্গে বর্তমানে প্রত্যক্ষ করা হল এমন একটি বস্তুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা অনুমান করি যে পূর্বদৃষ্ট বস্তুটি বর্তমান বস্তুর মতন। পূর্বদৃষ্ট গরুর সঙ্গে বর্তমান গবয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা জানলাম যে, গরু গবয় সাদৃশ্য।

কোনো কোনো নৈয়ায়িকের মতে সাদৃশ্যজ্ঞান থেকে যেমন উপমিতি হয়, বৈসাদৃশ্যজ্ঞান থেকেও উপমিতি হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে উট দেখতে বিশ্রী, এর শরীর দীর্ঘ, ঘাড় খুব লম্বা, পিঠ উঁচু, তাহলে তার বিবরণের মাধ্যমে অন্য পশুর সঙ্গে উটের পার্থক্যের বিষয় জানা গেল। এই বৈসাদৃশ্য জ্ঞানের সাহায্যে কোন ব্যক্তি পূর্বে প্রত্যক্ষ না করা সত্বেও উটকে চিনে নিতে পারবে। এই ধরনের উপমিতিকে বৈধর্মোপমিতি বলা হয়।

১৪। শব্দ (Testimony):

নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ হল চতুর্থ প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়। 'শব্দ' বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি বাচনিক জ্ঞান। শব্দ হল শব্দের ও ব্যাক্যের দ্বারা সূচিত বস্তুর জ্ঞান, কিন্তু সব বাচনিক জ্ঞানই যথার্থ নয়। নৈয়ায়িকদের মতে শব্দ হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন বা আপ্তবাক্য। শব্দের প্রকৃত অর্থ যিনি অবহিত, যিনি জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং বিশ্বাসযোগ্য, তিনিই শব্দ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তিনিই আপ্ত। তিনি নিজে সত্য জানেন এবং অপরের কাছে সত্যই প্রকাশ করেন 'আপ্ত-বাক্যং' শব্দং বা 'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ'। আপ্তের বচনই শব্দ প্রমাণ। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হলেন সত্যবাদী, তাঁর বাক্য প্রামাণিক, সেহেতু গ্রহণযোগ্য। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান প্রমাণের দ্বারা যে বিষয় সম্পর্কে

আপ্তের বচনই শব্দ প্রমাণ

জ্ঞানলাভ করা যায় না, শব্দ প্রমাণের সাহায্যেই সে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হয়। শব্দ প্রমাণ একটি বিষয়ের ওপর নির্ভর, সে হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচনের অর্থ উপলব্ধি করা।

বাৎসায়নের মতে শব্দ প্রমাণ দু'প্রকার—দৃষ্টার্থ এবং অদৃষ্টার্থ। দৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ জাগতিক বস্তু সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, মুনিঋষি বা শাস্ত্রের যে বচন সেগুলি হল দৃষ্টার্থ শব্দ প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ: ধান্যশস্য বা বৃষ্টিপাত সম্পর্কে কোন বিশ্বাসযোগ্য কৃষকের বচন, আদালতে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য বা শাস্ত্র যা বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেয়, এ সকলগুলিই দৃষ্টার্থ শব্দ প্রমাণ। অণু, পরমাণু খাদ্যপ্রাণ প্রভৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের বচন, মুনিঋষি এবং শাস্ত্রের অতীন্দ্রিয় বস্তু যেমন—আত্মা, পরমাত্মা, পাপ, পুণ্য, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি সম্পর্কে যে বচন সেগুলি হল অদৃষ্টার্থ।

শব্দ প্রমাণ—দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ

নব্য নৈয়ায়িকরা শব্দকে দু'ভাগে ভাগ করেন; যথা—(১) **লৌকিক** এবং (২) **বৈদিক**। বৈদিক বচন হল বেদের বচন। বেদের বচন ঈশ্বরের বচন বা সেই বচন যেগুলি ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষিরা ব্যক্ত করেছেন; সেহেতু এইগুলি প্রামাণিক এবং অভ্রান্ত। লৌকিক বচন হল সাধারণ মানুষের বচন, সেহেতু এ বচন সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। তবে যে কোন লৌকিক বচনই শব্দ প্রমাণ নয়। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচনই শব্দ প্রমাণ।

শব্দ—লৌকিক এবং বৈদিক

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রথমোক্ত শ্রেণীবিভাগ জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীবিভাগ জ্ঞানের উৎস বা জ্ঞানলাভের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যদিও বিভিন্ন নৈয়ায়িক উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের কথা বলেছেন তবু তাঁরা একটি বিষয়ে একমত যে আপ্ত ব্যাক্য সকল সময়ই কোন ব্যক্তির বচন—সে ব্যক্তি-সত্তা মানবীয় হতে পারে, দৈবও হতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

ন্যায়-তত্ত্ববিদ্যা

(Nyaya Metaphysics)

১। জগত সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের মতবাদ (The Nyaya Theory of the Physical world) :

নৈয়ায়িকদের মতে জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে

নৈয়ায়িকরা জগতের সত্তা স্বীকার করেন এবং তাঁদের মতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর ছাড়াও জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। জাগতিক বস্তুরও স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তারা নিছক মনের ধারণা নয়। অর্থাৎ এসব জাগতিক বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্তা আছে, বা এদের অস্তিত্ব জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। নৈয়ায়িকরা সরল বস্তুবাদী দার্শনিক (Naive Realists)। তাঁদের মতে বস্তুর দু'প্রকার গুণ আছে—'মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণ'[1]। বস্তু ক্ষণিক নয়, বস্তুর স্থায়িত্ব আছে, বস্তু কেবলমাত্র গুণের সমষ্টি নয়, এর গুণাতিরিক্ত সত্তা বা দ্রব্যত্ব আছে। নৈয়ায়িকরা বারটি প্রমেয় স্বীকার করেন। যেমন—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বিষয় বা অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ এবং মোক্ষ। এ ছাড়া নৈয়ায়িকরা দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাবের কথাও স্বীকার করে। এ সব প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয় এ জগতে দৃষ্ট হয় না। যেগুলি ভৌতিক বা ভূত দ্বারা গঠিত সেগুলিই দৃষ্ট হয়। আত্মা ও মন যেহেতু ভৌতিক নয়, সেহেতু জাগতিক নয়। অন্যান্য জাগতিক দ্রব্য থেকে পৃথক হলেও দেশ এবং কালের বস্তুগত সত্তা আছে। কাল অখণ্ড এবং অনন্ত, কালেই পরিবর্তন ঘটে। দেশও অখণ্ড ও অনন্ত, বস্তু দেশেই অবস্থান করে। ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ—এই চারটি উপাদানের দ্বারা এই পৃথিবী গঠিত। এই উপাদানগুলির অন্তিম

নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী

ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারটি উপাদানে জগৎ সৃষ্ট

1. (i) Primary Quality. (ii) Secondary Quality.

অংশ হল চার প্রকারের পরমাণু যেগুলি অপরিবর্তনীয়, নিত্য এবং অবিভাজ্য। ঈশ্বর এ সব পরমাণু সৃষ্টি করেননি। তিনি এই পরমাণুর সাহায্যে এ জগত সৃষ্টি করেছেন। এসব পরমাণু ও ঈশ্বর সহ-অবস্থানকারী, জগত সৃষ্টির পূর্বেও এসব পরমাণুর অস্তিত্ব ছিল। জগতের সকল বস্তুই যৌগিক এবং এ সব পরমাণুর দ্বারা গঠিত। যৌগিক বস্তু, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, গুণ সবই এ জগতের অন্তর্ভুক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। ইন্দ্রিয়, জীবদেহ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ সবই এই সব যৌগিক পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বর এ জগতের নিমিত্ত কারণ।

জগত উদ্দেশ্যবিহীন নয়

যদিও এই জগত কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তবুও এ জগত উদ্দেশ্যবিহীন নয়। এ জগত কর্মবাদনীতির অধীন এবং কার্যকারণ নীতি এই কর্মবাদের অধীনস্থ। কর্মবাদ ও জড়জগতের মধ্যে ঈশ্বরই সামঞ্জস্য স্থাপন করেন। নৈয়ায়িকরা দ্বৈতবাদী। নৈয়ায়িকরা জড়জগত এবং আত্মা উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

২। আত্মা (The Individual Self):

আত্মা শব্দটি জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েরই সূচক। এখানে আত্মা বলতে জীবাত্মাকেই বোঝান হচ্ছে। জীবাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে একাধিক মতবাদ থাকলেও, চারটি মতবাদ বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মত

জড়বাদী চার্বাকদের মতে চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা। অভিজ্ঞতাবাদী বৌদ্ধদের মতে আত্মা হল নৈতিক পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থা বা প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ। অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা হল বিশুদ্ধ চৈতন্য। এই বিশুদ্ধ চৈতন্য নিত্য ও স্বপ্রকাশ। আত্মা জ্ঞাতাও নয় জ্ঞেয়ও নয়। রামানুজের মতে আত্মা হল সক্রিয় ও সগুণ সচেতন দ্রব্য। আত্মা হল চৈতন্যময় 'অহং'—আত্মা হল জ্ঞাতা। শেষোক্ত মতবাদ দুটিকে ভাববাদী মতবাদ বলা যেতে পারে।

নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী—নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা হল একটি দ্রব্য। এক একটি বিশেষ আত্মা এক একটি দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে। আত্মা হল শাশ্বত

এবং সর্বব্যাপী। দেশ ও কালের দ্বারা আত্মা সীমিত হয় না। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন (willing) প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলিকে আমরা মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানতে পারি। এগুলি হল ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং এগুলি আত্মার সঙ্গে অভিন্ন নয়। এগুলি হল কতকগুলি গুণ। যেহেতু দ্রব্য ছাড়া কোন গুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, সেহেতু এই গুণগুলিরও আধার বা আশ্রয়রূপে কোন দ্রব্য আছে। এই দ্রব্য হল আত্মা। এই গুণগুলি কোন জড়-দ্রব্যের গুণ হতে পারে না। যেহেতু জড়বস্তুর গুণগুলির মত এই গুণগুলিকে বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেহেতু আত্মা জড়বস্তু নয়।

আত্মা হল দ্রব্য

চার্বাকদের মতে চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা, কিন্তু এ-ধারণা ভ্রমাত্মক। দেহ আত্মা হতে পারে না, কারণ দেহ চৈতন্যহীন এবং বুদ্ধিহীন। দেহ পরিবর্তনশীল। দেহ জন্মমৃত্যুর অধীন। আত্মা চৈতন্যময় এবং নিত্য। আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নেই। মৃতদেহে এবং সমাধি অবস্থায় কোন চৈতন্যের অস্তিত্ব থাকে না। চৈতন্য দেহের কোন গুণ হতে পারে না, যেহেতু মৃতদেহের মধ্যে অন্যান্য গুণের উপস্থিতি থাকলেও চৈতন্যের উপস্থিতি থাকে না। চৈতন্য দেহের ধর্ম হতে পারে না, যেহেতু দেহই চেতনার বস্তু। দেহ হল আত্মার করণ (instrument), যার মাধ্যমে আত্মা নিজ উদ্দেশ্য-সাধন করে। শরীর যদি আত্মা হয়, তাহলে জীবের কর্মফলভোগকে ব্যাখ্যা করা যায় না। শরীরের বিনাশের পর কে কর্মফল ভোগ করবে ? তাছাড়া, দেহ যদি আত্মা হয়, সব জড়বস্তুই তাহলে চৈতন্যযুক্ত হবে, যেহেতু জড়বস্তু এবং দেহ একই উপাদানে গঠিত।

দেহ আত্মা নয়

আত্মা ইন্দ্রিয়ও হতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি ভৌতিক, কিন্তু চেতনা ভৌতিক নয়। ইন্দ্রিয়গুলি চেতনার উপকরণস্বরূপ। এই উপকরণগুলির সহায়তায় আত্মা জ্ঞান লাভ করে। ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমেই আত্মা বহির্জগত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে লব্ধ বিভিন্ন সংস্কারগুলি আত্মার দ্বারা সংশ্লেষিত ও সুবিন্যস্ত হয়। এ কাজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হয় না। কল্পনা, স্মৃতি, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক

আত্মা ইন্দ্রিয় হতে পারে না

প্রক্রিয়াগুলি ইন্দ্রিয়নির্ভর নয়, সেহেতু ইন্দ্রিয় এই সব মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। বস্তু এবং ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়ে গেলেও আমি যে প্রত্যক্ষ করেছি—এ জ্ঞান বিনষ্ট হয় না। সুতরাং এই জ্ঞান বস্তু বা ইন্দ্রিয়ের গুণ হতে পারে না।

মনও আত্মা হতে পারে না। নৈয়ায়িকদের মতে মন কর্তা নয়। মন হল অন্তরীন্দ্রিয় যার সাহায্যে আত্মা বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করে। মন হল সূক্ষ্ম এবং পরমাণবিক। পরমাণু দৃশ্যগোচর নয়। বুদ্ধি, ইচ্ছা, সুখ দুঃখ প্রভৃতি যদি মনের গুণ হত, তাহলে অদৃশ্য বস্তুর গুন হওয়ার জন্য সেগুলি দৃষ্টিগোচর হত না। কিন্তু মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমরা সকলেই সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ হলেই আত্মাতে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। সুতরাং আত্মা হল জ্ঞাতা, মন এই জ্ঞানলাভের উপায়। আত্মা হল বিভু। মন হল পরমাণু। আত্মা যোগসাধনায় একই সময়ে সকল কিছুই সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে। কিন্তু পরমাণবিক মন কখনও একই সময়ে সব কিছুকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। আত্মাই মনকে নিয়ন্ত্রিত করে, মন হল আত্মার করণ (instrument)।

আত্মা মন হতে পারে না

বৌদ্ধদের মতে আত্মা হল 'বিজ্ঞান সন্তান' (stream of momentary cognitions) বা পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার ধারা বা প্রবাহ। কিন্তু আত্মা ক্ষণস্থায়ী মানসিক অবস্থার ধারা বা প্রবাহ নয়। তাহলে স্মৃতি (recollection) এবং প্রত্যভিজ্ঞাকে (recognition) ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করতে হলে অপরিবর্তিত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। আত্মার স্বরূপগত ঐক্য স্বীকার না করলে স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করা চলে না। মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত কোন একটি বিচ্ছিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার পক্ষে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানসিক অবস্থাকে জানা সম্ভব নয়।

আত্মা ক্ষণস্থায়ী মানসিক অবস্থার ধারা বা প্রবাহ নয়

আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য নয়

অদ্বৈত বেদান্তমতে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য ; কিন্তু ন্যায়ের মতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র সম্পর্কবিযুক্ত কোন বিশুদ্ধ চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কোন একটি আধারকে আশ্রয় করেই চৈতন্যের অস্তিত্ব সম্ভব।

আত্মা প্রাণ নয়

আত্মা প্রাণের (Vital force) সঙ্গেও অভিন্ন নয়। আত্মা মনের সঙ্গে যুক্ত হলেই প্রাণের আবির্ভাব ঘটে। আত্মা কোন অর্থেরও (object) ধর্ম নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েকই অর্থ বলা হয়। আত্মা হল চেতনার বা বুদ্ধির আশ্রয়। অর্থ হল বুদ্ধির বিষয়। আত্মা চেতনার সমবায়ি কারণ।

আত্মা হল কর্তা, জ্ঞাতা বা ভোক্তা

সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, আত্মা হল দ্রব্য এবং এই দ্রব্যকে আশ্রয় করেই চেতনা থাকে। চেতনা দেহ, বাহ্য ইন্দ্রিয় বা অর্থের ধর্ম নয়। চেতনা আত্মারই ধর্ম। জ্ঞান, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা সকল কিছুই আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আত্মা হল কর্তা, জ্ঞাতা এবং ভোক্তা ; দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সবগুলি আত্মার করণ (Instrument)। সেগুলি আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং আত্মা, দেহ বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং মন থেকে স্বতন্ত্র।

চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়

নৈয়ায়িকদের মতে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয় বা অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য গুণ নয়, আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন ও নিষ্ক্রিয়। আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্য বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তখন আত্মার চেতনা বা বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। নিষ্ক্রিয় এবং নির্গুণ আত্মা তখনই সগুণ এবং সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আত্মা জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্তারূপে সব কিছু জানে, সকল কর্ম সম্পাদান করে এবং সকল কিছু ভোগ করে। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন দ্রব্য এবং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে।

আত্মা বুদ্ধি (Intellection), উপলব্ধি (apprehension) বা জ্ঞান (Knowledge) নয়। আত্মা স্থায়ী, বুদ্ধি অস্থায়ী। বুদ্ধি বা জ্ঞান আত্মার কর্ম নয়, আত্মার গুণ। আত্মা নিরবয়ব (Partless) এবং নিত্য।

যেহেতু আত্মার কোন বিনাশ নেই, আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। কর্মফল অনুযায়ী জীবাত্মা পুরানো দেহ বিনষ্ট হলে নতুন দেহ ধারণ করে।

আত্মা নিত্য ও বিভু

আত্মা এক নয়, বহু। যদি আত্মা এক হত, তাহলে সকলেরই একই প্রকারের অভিজ্ঞতা হত, এবং এক ব্যক্তির মোক্ষ লাভে অপর ব্যক্তিরও মোক্ষ লাভ হত। সুতরাং প্রতিটি দেহকে আশ্রয় করে এক একটি আত্মা বিরাজ করছে। মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমার নিজের আত্মাকে জানি, কিন্তু অপরের আত্মার অস্তিত্বের জ্ঞানের জন্য অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়। একই আত্মা সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্তি—নৈয়ায়িকরা বৈদান্তিকদের এই মত গ্রহণ করে না। আত্মা বিভু বা সর্বব্যাপী। আত্মার কোন অবান্তরমহত্ত্ব বা সীমিত পরিসর নেই (Limited dimension) কারণ যা সীমিত তাই অংশযুক্ত এবং যা কিছু অংশযুক্ত তাই বিনাশশীল। আত্মা পরমাণু হতে পারে না, কারণ পরমাণু ইন্দ্রিয়াতীত হবে, কিন্তু আমরা আত্মার গুণ, মোক্ষ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করতে পারি। জীবাত্মা কোন মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহ ধারণ করতে পারে না।

৩। **আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ (Proofs for the Existence of Soul)**ঃ প্রশ্ন হল দেহ থেকে স্বতন্ত্র কোন আত্মার অস্তিত্ব কি ভাবে প্রমাণ করা যায়?

কোন কোন প্রাচীন নৈয়ায়িকের মতে আত্মার অস্তিত্ব সাক্ষাৎ ভাবে জানা যায় না। অনুমানের সাহায্যেই আত্মার অস্তিত্বের কথা জানা যায়, শ্রুতির সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তাছাড়া ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির অস্তিত্ব থেকে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে পারে। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রভৃতি ক্রিয়ার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন, কিন্তু যদি কোন স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করা হয় তবে ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? আমরা কোন বস্তু লাভ করার ইচ্ছা করি যেতেতু বস্তুটি সুখদায়ক বা

আত্মার অস্তিত্ব অনুমানের সাহায্যে জানা যায়

আত্মার অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণ

আমাদের কোন অভাববোধ দূর করতে সমর্থ। সুতরাং যখন কোন বস্তু পাবার জন্য আমরা ইচ্ছা করি তখন অতীতে যে সকল বস্তু আমাদের সুখদান করেছে সে সকল বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য আমরা উপলব্ধি করি। কারণ বস্তুটি এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতের নাগালে আসেনি। সুতরাং কোন স্থায়ী আত্মা আছে যে পূর্বে কাম্যবস্তু লাভ ক'রে সুখ উপলব্ধি করেছে এবং বর্তমান বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য উপলব্ধি করেছে। সুখ-দুঃখের অনুভূতিই স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোন বস্তু লাভ করে আমরা স্মরণ করি যে পূর্বের মত এ বস্তুও আমাদের আনন্দ দেবে এবং কোন বিপদ অবস্থার উদ্ভব হলে আমরা মনে করি যে পূর্বের মত আমরা দুঃখ পাব। সুতরাং সুখ-দুঃখের অনুভূতি অতীত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর। অসংখ্য পরিবর্তনের মাঝে যে আমি এক, এবং অতীতে যে আমি জেনেছি বর্তমানে 'সে আমিই' যে জানছি—এ প্রতীতি না থাকলে অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি কি ভাবে সম্ভব? অতীত অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করে যে স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব আছে। ব্যক্তিতে অভেদের (Personal indentity) বিষয়টিকে যদি স্বীকার করা না হয় তবে অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা কোন কিছুকেই ব্যাখ্যা করা যায় না। স্থায়ী আত্মার অস্তিত্বই ব্যক্তিগত অভেদের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে পারে। এইভাবে অনুমানের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়।

নব্য নৈয়ায়িকদের কারও কারও মতে আত্মার অস্তিত্ব মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে সোজাসুজি জানা যায়। এই মানস প্রত্যক্ষ দু' রকম ভাবে হতে পারে। যখন মনের সঙ্গে শুদ্ধ আত্মার (pure self) সংযোগ ঘটে, তখন এই আত্মসচেতনতার মাধ্যমে আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান জন্মে। আবার কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে শুদ্ধ আত্মা প্রত্যক্ষের বস্তু নয়। বুদ্ধি, অনুভূতি, প্রযত্ন প্রভৃতি গুণের মাধ্যমেই আত্মাকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন, আমরা বলি—আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমিই জ্ঞাতা ইত্যাদি।

নব্য নৈয়ায়িকদের মতে আত্মার অস্তিত্ব মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানা যায়

এ ছাড়া চৈতন্যের অস্তিত্বও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। যেহেতু চৈতন্য শরীরের, ইন্দ্রিয়ের বা মনের ধর্ম নয়, যেহেতু চৈতন্য প্রাণ নয়, কোন জড় বস্তুর গুণ নয়, বা চৈতন্য 'বিজ্ঞানসন্তান' (stream of momentory cognition) নয়, সেহেতু চৈতন্য আত্মারূপ দ্রব্যকেই আশ্রয় করে বিরাজ করে। আত্মার সঙ্গে চৈতন্যের সমবায় সম্বন্ধ (relation of inherence)। সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব আছে।

শ্রুতিও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। শ্রুতিতে আত্মার কথা উল্লেখ আছে এবং যেহেতু শ্রুতি প্রামাণ্য, সেহেতু আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এ ছাড়া যোগীরা ধ্যানের মাধ্যমে আত্মাকে প্রত্যক্ষণ করতে পারে না। সুতরাং অলৌকিক প্রত্যক্ষ্যের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়।

৪। অপবর্গ বা মোক্ষ (Liberation) ঃ

অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মত নৈয়ায়িকরাও অপবর্গ বা মোক্ষ লাভকেই জীবের পুরুষার্থ বলে অভিহিত করে। অপবর্গ বা মোক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গৌতম বলেছেন যে, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই (Absolute freedom from pain) হল অপবর্গ। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, চৈতন্য-হীন দ্রব্য। আত্মা মনের সঙ্গে সংযুক্ত হলে এবং মন, ইন্দ্রিয় ও বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হলেই বুদ্ধি, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন প্রভৃতি গুণগুলি আত্মাতে আবির্ভূত হয়। মন ও দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগই আত্মার বদ্ধাবস্থা সূচনা করে। যতক্ষণ আত্মা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ততক্ষণ এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অপ্রিয় বস্তু সংযোগের ফলে জীবকে নানাপ্রকার দুঃখভোগ করতে হয়। শরীর ধারণ করার জন্যই জীবকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। শরীরধারণ বা জন্মগ্রহণই সকল দুঃখের মূল। প্রশ্ন হল—জীবের জন্মগ্রহণ করার কারণ কি? ধর্মাচরণের ফলস্বরূপ সুখভোগ করার জন্য এবং অধর্মাচরণের ফলস্বরূপ দুঃখভোগের জন্যই জীবকে জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং শরীরধারণ

মোক্ষলাভই জীবের পুরুষার্থ

শরীরধারণ করার জন্যই জীবের দুঃখভোগ

করতে হয়। শুভ প্রবৃত্তি এবং অশুভ প্রবৃত্তি থেকেই যথাক্রমে ধর্ম এবং অধর্মের উৎপত্তি। কাম্য বস্তুর প্রতি আসক্তি এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রতি দ্বেষ—এই দুটি কারণ থেকেই প্রবৃত্তির উৎপত্তি বা জন্ম। সুতরাং শুভাশুভ প্রবৃত্তির মূলে আসক্তি ও দ্বেষ বর্তমান। এই উভয়কেই দোষ নামেই অভিহিত করা হয়েছে। আসক্তি এবং দ্বেষের মূলে মিথ্যাজ্ঞান। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানই দোষের কারণ। এই মিথ্যাজ্ঞান থেকেই তিনপ্রকার দোষ জন্মে—রাগ, দ্বেষ এবং মোহ। কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান কি? আমরা সাধারণতঃ মন, ইন্দ্রিয়, শরীর প্রভৃতিকেই আমি-রূপে বা আত্মারূপে ধারণা করি। অথচ আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর কোনটিরই সঙ্গে অভিন্ন নয়। এই ভ্রান্ত জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যাজ্ঞানই জীবের বদ্ধাবস্থার কারণ। মিথ্যাজ্ঞানের জন্য জীবের মধ্যে রাগ, দ্বেষ, মোহ এই সব দোষের উৎপত্তি ঘটে। দোষের তাড়নায় জীব শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রবৃত্তি থেকে ধর্ম এবং অধর্মের উৎপত্তি হয় এবং এরই ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে বদ্ধ হতে হয়। এরই জন্য জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও শরীরধারণ। শরীরধারণ করলেই জীবকে দুঃখ ভোগ করতে হবে। সেকারণে নৈয়ায়িকদের মতে সকল দুঃখের মূল যে মিথ্যাজ্ঞান, সে মিথ্যাজ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে বিনষ্ট করতে হবে। প্রমেয় বা জ্ঞানের বস্তুর যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানই হল তত্ত্বজ্ঞান। আত্মার যথাযথ স্বরূপের জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে পারে। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হলেই জীবকে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না, ফলে দুঃখের উৎপত্তি হবে না।

শুভ ও অশুভ প্রবৃত্তি থেকে ধর্ম ও অধর্মের উৎপত্তি

মিথ্যাজ্ঞানই দোষ ও সকল দুঃখের মূল কারণ

মিথ্যাজ্ঞানকে তত্ত্ব-জ্ঞানের সাহায্যে দূর করতে হবে

সুতরাং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে, দেহের সঙ্গে তার সকল সংযোগ নষ্ট হয়। অপবর্গ দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি নয়, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। রোগমুক্তিতে বা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ থেকে মুক্ত হলেও দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি ঘটে মাত্র; কিন্তু দুঃখের একান্ত নিবৃত্তির নামই

মোক্ষ বা অপবর্গ। এই মোক্ষ অবস্থায় সুখানুভূতি থাকে কিনা, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। মহর্ষি গৌতম সুখানুভূতির অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছুই বলেননি। গৌতমের মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই অপবর্গ। ভাষ্যকার বাৎসায়নের মতে মোক্ষতে সুখের অনুভূতি থাকে না। বিশুদ্ধ সুখ বলে কিছু নেই, সব সুখের মধ্যেই দুঃখের মিশ্রণ আছে। দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগ বিনষ্ট হলে সুখ দুঃখ বলে কিছুই থাকে না। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন দ্রব্য। মোক্ষ অবস্থায় আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। কাজেই কোন প্রকার চেতনার অনুপস্থিতিতে সুখানুভূতির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

দুঃখের একান্ত নিবৃত্তিই মোক্ষ

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষলাভের উপায়। শ্রবণের অর্থ হল আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে শাস্ত্রবাক্যের উপদেশ শ্রবণ করা। মননের অর্থ হল এই উপদেশ নিজের মনে চিন্তা করা এবং বিচার বুদ্ধির সাহায্যে সেই জ্ঞানকে মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। নিদিধ্যাসন হল যোগভ্যাসের দ্বারা আত্মার স্বরূপ ধ্যান করা। ধ্যানের মাধ্যমে আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান গভীর ও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি হবে। নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটে এবং অবিদ্যা দূর হয়। এইভাবে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে জীব আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়। তখন জীব আর মন, শরীর বা ইন্দ্রিয়কে আমি-রূপে উপলব্ধি করে না। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ার জন্য মিথ্যাজ্ঞান থেকে উদ্ভূত যে দোষ—রাগ, দ্বেষ ও মোহের উৎপত্তি হয় না। প্রবৃত্তিরূপ কারণের অভাবে জীবের জন্মগ্রহণ হয় না। জন্মরূপ কার্যের উৎপত্তি না হওয়ার জন্য আত্মার সঙ্গে দেহের সব সংযোগ বিনষ্ট হয় এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। আত্মার স্বরূপে অবস্থান এবং তার ফলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মোক্ষ বা অপবর্গ। মোক্ষ কোন ভয়জনক অবস্থা নয়, এ হল পরম শান্তির অবস্থা।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষলাভের উপায়

নৈয়ায়িকদের মতে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রেই, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীই হোক বা গৃহস্থই হোক মোক্ষলাভের অধিকারী।

৫। ন্যায়-ঈশ্বরতত্ত্ব (The Nyaya Theology) :

ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতম যে ষোলটি পদার্থের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নেই। সেকারণে নৈয়ায়িকরা নিরীশ্বরবাদী, এমন একটি ধারণা মনে জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়। মহর্ষি গৌতম ঈশ্বর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেননি সত্য, কিন্তু ন্যায়সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে তিনটি সূত্রে ঈশ্বরের কথা বলেছেন। সিদ্ধান্তসূত্রে মহর্ষি বলেছেন যে, ঈশ্বরই জীবের কর্ম এবং কর্মফল নিয়ন্ত্রণ করেন।

নৈয়ায়িকরা নিরীশ্বর-বাদী নয়

পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ, বাৎসায়ন, উদ্যোতকার, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়ন, জয়ন্ত ভট্ট, গঙ্গেশ প্রভৃতি ব্যক্তিরা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে মোক্ষ বা অপবর্গের সম্বন্ধ নির্দেশ করেন। এই সকল নৈয়ায়িকদের মতে প্রমেয় বিষয়ের যথার্থজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হলেই জীব মুক্তিলাভ করতে পারে। কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরের করুণা লাভ করলেই এই মোক্ষলাভ সম্ভব। ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন প্রমেয় বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান এবং মোক্ষলাভ করা কোন জীবের পক্ষেই সম্ভব নয়।

সুতরাং দুটি প্রশ্নের আলোচনার প্রয়োজন আছে—ঈশ্বরের স্বরূপ কি? ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি ভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে?

(i) **ঈশ্বরের স্বরূপ :** প্রমেয়-পদার্থের অন্যতম পদার্থ হল আত্মা। এই আত্মার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই সূচিত হয়। যদিও ন্যায়দর্শনে জীবাত্মার স্বরূপই আলোচিত হয়েছে তথাপি এই আত্মা শব্দ পরমাত্মা শব্দেরও বাচক। সুতরাং আত্মা দু' প্রকার —জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মাই ঈশ্বর।

পরমাত্মাই ঈশ্বর

ঈশ্বর জগত সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি জগত সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন এবং ধ্বংস করেন। শূন্য থেকে তিনি এই জগত সৃষ্টি করেননি। পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ, মন এবং আত্মার সাহায্যেই এই জগত সৃষ্টি করেছেন। আত্মা, মন, দেশ, কাল, আকাশ—এগুলি নিত্য ও

ঈশ্বর জগত সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ

শাশ্বত। সৃষ্টির পূর্বেই এগুলির অস্তিত্ব ছিল এবং চিরকালই এগুলির অস্তিত্ব থাকবে। ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিও চিরকাল ধরে বিরাজ করছে। তাহলে ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করেছেন—এ কথার অর্থ কি? ঈশ্বরের জগত সৃষ্টির অর্থ ঈশ্বর এই সব শাশ্বত ও নিত্য বস্তুগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। ঈশ্বর অনিত্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ। ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা। পরমাণুর সংযোগ সাধনেই বস্তুর সৃষ্টি, পরমাণুর বিচ্ছেদসাধনেই এই জগতের ধ্বংস। কিন্তু পরমাণুগুলি যেহেতু শাশ্বত ও অবিনশ্বর, সেহেতু ধ্বংসের পরেও এই পরমাণুগুলির অস্তিত্ব থাকবে।

ঈশ্বর অনিত্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ

জীব কর্ম অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করে। কর্ম অনুযায়ীই সে পাপ-পুণ্যের অধিকারী হয়। জীবের এই পাপ-পুণ্য যার মধ্যে সঞ্চিত থাকে তার নামই অদৃষ্ট। ঈশ্বর এই অদৃষ্টের (পাপ-পুণ্যের) অধিষ্ঠাতা। ঈশ্বরই জীবের কর্মফলদাতা।[1] যদিও জীব নিজের ইচ্ছায় কর্মসম্পাদন করে তবু কর্মের ফল ভোগ করা জীবের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। কারণ কর্ম থেকে পুণ্য (merit) এবং পাপ (demerit) রূপ যে অদৃষ্ট শক্তির আবির্ভাব ঘটে, সে-অদৃষ্টশক্তি অচেতন। এর নিজের কোন চিন্তা বা বিচারশক্তি, নিজস্ব কোন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও নেই। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই এই অদৃষ্ট শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ঈশ্বরই জীবের পাপপুণ্যের বিচার করে তার ফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন।

ঈশ্বর অদৃষ্টশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ (Efficient cause), তিনি উপাদান কারণ (Material cause) নন। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এই জগতের স্থিতি, তাঁর ইচ্ছাতেই এই জগতের প্রলয়, বিনাশ বা ধ্বংস। ঈশ্বর এক, অসীম ও শাশ্বত। দেশ, কাল, আত্মা এবং মনের সমন্বয় সাধনের ফলে যে জগতের সৃষ্টি, সে-জগতের দ্বারা ঈশ্বরের অসীমত্ব খণ্ডিত হয় না। ঈশ্বরের সঙ্গে এই জগতের সম্বন্ধ আত্মার সঙ্গে জীবদেহের সম্বন্ধের সমতুল্য। যদিও জীবের কর্মফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করার জন্য ঈশ্বরকে জীবের অদৃষ্ট শক্তির ওপর নির্ভর

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ

1. "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মফলস্য দর্শনাৎ।"—ন্যায়সূত্র ৪।১

করতে হয়, তবু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, যেহেতু সকল কিছুর যথাযথ স্বরূপ সম্পর্কে তিনি অবহিত! ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী এবং এই অনন্ত জ্ঞান তাঁর অবিচ্ছেদ্য গুণ।

ঈশ্বর সকল জীবের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেন। জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সে-স্বাধীনতা শর্তহীন নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভর। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ, পিতা পুত্রের সম্পর্ক—'যথা পিতা অপত্যানাং তথা পিতৃভূত ঈশ্বরো ভূতানাম্'। পিতা যেভাবে পুত্রের ক্ষমতা, সামর্থ্য, তার অর্জিত বিদ্যার দিকে লক্ষ্য রেখে পুত্রকে পরিচালিত করেন, ঈশ্বরও অনুরূপভাবে তাঁর সৃষ্ট জীবকে অতীত আচরণ ও চরিত্র অনুযায়ী পরিচালিত করেন। মানুষ তার কাজের নিমিত্ত কারণ, ঈশ্বর হলেন প্রযোজক কর্তা। সুতরাং ঈশ্বর জীবের কর্মফল দাতা এবং আমাদের নৈতিক জীবনের সুখ-দুঃখের নিয়ন্ত্রণ কর্তা।

(ii) ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (Proofs for the Existence of God) ঃ নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য একাধিক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক যুক্তির সঙ্গে এই যুক্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

(ক) আদি কারণবিষয়ক যুক্তি (The Causal Argument)ঃ

এ জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ—যেমন সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতি পরমাণুর সংযোগের ফলেই উদ্ভূত। এগুলি হল কার্য, যেহেতু এগুলি অংশের সমষ্টি বা সবয়ব এবং দ্বিতীয়তঃ, এগুলির অবান্তরমহত্ব বা সীমিত পরিসর (limited dimension) আছে। এদের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কারণ দু'প্রকার—নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ বা সমবায়ী কারণ। যেমন—ঘট হল কার্য, এর উপাদান কারণ হল মাটি এবং নিমিত্ত কারণ বা কর্তা হল কুম্ভকার। অনুরূপভাবে জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থের উপাদান কারণ যদি হয় ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ প্রভৃতির পরমাণু, এদের নিমিত্ত

যাবতীয় যৌগিক পদার্থের স্রষ্টিকর্তা ঈশ্বর

কারণ বা কর্তা কে? এই সব বস্তুগুলির উপাদান কারণগুলি নিজে নিজেই সংযুক্ত হতে পারে না। যদি কোন কর্তা এই সব উপাদান কারণগুলির মধ্যে সংযোগসাধন না করে, তাহলে এই সব সৃষ্টবস্তুর মধ্যে আমরা যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা, সূক্ষ্ম কলাকৌশল লক্ষ্য করি, তা কখনও সম্ভব হত না। সুতরাং এরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে, এমন কোন কর্তা আছে যাঁর জ্ঞান, চিকীর্ষা ও কৃতি আছে। অর্থাৎ এই উপাদান কারণগুলি কোন্ উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে সে সম্পর্কে অপরোক্ষ জ্ঞান আছে এবং উদ্দেশ্য-সাধনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে। সে কর্তা অবশ্যই সর্বজ্ঞ হবেন। কারণ যিনি সর্বজ্ঞ তাঁর পক্ষেই উপাদান বা পরমাণুগুলি সম্পর্কে অপরোক্ষ জ্ঞান থাকা সম্ভব। সুতরাং এই সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কর্তা ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ নন।

(খ) নৈতিক যুক্তি (The Moral Argument):

এই জগতের বিভিন্ন মানুষের অবস্থার মধ্যে আমরা তারতম্য লক্ষ্য করি। কোন ব্যক্তি জ্ঞানী, কোন বক্তি মূর্খ, কেও বা সুখী, কেও বা দুঃখী, কেও ধনী, কেও দরিদ্র—মানুষের অবস্থার এই তারতম্যের কারণ কি? মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করে। 'যেমন কর্ম-সম্পাদন তেমন ফলভোগ'—এই নৈতিক কর্মবাদই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নীতি অলঙ্ঘনীয়। কোন ব্যক্তির পক্ষেই এই নীতিকে লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। কার্যকারণ নীতি অনুসারে প্রতিটি কার্যেরই একটি কারণ আছে এবং এই নিয়ম নৈতিক জগতে কর্মবাদের রূপ পরিগ্রহণ করেছে।

জীবের সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সম্পাদনের ফলে পূণ্য এবং পাপরূপ অদৃষ্টশক্তির আবির্ভাব ঘটে। জীবের সঞ্চিত পাপ-পুণ্যকেই অদৃষ্ট বলা যেতে পারে। এই অদৃষ্টের জন্যই জীবের সুখভোগ এবং দুঃখভোগ। কিন্তু এই অদৃ

ঈশ্বর অদৃষ্টশক্তির নিয়ন্ত্রণ কর্তা

অচেতন, তার পক্ষে কর্মফল অনুযায়ী কার কতটুকু প্রাপ্য, তা বিচার করা সম্ভব নয়। সুতরং অনুমান করা যেতে পারে যে, এমন কোন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান কর্তা আছেন যিনি এই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং জীবের কর্ম অনুযায়ী তার পাপপুণ্যের বিচার ক'রে তার

ফলভোগের ব্যবস্থা করেন। এই কর্তা কে? ঈশ্বরই হলেন এই কর্তা বা অধিষ্ঠাতা।

(গ) বেদের কর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (The Argument from the Authoritativeness of the Vedas) ঃ

বেদ প্রামাণ্য গ্রন্থ ও বেদের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়। সাধারণতঃ বেদকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু বেদকে প্রামাণ্য মনে করার কারণ কি? বেদের প্রামাণ্য হল আপ্তপ্রামাণ্য। বেদের রচয়িতা কোন জীবাত্মা নয়, কোন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান আত্মাই বেদের কর্তা। সাধারণ মানুষের ভ্রম প্রমাদাদি থাকার জন্য তারা বেদের রচয়িতা হতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বর যদি বেদ রচনা করেন তবেই বেদ অভ্রান্ত ও প্রামাণ্য হতে পারে। এ ছাড়াও বেদে বহু অলৌকিক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই সব অলৌকিক বিষয় কোন সাধারণ জীবের প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। সুতরাং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কোন পরমাত্মাই বেদের কর্তা, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ সেহেতু তিনি ত্রিকালজ্ঞ। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং যাবতীয় অলৌকিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁর আছে। এই সর্বজ্ঞ পরম আত্মাই হলেন ঈশ্বর।

ঈশ্বরই বেদের রচয়িতা

অবশ্য এমন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে মুনিঋষিগণও ত সর্বজ্ঞ, তাঁদের পক্ষে বেদের কর্তা হওয়ায় বাধা কোথায়? কিন্তু একাধিক ব্যক্তিকে যদি বেদের রচয়িতা বলে কল্পনা করা হয়, তাহলে বেদের রচয়িতারূপে বহু ব্যক্তিকে স্বীকার করে নিতে হয়, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া, যেখানে একজন মাত্র কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করলেই কাজ চলে, সেখানে একাধিক কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার অর্থহীন কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই একমাত্র বেদের কর্তা। বেদ প্রামাণ্য, কারণ বেদ ঈশ্বরেরই বাক্য।

(ঘ) শ্রুতির যুক্তি (The Testimony of Sruti) ঃ

ঈশ্বরের অস্তিত্বের আর একটি প্রমাণ হল শ্রুতির যুক্তি। বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বহু প্রমাণ আছে। কৌষীতকি উপনিষদের একটি জায়গায় বলা হয়েছে যে 'তিনি

সকল আত্মার নিয়ামক এবং জগতের সৃষ্টিকর্তা। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে যে 'তিনি সকলের প্রভু, সকলের নিয়ামক, সকলের শাসনকর্তা এবং সকল জীবের স্বামী।' এই উপনিষদেরই অন্যত্র বলা হয়েছে যে 'তিনি সকলের অন্তরে অধিষ্ঠিত এবং সকলকে পথ প্রদর্শন করেন।' শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এক জায়গায় উল্লেখ আছে 'তিনিই পরমপুরুষ, তিনিই সর্বজ্ঞ।' মাণ্ডুকোপনিষদে উক্ত আছে 'তিনি সকলের প্রভু, সর্বজ্ঞ, আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রা, এ জগতের আদি কারণ, এর সৃষ্টি এবং প্রলয়কর্তা।' শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের আর এক জায়গায় উল্লেখ আছে 'তিনি কর্মের নিয়ন্ত্রা এবং সকল জীবের আশ্রয়। তিনি জীবাত্মাকে পাপপুণ্যের ফল প্রদান করেন'।

বেদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে

স্থতরাং বেদে ঈশ্বরকে সৃষ্টি-স্থিতি এবং প্রলয়কর্তারূপে, জীবাত্মার নিয়ন্ত্রারূপে, কর্মফলদাতারূপে, বিশ্বজগতের নৈতিক শাসনকর্তারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু বেদ প্রামাণ্য এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। **অবশ্য এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে যে শাস্ত্রবাক্য যে প্রামাণ্য তার প্রমাণ কি** এবং যেহেতু শাস্ত্রবাক্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টির উল্লেখ আছে সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে তার কি অর্থ আছে? বিচার করার ক্ষমতা নেই এমন কোন সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নিলেও, যিনি দার্শনিক, বিচার বিশ্লেষণ করে বিষয়ের যথাযথ জ্ঞানলাভ করাই যার উদ্দেশ্য, তিনি কেবলমাত্র শাস্ত্রবাক্যকে প্রমাণ্য বলে স্বীকার করে নিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেবেন কেন? তাছাড়া, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যে সব যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলি প্রকৃত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। কারণ সব যুক্তিগুলিই ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি পূর্বে স্বীকার করে নিয়ে তারপর ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হয়। তাছাড়া, ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা ও ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব—এই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

আসল কথা হল যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কোন কিছুর অস্তিত্ব অভিজ্ঞতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়। বিচার বা তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না।

যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না

যিনি প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন, তার পক্ষে বিচারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যারা প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হননি তাদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের আপ্তবচনের ওপর নির্ভর করাই শ্রেয়। যেহেতু শাস্ত্রে ঋষিদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের বা উপলব্ধির কথা লিপিবদ্ধ আছে, সেহেতু শাস্ত্রগুলিকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা উচিত। বৈজ্ঞানিকদের প্রদত্ত বিজ্ঞানের বিবরণগুলি যেমন আমরা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করি, অনুরূপ ভাবে শ্রুতিবাক্য ও আপ্তবাক্য এবং বেদ ও উপনিষদে ঈশ্বরের যে অস্তিত্বের কথা উল্লেখ আছে তাও বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য।

ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যাদের হয়নি তাদেরই আপ্তবচনের ওপর নির্ভর করতে হয়

৬। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে, নৈয়ায়িকদের যুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ (Anti-theistic objections):

নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যে সব যুক্তি দিয়েছেন, সাংখ্যকার, মীমাংসকগণ ও জৈনগণ তার বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ এনেছেন এবং নৈয়ায়িকরা এই সব অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন।

(ক) নৈয়ায়িকদের ঈশ্বর-সম্পর্কীয় যুক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল যে ঈশ্বর যদি এ জগতের স্রষ্টিকর্তা হন তবে ঈশ্বরের অবশ্যই দেহ থাকা প্রয়োজন। দেহ বা শরীর ভিন্ন কোন কর্ম করা সম্ভব নয়, কুম্ভকার শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই ঘট নির্মাণ করেন।

ঈশ্বর যদি স্রষ্টিকর্তা হন তাহলে তার দেহ থাকা প্রয়োজন

নৈয়ায়িকরা এই অভিযোগের উত্তরে বলেন যে, সাধারণ জীবের পক্ষে কর্ম করার জন্য দেহের প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশের জন্য দেহের

কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, যে পরমাণুগুলির সংযোগসাধন করে ঈশ্বর এ জগত সৃষ্টি করেন, সেই পরমাণুগুলিই ঈশ্বরের দেহের কাজ করতে পারে। কারণ ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছার দ্বারা পরমাণুগুলিকে গতিশীল করে তুলতে পারেন।

ঈশ্বরের পক্ষে দেহের প্রয়োজন হয় না

নৈয়ায়িকদের অপর যুক্তি হল যে, শ্রুতির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি প্রমাণিত হয় তাহলে এই অভিযোগ অর্থহীন হয়ে পড়ে আর ঈশ্বরের অস্তিত্বই যদি প্রমাণিত না হয় তাহলে ঈশ্বর শরীর ছাড়াও কি ভাবে কর্ম করেন, সে প্রশ্ন একেবারেই ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে।

(খ) নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ হল যে, তাদের শেষ দুটি যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট। নৈয়ায়িকদের তৃতীয় যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, যেহেতু বেদ প্রামাণ্য, সেকারণে বেদের রচয়িতা কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর। চতুর্থ যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, বেদের মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় জানতে পারি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাহায্যে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, আবার অপরদিকে বেদের প্রামাণ্যের সহায়তায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

নৈয়ায়িকদের মতে তাদের যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট নয়। অস্তিত্বের দিক থেকে বিচার করলে ঈশ্বরের স্থান প্রথম, বেদের স্থান তার পরে, যেহেতু ঈশ্বর বেদ রচনা করেছেন। কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে বেদের স্থান প্রথম এবং ঈশ্বরের স্থান পরে, কারণ বেদের মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবগত হই। যদিও ঈশ্বর বেদ-রচয়িতা তবুও বেদের জ্ঞানের জন্য ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করার কোন প্রয়োজন নেই কারণ বেদের জ্ঞান যে কোন উপযুক্ত গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব নয়, ঈশ্বরের জ্ঞানের জন্য জীবাত্মাকে বেদের ওপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং নৈয়ায়িকদের যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট নয়।

নৈয়ায়িকদের যুক্তি চক্রক দোষে দুষ্ট নয়

(গ) নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ হল যে ঈশ্বর যদি জগতের সৃষ্টিকর্তা হন তা হলে জগত সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য

আছে। কারণ উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ কোন কাজ করে না, কিন্তু ঈশ্বরের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। প্রথমতঃ, ঈশ্বর নিজের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কোন কাজ করতে পারেন না যেহেতু ঈশ্বরের কোন অপূর্ণ বাসনা নেই। দ্বিতীয়তঃ, পরের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ঈশ্বর কাজ করতে পারেন না, যেহেতু যে কেবল পরের জন্য কাজ করে সে বুদ্ধিহীন।

ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা নন

এমন কি এ ধারণাও করা যায় না যে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা বশতঃ এ জগত সৃষ্টি করেছেন। কারণ নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে অপরের দুঃখ দূর করার চেষ্টাই হল করুণা। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের কথা না ভেবে কেবলমাত্র অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারে না। তাছাড়া, ঈশ্বর যদি করুণাবশতঃ জগত সৃষ্টি করতেন, তাহলে জগতে এত দুঃখ দেখা যেত না, মানুষও এত অসুখী হত না। এই অভিযোগের উত্তরে নৈয়ায়িকরা বলেন যে, ঈশ্বর করুণাবশতঃই এ জগত সৃষ্টি করেছেন। তবু সব রকম দুঃখ-ক্লেশমুক্ত একটা সুখময় জগত তিনি সৃষ্টি করতে পারেন না যেহেতু জীবের শুভ এবং অশুভ তার নিজের কর্মের ফল এবং ঈশ্বরকে জীবের পাপ পুণ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে এ জগত সৃষ্টি করতে হয়। জীবাত্মার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এবং ঈশ্বর নিজের ইচ্ছাকে সীমিত করে জীবকে স্বাধীনভাবে কর্ম করার সুযোগ দিয়েছেন। জীবই স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নিজের সুখ-দুঃখ সৃষ্টি করে; এর জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করা যায় না।

ঈশ্বর করুণাবশতঃ এ জগত সৃষ্টি করেছেন

উপসংহার

নৈয়ায়িকদের জ্ঞান-তত্ত্বের আলোচনা ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ। প্রমা ও প্রমাণ সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের বিস্তারিত আলোচনা এ কথাই প্রমাণ করে দেয় যে, ভারতী দর্শন বিচারাবিযুক্ত দর্শন নয় এবং অতি সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের ওপর ভারতীয় দর্শন প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া, যদিও অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকদের মত নৈয়ায়িকদের মতে জীবের

নৈয়ায়িকদের দার্শনিক আলোচনার মূল্য

মোক্ষ লাভই তার একমাত্র উদ্দেশ্য তবু তত্ত্ববিদ্যার আলোচনার পূর্বে তারা জ্ঞান বা ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তত্ত্ববিদ্যার পূর্বে আলোচনা করা দরকার কি ভাবে এই জ্ঞান পাওয়া যেতে পারে ও সত্য জ্ঞান লাভের জন্য কোন্ কোন্ প্রণালী উপযুক্ত এবং অনুপযুক্ত প্রণালী অনুসরণ করার জন্যই বা কি প্রকার ভ্রান্তি দেখা দিতে পারে ও কি ভাবে সেগুলিকে দূর করা যেতে পারে। নৈয়ায়িকরা এইভাবে জ্ঞানের আলোচনাকে তাদের দর্শনে প্রাধান্য দিয়েছেন।

নৈয়ায়িদের দার্শনিক আলোচনার ত্রুটি

কিন্তু নৈয়ায়িকদের ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনার যতখানি বৈশিষ্ট্য ও মূল্য আছে, তাদের তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায় সে পরিমাণ মূল্য নেই। বস্তুতঃ, তাদের তত্ত্ববিদ্যার আলোচনার মধ্যে অনেক অসংগতি দেখা যায়।

নৈয়ায়িকরা অতিবর্তী ঈশ্বরবাদী

নৈয়ায়িকরা বস্তুবাদী এবং বহুবাদী। নৈয়ায়িকরা পরমাণু, জীবাত্মা, মন, ঈশ্বর সকলেরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেছেন। জীবাত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, নিষ্ক্রিয় এবং নির্গুণ। ঈশ্বর সচেতন, সক্রিয় এবং সগুণ। ঈশ্বর জীবাত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। পরমাণু অচেতন এবং নিষ্ক্রিয়, ঈশ্বরই পরমাণুতে গতিদান করেন। কিন্তু জীবাত্মা, মন, ঈশ্বর সবই নিত্য। এই সব সত্তা বাহ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। জড়জগত, জীবজগত এবং ঈশ্বরের মধ্যে কোন নিবিড় বা আন্তর সম্বন্ধ (internal relation) নেই। নৈয়ায়িকরা অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদী (Deists)। অতিবর্তী-ঈশ্বরবাদ অনুসারে ঈশ্বর জগত ও জীবের মধ্যে ব্যাপ্ত নন; তিনি সম্পূর্ণরূপে জীব ও জগতের বাইরে অবস্থান করেন। নৈয়ায়িকদের মতে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক পিত্রাপুত্র সম্পর্কের মত। এই উপমা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার বাহ্য সম্পর্ককেই বড় করে তোলে। সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের ও জীবাত্মার কোন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ না থাকায় এবং প্রত্যেকেরই স্বাধীন সত্তা থাকায় ও স্বরূপগত প্রভেদ থাকায় আমরা ন্যায় দর্শনে কোন সুসংহত ও সুবিন্যস্ত তত্ত্ববিদ্যা পাই না। সুতরাং ন্যায় দর্শনের তত্ত্বালোচনা সাংখ্য বা বেদান্ত দর্শনের তত্ত্বালোচনার মত অতখানি উচ্চস্তরের নয়।

ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নয় গৌণ, কেননা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলেই জীব মোক্ষ লাভ করতে পারে। ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার নয়, আত্ম-সাক্ষাৎকার বা আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানই মোক্ষলাভের পন্থা। গৌতমের মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান মোক্ষলাভের কারণ নয়। তাছাড়া, ন্যায়ের মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, সমবায়ী কারণ নয়। কিন্তু জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের এরূপ সম্বন্ধ কল্পনা করার অর্থ ঈশ্বরকে সাধারণ মানুষের স্তরে টেনে নিয়ে আসা। অবশ্য এ জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক জীবের সঙ্গে তার দেহের সম্বন্ধের সমতুল্য, এ জাতীয় একটা সংকেত ন্যায় দর্শনে আছে বটে, তবে তাকে একটা বিস্তারিত দার্শনিক মতবাদের মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরের স্থান গৌণ

জীবাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের ধারণাও অসংগতিপূর্ণ। তাঁদের মতে জীবাত্মা একটা দ্রব্য যা স্বরূপতঃ অচেতন এবং নির্গুণ। দেহের সঙ্গে সংযোগের ফলেই আত্মাতে চেতনার আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের সাহায্যেই আমরা জানতে পারি যে, আত্মা এক চৈতন্যময় সত্তা, চৈতন্য আত্মার গুণ নয়, আত্মার সারধর্ম। তা না হলে আত্মার সঙ্গে জড়বস্তুর প্রভেদ নির্ধারণ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাছাড়া, মোক্ষাবস্থায় জীবের মধ্যে যদি কোন চেতনা না থাকে তাহলে জীবের সঙ্গে একটা জড়বস্তু, যেমন এক টুকরো পাথরের কি প্রভেদ? মোক্ষাবস্থা যদি চেতনাহীন অবস্থা হয় তাহলে এই অবস্থা লাভ করার জন্যই বা জীবের মধ্যে আকুলতা দেখা দেবে কেন?

জীবাত্মার ধারণা অসংগতিপূর্ণ

নৈয়ায়িকদের 'পদার্থের' শ্রেণী বিভাগও অসংগতিপূর্ণ। কোন্ বিশিষ্ট নীতি অনুসরণ করে নৈয়ায়িকরা পদার্থের শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা বোঝা কষ্টকর। যে নীতি অনুসারে দ্রব্যকে পদার্থ বলে বিচার করা যেতে পারে, সেই নীতি অনুসারে, জল্প, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতিকে পদার্থরূপে বিচার করা কি ভাবে সম্ভব?

পদার্থের শ্রেণীবিভাগ অসম্পূর্ণ

নৈয়ায়িকদের মতে নৈতিক নিয়ম ঈশ্বরের আদেশ। নৈতিক নিয়ম যদি জীবের বিবেকের আদেশ না হয় এবং জীবের বৃহত্তর সত্তার দ্বারা তার ক্ষুদ্রতর সত্তার ওপর প্রযুক্ত না হয় তাহলে নৈতিক ভাল-মন্দ শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে পড়ে। অতএব তাদের নৈতিক নিয়মের ধারণাও যুক্তিযুক্ত নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বৈশেষিক দর্শন
(Vaisesika)

১। ভূমিকা (Introduction) :

বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ঋষি কণাদ। এই দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন, যেহেতু এই দর্শনে 'বিশেষ' নামে একটি পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে। প্রবাদ আছে—ঋষি কণাদ কেবলমাত্র তণ্ডুলকণার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে এবং তাঁর আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করে, তাঁরই আজ্ঞায় মহর্ষি এই দর্শন রচনা করছেন। এই কারণেই তাঁর উপাধি হল কণাদ এবং তাঁর প্রবর্তিত দর্শনের নাম কণাদ দর্শন। কোন কোন দার্শনিক তাকে 'কণভুক্' নামেও অভিহিত করেছেন। এই মহান ঋষির প্রকৃত নাম হলো উলূক এবং এই কারণেই তাঁর রচিত দর্শনশাস্ত্র 'ঔলূক্য দর্শন' নামেও পরিচিত। তাঁর গোত্র কাশ্যপ ছিল বলে তাকে 'কাশ্যপ' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

'বিশেষ' নামক পদার্থ থেকেই বৈশেষিক নামের উৎপত্তি

কণাদের বৈশেষিকসূত্র বৈশেষিক দর্শনের প্রথম সুসংহত রচনা। এই সূত্র দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ের দুটি পরিচ্ছেদ আছে। এই পরিচ্ছেদকে আহ্নিক বলে। বৈশেষিক সূত্রে মোট তিনশত সত্তরটি সূত্র আছে। অনেকে মনে করেন যে কণাদের বৈশেষিক সূত্র গৌতমের ন্যায়সূত্রের পূর্বে রচিত হয়েছে এবং এ ব্রহ্মসূত্রের সমসাময়িক। প্রশস্তপাদমুনির 'পদার্থধর্ম সংগ্রহ' বৈশেষিক দর্শনের ওপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। অনেকে এই গ্রন্থকে ভাষ্য বলে মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থখানি ভাষ্য নয়। এই গ্রন্থে তিনি সূত্রের ক্রমকে যথারীতি অনুসরণ করেন নি। তাছাড়া, চব্বিশটি গুণের কথা, সৃষ্টিবাদ এবং ঈশ্বরই যে জগত কর্তা—এই বৈশেষিক মতবাদ

কণাদের বৈশেষিক সূত্র বৈশেষিক দর্শনের প্রথম রচনা

বৈশেশিক দর্শনের ওপর বিভিন্ন রচনা

তারই গ্রন্থে সর্বপ্রথম দেখা যায়। এই সব কারণে গ্রন্থখানিকে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলেই মনে হয়। অনেকে মনে করেন যে, লঙ্কাধিপতি রাবণই বৈশেষিক-সূত্রের আদি ভাষ্যকার। উদয়নের 'কিরণাবলী', শ্রীধরের 'ন্যায় কন্দলী' এবং ব্যোমশিবের 'ব্যোমবর্তী' পদার্থধর্মসংগ্রহের ওপর উল্লেখযোগ্য তিনটি টীকা (commentary)। উদয়নের কিরণাবলী টীকার ওপরে মৈথিল পণ্ডিত বর্ধমান 'কিরণাবলী প্রকাশ' নামে একটি টিপ্পনী গ্রন্থ রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে বৈশেষিক দর্শনের ওপর যে সব রচনা দেখা যায়, সে সব রচনা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ওপর রচিত হয়। শিবাদিত্যের 'সপ্তপদার্থী', বল্লভাচার্যের 'ন্যায়লীলাবতী' এবং বিশ্বনাথের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' এবং এই গ্রন্থের ওপর 'সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' নামে টীকা বৈশেষিক দর্শনের ওপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রঘুনাথ ন্যায়লীলাবতীর ওপর 'দীধিতি' নামক একটি টীকা রচনা করেছন।

ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে সম্বন্ধ ঃ ন্যায় দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনকে সমানতন্ত্র বলা হয়। উভয় দর্শনের মতবাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়ের মতেই মোক্ষই জীবের পরম পুরুষার্থ। উভয় দর্শনই মনে করে যে, অজ্ঞানতা বা মিথ্যাজ্ঞানই সকল দুঃখের মূল কারণ। মোক্ষ হল দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি এবং তত্ত্বজ্ঞান বা বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যেই মোক্ষলাভ করা সম্ভব। এ ছাড়াও জীবাত্মা, পরমাত্মা, জড়জগৎ, পরমাণু, দেশ, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ প্রভৃতি উপাদান সম্পর্কেও উভয়ের মতবাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। উভয় দর্শনই বস্তুবাদী (realist) এবং বহুবাদী (pluralist)।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য

কিন্তু দুটি বিষয়ে উভয় দর্শনের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায়। ন্যায়দর্শনে চারটি প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে ; যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। কিন্তু বৈশেষিক দর্শন কেবলমাত্র দুটি প্রমাণ স্বীকার করে—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। বৈশেষিক দর্শনের মতে উপমান এবং শব্দ অনুমানেরই অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ, ন্যায়দর্শন ষোলটি পদার্থ স্বীকার করে। কিন্তু বৈশেষিক দর্শন কেবলমাত্র সাতটি পদার্থ স্বীকার করে ; যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব। কারও কারও

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে অসাদৃশ্য

মতে মহর্ষি কণাদ ছ'টি পদার্থকে স্বীকার করেছেন। কারণ তাঁর সূত্রে 'অভাব'কে পদার্থরূপে উল্লেখ করা হয়নি। 'অভাব' সম্পর্কে তিনি আলোচনা পরে করেছেন। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎসায়ন এবং সাংখ্যসূত্রকার কপিলের মতে কণাদ ষট্-পদার্থবাদী। কিন্তু অনেকের মতে কণাদ অভাবকেও পদার্থ বলে স্বীকার করেছেন এবং সেহেতু তাঁকে সপ্তপদার্থবাদী বলেই মনে করা উচিত। যেহেতু কণাদ 'অভাব' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, সে কারণে পরবর্তী বৈশেষিকগণ অভাবকেও অন্যতম পদার্থ বলে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বৈশেষিকদের মতে পদার্থ ছ' প্রকার নয়—সাত প্রকার। তবে ন্যায়দর্শনে ও বৈশেষিক দর্শনে 'পদার্থ' শব্দটিকে এক অর্থে গ্রহণ করা হয়নি। ন্যায়দর্শনে পদার্থ হল আলোচনার বিষয় (topic); কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ জ্ঞানের বিষয় (object)।

২। বৈশেষিক জ্ঞানতত্ত্ব (Vaisesika Epistemology) ঃ

বৈশেষিক দর্শনে দুটি প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান সম্পর্কে বৈশেষিক মতবাদ নৈয়ায়িকদের মতবাদের সমতুল্য। যৌগিক পদার্থকেই প্রত্যক্ষ করা যায়, পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। বৈশেষিকদের মতে উপমান এবং শব্দ অনুমানেরই অন্তর্গত, প্রমাণরূপে এগুলির কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। শ্রুতিপ্রমাণ অনুমানেরই নামান্তর, যেহেতু বক্তা প্রামাণিক, সেহেতু আমরা শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করি। শাস্ত্র প্রামাণিক ব্যক্তির দ্বারা রচিত, সেকারণে আমরা অনুমান করি যে, শাস্ত্রে যে সব বিষয় উক্ত আছে, সেগুলি প্রামাণ্য। এ ছাড়াও শব্দ হল অনুমান, যেহেতু শব্দের এবং অর্থের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ বর্তমান এবং শব্দ হল চিহ্নস্বরূপ যার মাধ্যমে শব্দের অর্থ অনুমান করে নেওয়া হয়। উপমান প্রকৃতপক্ষে শব্দপ্রমাণ এবং সে কারণে উপমান অনুমানেরই অন্তর্গত। কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বিবরণের ওপর ভিত্তি করেই আমরা জানতে পারি যে গবয়-পশু (নীল গাই) গরুর মতন। এক্ষেত্রে যে সাদৃশ্য জ্ঞান থেকে অপরিচিত পশুটির পরিচয়রূপ অনুভূতি আমাদের হচ্ছে,

বৈশেষিকদের মতে প্রমাণ দুটি—প্রত্যক্ষ ও অনুমান

উপমান ও শব্দ অনুমানেরই অন্তর্গত

তার মূলে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বিবরণ। সুতরাং উপমান হল শব্দপ্রমাণ এবং সে কারণে অনুমানেরই অন্তর্গত। উপমানকে কোন স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করা যায় না।

জ্ঞান দু'প্রকার—স্মৃতি (Recollection) এবং অনুভব (Apprehension)। অনুভব প্রমা বা যথার্থ হতে পারে এবং অপ্রমা বা অযথার্থ হতে পারে। যথার্থ অনুভব হয় প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমিতি। প্রত্যক্ষ বাহ্য এবং আন্তর উভয় প্রকার হতে পারে। যে বস্তু বা বিষয়ের প্রত্যক্ষ হবে, তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হলে আত্মাতে প্রত্যক্ষ হয়। অবশ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ থাকা প্রয়োজন। অযথার্থ অনুভব দু'প্রকার ; যথা, সংশয় (doubt) এবং বিপর্যয় (illusion)। অনুমান দু'প্রকার হতে পারে ; যথা—স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান। অনুমানকে অন্য তিন ভাগেও ভাগ করা যেতে পারে ; যেমন—কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী।[1]

জ্ঞান দু'প্রকার—স্মৃতি এবং অনুভব

৩। বৈশেষিক তত্ত্ববিদ্যা (Vaisesika Ontology) :

পদার্থ (Categories) : পদার্থ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল পদের বা শব্দের অর্থ ; অর্থাৎ 'পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ'। পদের দ্বারা যে বিষয় সূচিত হয়, তাই হল পদার্থ। পদার্থ হল এমন একটি বিষয় যা অভিধেয়, অর্থাৎ যার নাম দেওয়া যেতে পারে এবং যার সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে। সুতরাং যা জ্ঞানের বিষয় তাকেই পদার্থ বলা যেতে পারে। কেবল জড় জগতের বিভিন্ন বস্তু নয়, যে সব বিষয়ের সত্তা আছে, যেগুলি অভিধেয়, যেগুলি প্রমাণের দ্বারা জ্ঞেয়, সংক্ষেপে যা প্রমিতিয় বিষয় তাই পদার্থ। বৈশেষিকদের মতে পদার্থকে সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ। ভাব বলতে বুঝি যা অস্তিত্বশীল বা যা আছে। যেমন—জড়বস্তু, মন, আত্মা ইত্যাদি। ভাব ভিন্ন পদার্থ হল অভাব পদার্থ। যেমন, ঘটে বস্ত্রখণ্ডের অভাব, মাটির তৈরি মূর্তি বিনষ্ট হলে মাটিতে মূর্তির অভাব। সত্তাবান

যা প্রমিতির বিষয় তাই পদার্থ

পদার্থ—ভাব ও অভাব

1. ন্যায় দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় এগুলি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

৪। বৈশেষিক পরমাণুবাদ (Vaisesika Atomism) ঃ

বৈশেষিক পরমাণুবাদ এক হিসেবে প্রাচীনতম পরমাণুবাদ। বৈশেষিকদের মতে আকাশ, কাল, দিক এবং আত্মা—এই চারটি দ্রব্য নিত্য এবং বিভু বা সর্বব্যাপী ; মন নিত্য দ্রব্য, কিন্তু মন পরমাণুবিশেষ ; ক্ষিতি, জল, তেজ এবং বায়ু—এই চারটি দ্রব্যের পরমাণু নিত্য। এ ছাড়া জগতের সব দ্রব্যই অনিত্য।

যাবতীয় উৎপত্তিশীল দ্রব্যের মৌলিক উপাদান হল পরমাণু

এই জগতের যাবতীয় উৎপত্তিশীল দ্রব্যের মৌলিক উপাদান হল পরমাণু। এ জগতে আমরা যে সব বস্তু দেখি, সেগুলি যৌগিক বা অবয়ববিশিষ্ট। এই সব বস্তু অংশযুক্ত ; বিভিন্ন অংশের সংযোগের ফলেই এই সব যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয় এবং অংশগুলিকে বিযুক্ত করলেই এগুলি বিনষ্ট হয়। যা কিছু উৎপন্ন হয় তাই কার্য ; এবং যেহেতু কার্যমাত্রেরই কারণ আছে, সেহেতু এই সব যৌগিক পদার্থেরও কারণ আছে। কারণ দু'প্রকার—উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। এই সব যৌগিক পদার্থের উপাদান কারণ হল পরমাণু।

বৈশেষিকদের মতে যে কোন অবয়ব বিশিষ্ট বা অংশযুক্ত বস্তুকে যদি ক্রমাগত বিভাগ করা যায় তাহলে আমরা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর, তারপর আরও ক্ষুদ্র এইভাবে এমন এক অবিভাজ্য সূক্ষ্ম অংশে এসে উপনীত হই যে তারপর তাকে আর ভাগ করা চলে না। এই ক্ষুদ্রতম সূক্ষ্ম জড় কণিকাগুলিই হল পরমাণু।

পরমাণুগুলি সৎ, নিত্য অনুমেয়, অবিভাজ্য এবং অকারণ

এই পরমাণুগুলি সৎ, নিত্য, অনুমেয়, অবিভাজ্য এবং অকারণ। পরমাণুগুলির সত্তা আছে ; একারণে, পরমাণুগুলি সৎ। এগুলি নিত্য, এগুলির কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। পরমাণু দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম অংশ। এগুলি নিরবয়ব, যেহেতু এগুলি আর বিভাজ্য নয়। পরমাণুই যাবতীয় যৌগিক পদার্থ, যেমন—ঘট, পট ইত্যাদির কারণ। কিন্তু যৌগিক পদার্থ পরমাণুর কারণ নয়, এজন্য পরমাণু হল অকারণ।

এই পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অনুমানের সাহায্যেই আমরা এগুলির অস্তিত্ব জ্ঞাত হই। এই অনুমান প্রক্রিয়া নিম্নরূপ ঃ এই জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ হল সাবয়ব অর্থাৎ অংশের সমষ্টি। যা

কিছু উৎপন্নশীল তার অংশ থাকবেই, কারণ কোন বস্তু সৃষ্ট করার অর্থই হল কতকগুলি অংশকে বিশেষ কোন পদ্ধতিতে সংযুক্ত করা। এখন এই অংশগুলিকে যদি আমরা ক্ষুদ্রতর অংশতে বিভক্ত করি এবং সেগুলিকে আরও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করি, তাহলে আমরা এমন একটি অবস্থায় এসে উপস্থিত হব যখন আর অংশগুলিকে বিভক্ত করা সম্ভব হবে না। এই অবস্থায় এসে আমরা কতকগুলি অবিভাজ্য নিরবয়ব অতি ক্ষুদ্র কণিকা পাব, যেগুলি সব যৌগিক পদার্থের মূল উপকরণ। এগুলিকেই পরমাণু (atoms) বলা হয়।

অনুমানের সাহায্যেই পরমাণুর অস্তিত্ব জানা যায়

এই পরমাণুগুলি নিত্য ; এই পরমাণুগুলি ঈশ্বরের সঙ্গে সহ-অবস্থানকারী। প্রশ্ন হল, এই পরমাণুগুলিকে নিত্য মনে করার কারণ কি ? এই পরমাণুগুলি নিত্য, যেহেতু এগুলির কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। পরমাণুর কোন উৎপত্তি নেই, যেহেতু কোন কিছু সৃষ্টি করার অর্থই হল কতকগুলি অংশকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা। পরমাণুর কোন বিনাশ নেই, যেহেতু কোন কিছুকে বিনষ্ট করার অর্থ হল যুক্ত-অংশগুলিকে বিযুক্ত করা। পরমাণুর কোন অংশ নেই, সেহেতু পরমাণুর যুক্ত অংশকে বিযুক্ত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং যেহেতু পরমাণুকে সৃষ্টি করা যায় না এবং বিনষ্টও করা যায় না সেহেতু পরমাণু অনিত্য।

পরমাণুর কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই, যেহেতু এরা নিত্য

পরমাণু হল জড়বস্তুর উপাদান বা সমবায়িকারণ। পরমাণু থেকেই যাবতীয় জড়বস্তুর সৃষ্টি। ঈশ্বর পরমাণুগুলির নিমিত্ত কারণ। পরমাণুগুলি নিষ্ক্রিয় এবং গতিহীন। ঈশ্বরই পরমাণুতে গতি সঞ্চার করে, পরমাণুগুলিকে গতিশীল করে তোলে।

পরমাণু সংখ্যায় বহু এবং পরস্পর ভিন্ন—প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে এমন এক বিশেষ পদার্থ আছে যার জন্য যে কোন একটি পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে পৃথক্। ক্ষিতি, জল, তেজ এবং বায়ু—এই চারটি দ্রব্যের অসংখ্য পরমাণু আছে। এই পরমাণুগুলির সংযোগের ফলেই জলীয়, বায়বীয় প্রভৃতি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি। আকাশের মাধ্যমেই

পরমাণু সংখ্যায় বহু এবং পরস্পর ভিন্ন

পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পরমাণুগুলির মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য না থাকলেও গুণগত পার্থক্য আছে।

বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের পরমাণুবাদ : উভয় মতবাদের এই সাদৃশ্য যে, উভয় দর্শনই স্বীকার করে যে, পরমাণু থেকেই জড়জগতের সৃষ্টি এবং পরমাণুগুলি অবিভাজ্য। এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু এগুলির সত্তা আছে। উভয়ের মতে পরমাণু সংখ্যায় অসংখ্য।

বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও পাশ্চাত্ত্য পরমাণু-বাদের মধ্যে সাদৃশ্য

উভয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত সাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও আছে। প্রথমতঃ, গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস এবং লিউকিপাসের মতে পরমাণুগুলির কোন গুণগত পার্থক্য নেই, কেবলমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য আছে। কোনটি ছোট, কোন্‌টি বড়, কোনটির ওজন বেশি, কোনটির কম, কোনটি সূক্ষ্ম, কোনটি সূক্ষ্ম নয়। কিন্তু কণাদ পরমাণুর গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেন। বিভিন্ন পরমাণুর বিভিন্ন গুণ আছে। যেমন—ক্ষিতির পরমাণুর গন্ধ আছে, বায়ুর পরমাণুর স্পর্শ, জলের রস এবং তেজের রূপ আছে।

বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও পাশ্চাত্ত্য পরমাণু-বাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য

দ্বিতীয়তঃ, ডিমোক্রাইটস এবং এপিকিউরাসের মতে পরমাণুগুলি স্বভাবতঃ সক্রিয়। কণাদের মতে পরমাণুগুলি স্বভাবতঃই নিষ্ক্রিয় এবং জীবাত্মার মধ্যে যে ধর্ম ও অধর্মের উৎপত্তি সেই অদৃষ্ট শক্তিই পরমাণুগুলিকে সক্রিয় করে তোলে। পরবর্তী বৈশেষিকগণের মতে ঈশ্বরই পরমাণুগুলিকে সক্রিয় করে তোলেন।

তৃতীয়তঃ, ডিমোক্রাইটস্‌ আত্মা এবং পরমাণুর প্রভেদ স্বীকার করেননি। তাঁর মতে আত্মা হল সূক্ষ্ম পরমাণুবিশেষ। কণাদ-এর মতে আত্মা পরমাণু থেকে পৃথক্‌। আত্মা এবং পরমাণু উভয়েরই এমন এক বিশেষ পদার্থ আছে যে, আত্মাকে পরমাণুতে বা পরমাণুকে আত্মায় পরিণত করা যায় না। আত্মা এবং পরমাণু উভয়েরই সমকালিক অস্তিত্ব আছে।

চতুর্থতঃ, ডিমোক্রাইটস জড়বাদী এবং যান্ত্রিকবাদী। তাঁর পরমাণুবাদ এই জড়বাদেরই একটি রূপ। ডিমোক্রাইটসের মতে পরিমাণ থেকেই গুণের আবির্ভাব। জড় অণুগুলির সংমিশ্রণ থেকেই চেতনা ও প্রাণশক্তির উদ্ভব।

বৈশেষিক মতে পরিমাণ থেকে গুণের আবির্ভাব হয় না। প্রত্যেক পরমাণুর এমন এক বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য পরমাণু থেকে সে পৃথক।

এ ছাড়া, ডিমোক্রাইটিস ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে পরমাণুগুলির আকস্মিক সংমিশ্রণ থেকেই জড়জগতের সৃষ্টি। জগতের কোন নিমিত্ত কারণ নেই, যেহেতু জগতে সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরেরর কোন অস্তিত্ব নেই। জড় পরমাণুদের পরিচালিত করার জন্য এবং তাদের সুবিন্যস্ত করার জন্য কোন বুদ্ধি বা চেতনার অস্তিত্ব ডিমোক্রাইটিস স্বীকার করেন না। উদ্দেশ্যহীন অন্ধ যান্ত্রিক নিয়মেই এ জগত পরিচালিত হয়। জগত নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন পরিচালক নেই।

বৈশেষিক দর্শন জড়বাদী দর্শন নয়। বস্তুতঃ, বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ তাদের অধ্যাত্ম দর্শনের একটি রূপ মাত্র। বৈশেষিকরা জগতের উদ্দেশ্যহীনতা অস্বীকার করে। জগতকর্তা ঈশ্বর, জীবের কর্মফলানুযায়ী যে অদৃষ্টশক্তি উৎপন্ন হয়, সেই শক্তি অনুসারে পরমাণুগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

ডিমোক্রাইটিসের মতে পরিমাণ থেকেই গুণের আবির্ভাব; জড় অণুগুলির সংমিশ্রণ থেকেই চেতনা ও প্রাণশক্তির উদ্ভব। বৈশেষিক মতে পরিমাণ থেকে গুণের আবির্ভাব হয় না। প্রত্যেক পরমাণুর এক বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য সে অন্য পরমাণু থেকে পৃথক।

ডিমোক্রাইটিস যেহেতু জড়বাদী, সেহেতু কোন নৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী নয়। কিন্তু বৈশেষিকরা জগতের নৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী।

সুতরাং বৈশেষিক পরমাণুবাদ এবং পাশ্চাত্য পরমাণুবাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

জৈন পরমাণুবাদের সঙ্গেও বৈশেষিক পরমাণুবাদের পার্থক্য আছে। জৈন এবং বৈশেষিক উভয়েই স্বীকার করে যে, পরমাণু অবিভাজ্য, নিত্য এবং জড়ভূতের অন্তিম উপাদান। কিন্তু উভয় মতবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। বৈশেষিকদের মতে ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণুগুলির ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে; যেমন—ক্ষিতির গন্ধ, বায়ুর স্পর্শ, জলের রস ইত্যাদি। সুতরাং পরমাণুগুলি সমজাতীয় নয়। কিন্তু জৈনদের মতে পরমাণুগুলি সমজাতীয়। নানারকম সংমিশ্রণের ফলেই এগুলি বিজাতীয় হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন ভূতে, যেমন—ক্ষিতি, জল, তেজ ইত্যাদিতে পরিণত হয়।

৫। আকাশঃ

আকাশ হল পঞ্চ ভূতের শেষ ভূত। আকাশ হল নিত্য, সর্বব্যাপী এবং অতীন্দ্রিয়। শব্দগুণ যাকে আশ্রয় করে থাকে, তাই হল আকাশ। আকাশ হল এক, বহু আকাশের কোন অস্তিত্ব নেই। ঘটের মধ্যে, গর্তের মধ্যে, গৃহের মধ্যে, আমাদের যে আকাশের প্রতীতি হয় সে আকাশ ক্ষুদ্র ও সসীম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকাশ একই। উপাধি (limiting condition) সংযুক্ত হওয়ার জন্যই এক আকাশ বহু বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু আকাশ অসীম ও অনন্ত। আকাশের কোন অংশ নেই, সেকারণে আকাশের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। আকাশ নিত্য ; ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুর মত আকাশের কোন পরমাণু নেই। আকাশ বিভু বা সর্বব্যাপী। আকাশের মহত্ব বা পরিমাণত্ব (dimension) সীমিত নয়। যে সব ভৌতিক বস্তুর অবান্তর মহত্ব (limited dimension) এবং গতি আছে, সে সব বস্তুর সঙ্গে আকাশ সংযুক্ত। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে হলে সেই বস্তুর দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন ; প্রথমতঃ—মহত্ব, দ্বিতীয়তঃ—উদ্ভূতরূপত্ব, অর্থাৎ বস্তুর সীমিত পরিসর এবং রূপ থাকা প্রয়োজন। আকাশের সীমিত পরিসর বা রূপ নেই। শব্দের সাহায্যেই আকাশের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। শব্দ আকাশের গুণ ও আকাশকে আশ্রয় করে থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা শব্দকে প্রত্যক্ষ করি। শব্দ ক্ষিতি, জল, তেজ এবং বায়ুর গুণ হতে পারে না, কারণ, এই সব ভৌতিক দ্রব্যের গুণগুলি আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি না। এমন কি সেই সব জায়গায় যেখানে উপরোক্ত দ্রব্যগুলির কোন অস্তিত্ব নেই সেখানেও শব্দ শোনা যায়। শব্দ দিক্‌, কাল, আত্মা এবং মনের গুণ হতে পারে না, যেহেতু শব্দ ছাড়াও এগুলির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় এবং এগুলির কোন বিশেষ গুণ নেই। সুতরাং এমন কোন দ্রব্য আছে যাকে শব্দ আশ্রয় করে থাকে ; সেই দ্রব্য হল আকাশ। আকাশের কোন সামান্যধর্ম

শব্দগুণ আকাশকে আশ্রয় করে থাকে

আকাশ নিত্য—এর উৎপত্তি বা বিনাশ নেই

আকাশের সীমিত পরিসর এবং রূপ না থাকার জন্য আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায় না

নেই ; রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ আকাশে নেই। আকাশ সমস্ত দিক পূর্ণ করে থাকে, যদিও আকাশ দিক্ নয়।

৬। দিক্ (Space) :

দিক্ হল এক, অখণ্ড এবং সর্বব্যাপী। দিক্ এক, বহু নয় ; কিন্তু উপাধি সংযুক্ত হওয়ার জন্যই এক দিক্ বহু দিক্ বলে প্রতিভাত হয়। দিক্ উপাধি সংযুক্ত হওয়াতে শূন্য স্থান এবং পূর্ণ স্থানের ধারণা হয়।

দিক্ প্রত্যক্ষের অগোচর। 'দূর', 'নিকট', 'পূর্ব', 'পশ্চিম' প্রভৃতির ধারণা বা অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দিকের অস্তিত্ব অনুমান করি। দিক থাকার জন্যই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থান সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি। দিক্ কোন জড় পদার্থ নয়, বরং জড় পদার্থই দিকে অবস্থান করে। দিক্ নিত্য ও শাশ্বত। যেহেতু দিক অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য সেহেতু দিকের কোন পরমাণু নেই এবং দিকের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই।

দূর, নিকট প্রভৃতি ধারণা থেকে দিক অনুমান করা হয়

৭। কাল (Time) :

দিকের মত কালও এক, অনন্ত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য। কাল এক, কিন্তু উপাধি সংযুক্ত হওয়ার জন্যই এক কালকে বহু বলে মনে হয়। ক্ষণ, মুহূর্ত, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর প্রভৃতি অখণ্ড কালের কল্পিত বিভাগ। কাল নিত্য, এর কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। কালকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কালের যথার্থ স্বরূপ আমাদের জানা নেই, তবে কালেতেই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। সুতরাং অনুমানের সাহায্যেই আমরা কালের অস্তিত্ব জানতে পারি। কাল হল জগতের আশ্রয়। সমস্ত পরিবর্তন কালেই ঘটে। সমস্ত অনিত্য পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশের কারণ হল কাল। তাছাড়া, জগতের সমস্ত অনিত্য বস্তুর পরিবর্তনের কারণও হল কাল। তবে বৌদ্ধগণ যেমন মনে করেন যে, কাল এবং পরিবর্তন অভিন্ন, তা নয়, কাল

কাল এক, উপাধি সংযুক্ত হওয়ার জন্য বহু বলে মনে হয়

অনিত্য পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশের কারণ হল কাল

অনন্ত এবং অসীম। এর আদিও নেই, অন্তও নেই। কাল জড়পদার্থ নয়, সেহেতু কাল অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য।

দিক বা দেশ বস্তুর সহ-অবস্থান নির্দেশ করে, আর কাল নির্দেশ করে বস্তুর পরিবর্তন বা ধারাবাহিকতা। কালের জন্যই বস্তুর গতি, দিকের জন্যই বস্তুর অবস্থান বা সহ-অবস্থান। কালের সম্বন্ধ হল নিত্য, দিকের সম্বন্ধ হল অনিত্য। আমরা অতীত থেকে ভবিষ্যতে যেতে পারি, ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে যেতে পারি না। কিন্তু আমরা উত্তর থেকে দক্ষিণে বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে, উভয় দিকেই যেতে পারি।

দিক ও কালের প্রভেদ

৮। আত্মা (Soul):

বৈশেষিকদের আত্মা সম্পর্কে ধারণা নৈয়ায়িকদের ধারণার অনুরূপ। আত্মা হল এক শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য; আত্মা হলো জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়। আত্মা দু'প্রকার—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। জীবাত্মা অসংখ্য, পরমাত্মা এক, পরমাত্মাই ঈশ্বর। পরমাত্মা জীবাত্মা থেকে পৃথক ও এই আত্মা শিবস্বরূপ, শুদ্ধাত্মা। পরমাত্মাই জগতের সৃষ্টিকর্তা। প্রত্যেক জীবে একটি করে আত্মার অধিষ্ঠান; সুতরাং আত্মা বিভু হলেও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা নিত্য ও আত্মার কোন বিনাশ নেই। জীবের দেহের যখন বিনাশ ঘটে, তখন জীবাত্মা অন্য দেহ ধারণ করে। (আত্মত্ব জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই ধর্ম; সেই এক ধর্মকে গ্রহণ করেই আত্মাকেও এক বলে গ্রহণ করা হয়েছে।)

আত্মা এক শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য

জীবাত্মা শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন

বেদান্তবাদীরা বলেন, আত্মা এক। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন মতে জীবাত্মা বহু, কেননা যদি জীবাত্মা এক হত, তাহলে একের সুখে সকলেই সুখ বোধ করত, একের দুঃখে সকলেই দুঃখ বোধ করত। জীবাত্মা এক হলে এই সংসারে জীবের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যে তারতম্য দেখা যায় তাকে ব্যাখ্যা করা যেত না। এক ব্যক্তি যখন সুখী, অন্য ব্যক্তি তখন দুঃখী, এ বৈষম্য আছেই এবং এ বৈষম্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই বৈষম্য ব্যাখ্যার জন্যও আত্মার অনেকত্ব স্বীকার করতে হয়।

আত্মাকে সাধারণ ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমানের সাহায্যেই আত্মার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি জীবাত্মার গুণ। এই গুণগুলিকে আমরা মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে সোজাসুজি জানতে পারি। প্রশ্ন হল—এই গুণগুলির আধার কি? যে স্থায়ী দ্রব্যকে আশ্রয় করে এই গুণগুলি বিদ্যমান থাকে, সেই দ্রব্য হল আত্মা। আত্মা হল নিত্য এবং চিরন্তন, এর কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল, কিন্তু এত পরিবর্তনের মাঝেও আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। সে কারণেই জীবের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও আমরা তাকে একই জীব বলে চিনতে পারি। আত্মার সাহায্যেই ব্যক্তি-অভেদ (personal identity) ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

অনুমানের সাহায্যেই আত্মার অস্তিত্ব জানা যায়

নৈয়ায়িকদের মত বৈশেষিকরাও মনে করে যে, আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, কিন্তু দেহের সংস্পর্শে এসেই আত্মা চেতনা লাভ করে। দেহহীন আত্মার কোন চেতনা সম্ভব নয়। জড়ের সঙ্গে আত্মার পার্থক্য এই যে, আত্মায় চৈতন্যের আবির্ভাব হতে পারে, কিন্তু জড়ে তা সম্ভব নয়। যেহেতু আত্মা স্বরূপতঃ নিগুর্ণ ও নিষ্ক্রিয়, সে কারণে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়, আগন্তুক গুণ। চেতনা হল এমন গুণ যা দেহস্থিত আত্মাকে আশ্রয় করে থাকে ; কিন্তু এই চেতনা দেহ, ইন্দ্রিয় বা মনের নিজস্ব গুণ নয়। আত্মার সঙ্গে দেহের সংযোগই আত্মার বদ্ধাবস্থা সূচিত করে। জীব আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পেরে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকেই আত্মা বলে ভুল করে ; এই জ্ঞানই হল মিথ্যা জ্ঞান। আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানই হল তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যেই মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং জীব মোক্ষলাভ করে। মোক্ষাবস্থা আত্মার এক চৈতন্যহীন অবস্থা।

আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন

প্রত্যেক জীবাত্মারই এমন একটি বিশেষ ধর্ম আছে যা তাকে অন্য আত্মা থেকে পৃথক করে। যেহেতু বৈশেষিকরা বহুবাদী, সেহেতু প্রতিটি আত্মাকেই নিত্য বলে স্বীকার করে। অদ্বৈত বেদান্ত মতে এক পরমাত্মা বিভিন্ন জীবাত্মার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ

প্রত্যেক জীবাত্মারই একটি বিশেষ ধর্ম আছে

করে বা সব জীবাত্মা এক পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত। নৈয়ায়িকরা এই মত স্বীকার করে না।[1]

৯। মন (Mind):

মনও আত্মার মত একটি নিত্য দ্রব্য। মন হল অন্তরিন্দ্রিয় এবং এই অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আত্মা সুখ, দুঃখ, দ্বেষ প্রভৃতি গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করে। বাহ্য-প্রত্যক্ষ এবং আন্তর-প্রত্যক্ষ, কোন প্রত্যক্ষই মন ছাড়া সম্ভব নয়। যদি আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্য-বস্তুর সংযোগ না ঘটে তবে আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং বাহ্য-বস্তুর অস্তিত্ব সত্বেও বাহ্য-প্রত্যক্ষণ সম্ভব হবে না। মন ছাড়া আন্তর প্রত্যক্ষণ সম্ভব হবে না, যেহেতু মনের মাধ্যমেই আত্মা নিজের গুণগুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে।

মন একটি নিত্য দ্রব্য। বাহ্য প্রত্যক্ষ এবং আন্তর প্রত্যক্ষ মন ছাড়া সম্ভব নয়

মন পরমাণুবিশেষ, সে কারণে মন অতি ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্ম পদার্থ। মনকে প্রত্যক্ষ-ভাবে জানা যায় না, তবে কতকগুলি বিষয়ের ভিত্তিতে আমরা মনের অস্তিত্ব অনুমান করি। নিম্নলিখিত কারণে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

মন পরমাণুবিশেষ

প্রথমতঃ, বাহ্য-বস্তুগুলিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য যেমন বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন ; তেমনি আত্মা, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। এই অন্তরিন্দ্রিয় হল মন। দ্বিতীয়তঃ, যদিও বিভিন্ন বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিভিন্ন বাহ্য-বস্তুর একই সময়ে সংযোগ ঘটে, তবু একই সময়ে সবগুলির প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপঃ একই সময়ে আমার সামনে একটি টেবিল আছে, পাশের ঘরে একটি গান হচ্ছে ও আমার গায়ে একটি জামা আছে। আমি একই সময়ে এর একটিমাত্র বিষয়কে প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং যার প্রতি আমি মনোযোগী হই কেবল সে বিষয়ই প্রত্যক্ষ করি। বিভিন্ন বিষয় প্রত্যক্ষ করতে হলে আমরা একে একে সেগুলি প্রত্যক্ষ করি। মনই এই প্রত্যক্ষণের ব্যাপারটিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং মন যুক্ত না হলে কোন ইন্দ্রিয়ের পক্ষে প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয় না। সুতরাং মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়।

মনের অস্তিত্বের প্রমাণ

1. আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ ন্যায়-দর্শনে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে, মন পরমাণু-বিশেষ, এর কোন অংশ নেই। মন যদি অংশযুক্ত কোন সত্তা হত তাহলে মনের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে একই সময়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটতে পারত এবং তার ফলে একই সময়ে মনে অনেকগুলি জ্ঞানের উৎপত্তি হত। কিন্তু যেহেতু তা হয় না, সেহেতু মন যে পরমাণুবিশেষ তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

মন যে পরমাণুবিশেষ, তার প্রমাণ

মন নিত্য, এর উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। প্রতি জীবের দেহকে আশ্রয় করে একটিমাত্র মনের অস্তিত্ব আছে। যদি প্রত্যেক শরীরে অনেক মন থাকত তাহলে একই সময়ে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান হত, কিন্তু তা হয় না। অন্যান্য দ্রব্যের ক্রিয়া করার শক্তি না থাকলেও মনের ক্রিয়া করার শক্তি আছে। মন গতিশীল এবং ক্ষিপ্রগামী। মনের এই ক্ষিপ্রগামিতার জন্যই আমরা মনে করি যে, একই সময়ে একাধিক বস্তুর উদ্দীপনা আমরা লাভ করেছি। প্রকৃতপক্ষে এই উদ্দীপনাগুলি যে ক্রমিক অর্থাৎ পরপর আসে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। অনেকগুলি পদ্মপাতাকে যদি পরপর রেখে শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করা হয়, তাহলে মনে হয় যে একই সময়ে সবগুলি পাতাকে বুঝি বিদ্ধ করা হল। কিন্তু আসলে কাজটি ক্রমশঃ সম্পন্ন হয়। একাধিক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন যুক্ত হলে মনে হয় সব ইন্দ্রিয়ের কাজ বুঝি একই সময়ে সম্পন্ন হচ্ছে। মনে করি একই সময়ে বই পড়ছি, গান শুনছি। কিন্তু বস্তুতঃ একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন আর একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়।

মন গতিশীল এবং ক্ষিপ্রগামী

১০। গুণ (Quality) ঃ

গুণ সব সময় দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। দ্রব্য ছাড়া গুণের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, দ্রব্যই হল গুণের আধার। যেমন 'মিষ্টত্ব' 'তিক্ততা' 'শুক্লত্ব', 'সুখ', 'দুঃখ' প্রভৃতি। মিষ্ট বস্তুকে আশ্রয় করেই মিষ্টত্ব বা শুক্ল দ্রব্যকে আশ্রয় করে শুক্লত্ব বিরাজ করে। সুখ দুঃখ প্রভৃতি আত্মারূপ দ্রব্যকে আশ্রয় করে বিদ্যমান থাকে। দ্রব্যের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। দ্রব্য যৌগিক পদার্থের সমবায়ীকারণ। গুণের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই এবং গুণ

গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে

কোন কিছুর সমবায়ীকারণ হতে পারে না। গুণ হল কোন যৌগিক পদার্থের অসমবায়ীকারণ, যা পদার্থের রূপ বা প্রকৃতি নির্ধারণ করে, কিন্তু তার অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না। যেমন, শুক্ল বস্ত্রখণ্ডের তন্তু হল দ্রব্য এবং তার সমবায়ীকারণ ; কিন্তু শুক্লত্ব হল গুণ, এটি অসমবায়ীকরণ। বস্ত্রখণ্ডের অস্তিত্ব শুক্লত্বের ওপর নির্ভর করে না, যদিও শুক্লত্বের সাহায্যে আমরা বস্ত্রটি কোন্ রঙের জানতে পারি। দ্রব্যে গুণ থাকে, কিন্তু গুণের কোন গুণ থাকে না, সে কারণে গুণকে অগুণবান বলা হয়েছে। গুণ গতিহীন এবং নিষ্ক্রিয়, গুণ সংযোগ ও বিভাগের কারণ নয়। কর্মই সংযোগ এবং বিভাগের কারণ। গুণ কর্ম থেকে পৃথক ; গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকলেও গুণ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ (an independent category)।

বৈশষিকদের মতে গুণ[1] চব্বিশ প্রকার। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম এবং শব্দ। কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে প্রথম সতেরোটি গুণের উল্লেখ করেছেন, পরে ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ শেষোক্ত সাতটি গুণ উপরোক্ত সতেরোটি গুণের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছেন। পরবর্তী কালে অন্যান্য বৈশেষিক দার্শনিকরা মোট চব্বিশটি গুণকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এক একটি গুণের আবার বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে। যেমন—রস ছয় প্রকার। কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, লবণ ও মধুর প্রভৃতি। গন্ধ দু প্রকার—সুরভি ও অসুরভি। স্পর্শ তিন প্রকার—উষ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত।

গুণ চব্বিশ প্রকার

গুণগুলির মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ যথাক্রমে তেজ, জল, ক্ষিতি আকাশ ও বায়ু—এই পঞ্চ ভূতের গুণ। এই গুণগুলি এক একটি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয়। যেমন—চক্ষুর দ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, জিহ্বার দ্বারা রস, নাসিকার সাহায্যে গন্ধ এবং ত্বকের সাহায্যে স্পর্শের প্রত্যক্ষণ হয়।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ—পাঁচটি পঞ্চ ভূতের গুণ

1. "দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগ বিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণ লক্ষণম্"—বৈশেষিক সূত্র। —যা দ্রব্যাশ্রয়ী, অগুণবান এবং সংযোগ বা বিভাগের প্রতি-নিরপেক্ষ কারণ নয়, তাকেই গুণলক্ষণ বলে।

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম প্রভৃতি গুণগুলি জীবাত্মাকে আশ্রয় করে থাকে। বুদ্ধি দু'প্রকার—অনুভূতি এবং স্মৃতি। অনুভূতি দু'প্রকার—প্রত্যক্ষ এবং অনুমিতি। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে। জীব শুভ কর্ম করলে ধর্মের উৎপত্তি ঘটে, সেই ধর্ম থেকে সুখ উৎপন্ন হয়। জীব অশুভ কর্ম করলে অধর্মের উৎপত্তি হয়, সেই অধর্ম থেকে দুঃখের উৎপত্তি। যে গুণ থেকে প্রবৃত্তির জন্ম তাকেই ইচ্ছা বলে। যে গুণের জন্য নিবৃত্তি ঘটে তাকেই দ্বেষ বলে। যে বিষয় থেকে জীবের দুঃখ পাবার আশংকা থাকে, তার প্রতি জীবের দ্বেষ জন্মায়। প্রযত্ন বা চেষ্টা তিন প্রকার—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং জীবনযোনি। প্রবৃত্তি হল কোন কিছুর প্রতি স্পৃহা, নিবৃত্তি হল কোন কিছু থেকে বিরতি, আর জীবনযোনি হল জীবন পোষক ক্রিয়া।

বুদ্ধি, সুখ প্রভৃতি গুণগুলি জীবাত্মাকে আশ্রয় করে থাকে

গুরুত্ব হল বস্তুর সেই গুণ যার জন্য বস্তু—নিচের দিকে পতিত হয়। দ্রবত্ব হল সেই গুণ যার জন্য কোন কোন বস্তু যেমন জল, দুধ প্রভৃতি বয়ে যায়। স্নেহ বা সংশক্তিশীলতা হল সেই গুণ যার জন্য চূর্ণ বস্তুগুলি পরস্পর সংলগ্ন হয়ে পিণ্ডের আকার ধারণ করে। এই গুণ কেবল জলেই থাকে।

গুরুত্ব এবং দ্রবত্ব

সংখ্যা হল বস্তুর সেই গুণ যার জন্য আমরা বস্তু গণনা করতে পারি। প্রত্যেক দ্রব্যেই সংখ্যা থাকে। পরিমাণ হল সেই গুণ যার সাহায্যে বস্তু ছোট কিংবা বড় নির্দ্ধারণ করা হয়। পরিমাণ চার প্রকার—অণু, হ্রস্ব, মহৎ এবং দীর্ঘ। পৃথকত্ব হল সেই গুণ যার সাহায্যে একটি দ্রব্যকে আর একটি দ্রব্য থেকে পৃথক করা যায়। যেমন, বাড়ী থেকে গাড়ী পৃথক।

সংখ্যা এবং পরিমাণ।

পরিমাণ—অণু, হ্রস্ব, মহৎ ও দীর্ঘ

যে দুই বা ততোধিক বস্তু স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে, তাদের মিলনকে সংযোগ বলে। যেমন, খাতার সঙ্গে কলমের যোগাযোগ। কার্য এবং কারণের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাকে সংযোগ বলা চলে না, যেহেতু কার্য এবং কারণের পরস্পর

"রূপ-রস-গন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমানানি পৃথকত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষো প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ"—বৈশেষিক সূত্র।

সম্বন্ধনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই। সংযোগ তিন প্রকার (১) যখন দুটি বস্তুর মধ্যে একটি গতিশীল হওয়ার জন্য সংযোগ ঘটে ; যেমন, পাখী আর গাছ। পাখীটি উড়ে গিয়ে গাছে বসার জন্য এই সংযোগ ঘটে। (২) উভয় বস্তুই গতিশীল হওয়ার জন্য যখন সংযোগ ঘটে—দুজন কুস্তিগির মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য যখন উভয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটে। (৩) যখন যে কোন দুটি বস্তু তৃতীয় কোন বস্তুর মাধ্যমে যুক্ত হয় ; যেমন, লাঠি দিয়ে কেউ কোন টেবিলকে স্পর্শ করলে, লাঠির মাধ্যমে তার সঙ্গে টেবিলের সংযোগ ঘটে। বিভাগ সংযোগের বিপরীত গুণ। দুটি যুক্ত বস্তুর বিচ্ছিন্নতারূপ গুণই হল বিভাগ। সংযোগের মত বিভাগও তিন প্রকার। পাখীটি গাছ থেকে উড়ে চলে গেলে পাখী ও গাছের বিভাগ হয়। কুস্তিগির দুজন যখন মল্লযুদ্ধ থেকে বিরত হয় তখন তাদের পূর্ব সংযোগ নষ্ট হয়ে উভয়ের মধ্যে বিভাগ হয়। যখন কেউ যে লাঠি দিয়ে টেবিল ছুঁয়ে ছিল সেটা ছেড়ে দেয় তখন তার সঙ্গে টেবিলের বিভাগ হয়।

সংযোগ ও বিভাগ

বিভাগও তিন প্রকার

পরত্ব এবং অপরত্ব হল সেই গুণ যার সাহায্যে আমরা 'দূর বা জ্যেষ্ঠ' এবং 'নিকট বা কনিষ্ঠ' এই ধারণাগুলি ব্যবহার করে থাকি। পরত্ব এবং অপরত্ব দু'প্রকার—দেশগত এবং কালগত। দেশগত, যেমন এই বস্তুটি কাছে, ঐ বস্তুটি দূরে। কালগত, এই বালকটি জ্যেষ্ঠ, ঐ বালকটি কনিষ্ঠ ; বা এটি নতুন, ওটি পুরনো ইত্যাদি।

পরত্ব ও অপরত্ব দুপ্রকার : দেশগত এবং কালগত

সংস্কার তিন প্রকার—বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা। বেগ যে কোন বস্তুকে গতিশীল করে রাখে। ক্ষিতি, জল তেজ, বায়ু ও মনে বেগ থাকে। স্থিতিস্থাপক হল সেই গুণ যার জন্য কোন বস্তুকে প্রসারিত বা সংনমিত করার পরও বস্তুটি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। স্থিতিস্থাপকতার জন্যই ধনুক থেকে বাণটি নিক্ষিপ্ত হলেই ছিলাটি আবার পূর্বাবস্থায় ফিসে আসে। ভাবনা হল অবচেতন মনে সঞ্চিত সংস্কার যার জন্য আমরা পূর্বানুভূত বস্তুকে স্মরণ করতে পারি।

সংস্কার তিন প্রকার—বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা

ধর্ম এবং অধর্ম বলতে আমরা যথাক্রমে পুণ্য এবং পাপকেই বুঝে থাকি। শাস্ত্রবিহিত কাজ করার ফলে ধর্ম এবং শাস্ত্র নিষিদ্ধ কাজ করার ফলে অধর্মের উৎপত্তি হয়। ধর্ম সুখের কারণ, অধর্ম দুঃখের কারণ।

ধর্ম এবং অধর্ম

বৈশেষিকদের মতে গুণ হল দ্রব্যের মৌলিক এবং নিষ্ক্রিয় গুণ। পূর্বে যে সব গুণের কথা উল্লেখ করা হল তার মধ্যে কতকগুলি গুণ নিত্য এবং কতকগুলি অনিত্য। সে গুণগুলিই নিত্য, যেগুলি নিত্য বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে, যেমন নিত্য দ্রব্যের একত্ব সংখ্যা নিত্য, এবং অন্যান্য সমস্ত সংখ্যাই অনিত্য যেহেতু তারা অনিত্য বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে। নিত্য দ্রব্যের পরিমাণ নিত্য এবং অনিত্য দ্রব্যের পরিমাণ অনিত্য।

১১। কর্ম (Action) :

কর্ম বা ক্রিয়া হলো জড়পদার্থের গতি। গুণ যেমন কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে বিরাজ করে, কর্মও অনুরূপভাবে কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে বিরাজ করে। তবে কর্ম ও গুণের মধ্যে প্রভেদ আছে। গুণ হলো স্থিতিশীল ও নিষ্ক্রিয়, কর্ম হলো গতিশীল ও সক্রিয়। গুণ নিষ্ক্রিয় সেহেতু কোন বস্তুর গুণ সে বস্তু থেকে আর একটি বস্তুতে আমাদের নিয়ে যায় না, কিন্তু কর্ম হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে একটি বস্তু আর একটি বস্তুর কাছে বা তার থেকে দূরে যেতে পারে। গুণ হলো স্থায়ী, কর্ম হলো ক্ষণিক। কর্ম মাত্র পাঁচটি মুহূর্ত স্থায়ী হয়।

কর্ম হল জড়পদার্থের গতি

কণাদ কর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, যা কোন একটি দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে, অথচ গুণ নয় এবং সংযোগ ও বিভাগের যা প্রত্যক্ষ কারণ তাকেই কর্ম বলে[1]। যেমন, একটি গোলকের গতি গোলককে আশ্রয় করে থাকে, অথচ তা গোলকের কোন গুণ নয়। গোলকটি বাড়ীর ছাদে ছিল, গতির ফলে সেখানে থেকে সেটি মাটিতে এসে পড়ল, অর্থাৎ মাটির সঙ্গে তার সংযোগ হল। কর্ম বা গতি হল সংযোগ ও বিভাগের অসমবায়ি কারণ। সংযোগ, বিভাগ ও বেগের সামান্য কারণ হলো কর্ম। কর্ম দ্রব্যের কারণ নয়। যেমন, মৃত্তিকার সংযোগে

কর্মের সংজ্ঞা

1. "একদ্রব্যমগুণং সংযোগ বিভাগেষ্বনাপেক্ষ কারণমিতি কর্ম লক্ষণং"—বৈশেষিক সূত্র।

ঘট উৎপন্ন হয়, তাদের সংযোগ বিনাশে ঘট বিনষ্ট হয়। কিন্তু কর্ম সংযোগ ও বিভাগের কারণ হলেও ঘটের কারণ নয়। সব কর্মই সীমিত ও মূর্ত দ্রব্যকে আশ্রয় করে অবস্থান করে, যেমন—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু এবং মন। কিন্তু আকাশ, দিক, কাল এবং আত্মা হলো বিভু বা সর্বপরিব্যাপ্ত, ফলে তাদের স্থান পরিবর্তন হয় না। সুতরাং তাদের গতি বা কর্মের প্রশ্ন ওঠে না।

আকাশ, দিক, কাল এবং আত্মার কোন কর্ম নেই

কর্ম পাঁচ প্রকার; যথা—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন[1]। বস্তুকে ঊর্ধে নিক্ষেপ করাকে উৎক্ষেপণ বলা হয়। উর্ধদেশের সঙ্গে বস্তুর সংযোগের কারণ হলো উৎক্ষেপণ, যেমন, ওপর দিকে একটি ঢিল ছুঁড়ে দেওয়া। নিম্নে বস্তুকে নিক্ষেপ করাকে অবক্ষেপণ বলে। নিম্নদেশের সঙ্গে বস্তুর সংযোগের কারণ হল অবক্ষেপণ। কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশের সংকোচ সাধনকেই আকুঞ্চন বলে। যেমন, হাতের আঙ্গুল সংকুচিত করে হাত মুষ্টিবদ্ধ করা। প্রসারণ আকুঞ্চনের বিপরীত প্রক্রিয়া। যে কর্মের ফলে বস্তুর বিভিন্ন অংশের নিবিড় সংযোগ নষ্ট হয়ে যায় তাকেই প্রসারণ বলে। যেমন, মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙ্গুলগুলিকে হাত খুলে দিয়ে মেলে দেওয়া। উপরোক্ত কর্ম ছাড়া আর সব কর্মই হলো গমন—গমন হলো বস্তুর স্থান পরিবর্তন। ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন (evacuation) উর্ধজ্বলন, তির্য্যগ্‌গমন প্রভৃতি গমনের প্রকারভেদ। কঠিন বস্তুর নিঃসরণের নাম রেচন, জলীয় বস্তুর নিঃসরণের নাম স্যন্দন। দীপশিখার উর্ধজ্বলন এবং বায়ুর তির্যগ্‌গতি অতি পরিচিত ব্যাপার।

কর্ম পাঁচ প্রকার

কর্ম প্রত্যক্ষের বিষয়, কিন্তু সবরকম কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মন প্রত্যক্ষ দ্রব্য নয়, সেহেতু মনের কর্ম লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। পার্থিব, জলীয়, বায়বীয় প্রভৃতি দ্রব্যের কর্মকেই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। সুতরাং দ্রব্য প্রত্যক্ষ হলে তার কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়, দ্রব্য অপ্রত্যক্ষ হলে তার কর্ম প্রত্যক্ষ করা যায় না। কর্ম অনিত্য, যেহেতু কর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে সেহেতুই কর্ম অনিত্য।

কর্ম প্রত্যক্ষের বিষয় হলেও সবরকম কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না

1. উৎক্ষেপণমব ক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্মাণি—বৈশেষিক সূত্র।

১২। সামান্য (Generality) ঃ

যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সমভাবে বর্তমান থাকে, তাকে সামান্য বলে

একই শ্রেণীর বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে নানারকম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা তাদের একই নামে অভিহিত করি। এর হেতু তাদের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই বৈশিষ্ট্য শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্যই পরস্পর পৃথক বস্তুর সম্পর্কে সমতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যকেই 'সামান্য' বলা হয়। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যাকে আমরা universal বলি, সামান্য তারই অনুরূপ। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে, তবু আমরা সকলকেই মানুষ নামে অভিহিত করি কেন? তার কারণ মনুষ্যত্ব এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য সকল মানুষের মধ্যেই বর্তমান, যার জন্যে সব মানুষই মনুষ্য পদবাচ্য।

'সামান্য' বা জাতিধর্ম সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়। বৌদ্ধগণের মতে সামান্যের কোন অস্তিত্ব নেই। কেবলমাত্র স্ব-লক্ষণেরই অস্তিত্ব আছে। প্রত্যেক পদার্থেরই নিজস্ব লক্ষণ আছে এবং সেহেতু প্রত্যেক পদার্থ অন্য পদার্থ থেকে ভিন্ন। তাঁদের মতে একই নামে অভিহিত করা হয় বলেই, বিভিন্ন বস্তু পৃথক হওয়া সত্ত্বেও, তাদের সমতাজ্ঞানের ভাব আমাদের মনে জাগরিত হয়। সামান্য হল নাম, আসলে সামান্যের কোন বস্তু বা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সত্তা নেই। এই নাম নঞর্থক লক্ষনার্থ সূচক। কোন শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন বস্তুকে একই নামে অভিহিত করার অর্থ হল সেই বস্তুগুলিকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করা। সব গরুকেই আমরা গরু'নামে অভিহিত করি। তার কারণ এই নয় যে সব গরুতে কোন সমতা আছে ; এর কারণ সব গরুই অন্য প্রাণী, যেমন কুকুর, ছাগল, বাঘ প্রভৃতি থেকে পৃথক।

জৈন এবং অদ্বৈত বেদান্ত মতে সামান্য হল একটি সাধারণ বা সার্বভৌম ধারণা (a general idea or concept)। সার্বভৌম ধারণা বলতে বুঝি বস্তুর মধ্যে অবস্থিত যে সাধারণ ও অনিবার্য গুণ। পৃথক পৃথক মানুষেরই সত্তা আছে, মনুষ্যত্বের কোন সত্তা নেই। কিন্তু সব মানুষের মধ্যে দুটি সাধারণ ও অনিবার্য গুণ আছে, জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি ; সামান্য ধারণা এই গুণ দুটিরই নির্দেশ করে মাত্র।

ন্যায় বৈশেষিকরা বস্তুবাদী, সেহেতু সামান্য সম্পর্কে তাদের মতবাদ বস্তুবাদীদেরই মতবাদের অনুরূপ। তাদের মতে সামান্য হল নিত্য পদার্থ।

দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, যেমন, মানুষের জন্ম ও মৃত্যু আছে। কিন্তু সামান্য, এক্ষেত্রে দ্রব্যত্ব এবং মনুষ্যত্ব হল নিত্য, এর কোন বিনাশ নেই।

সামান্য সম্পর্কে ন্যায় বৈশেষিক মতবাদ

সামান্য অনেকানুগত। যদিও সামান্য বহু ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান, তবু সামান্যের ব্যক্তি বা বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা আছে। একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে[1] এই সামান্য বিদ্যমান থাকে বলে আমরা তাদের এক শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। বিভিন্ন বস্তুর সমতাজ্ঞানের মূলেও এই সামান্য বর্তমান।

সামান্যের সঙ্গে বস্তুর সমবায় সম্বন্ধ

সামান্যের সঙ্গে বস্তুর সমবায় সম্বন্ধ। প্রত্যেক শ্রেণীর একটি করেই সামান্য আছে। সামান্যের কোন সামান্য থাকতে পারে না। মনুষ্যত্বের কোন মনুষ্যত্ব নেই, দ্রব্যত্বের কোন দ্রব্যত্ব নেই। সামান্যের যদি সামান্য থাকে, তাহলে তার আবার সামান্য থাকবে। এইভাবে অনবস্থা দোষের (Fallacy of Infinite Regress) উদ্ভব ঘটবে। একই শ্রেণীর যদি একাধিক সামান্য থাকে তাহলে এই সামান্য পরস্পর বিপরীত বা বিরুদ্ধ প্রকৃতির হওয়ার জন্য শ্রেণীবিভাগ সম্ভব হবে না। সামান্যের আর এক নাম জাতি। মনুষ্যত্ব হল জাতি, অন্ধত্ব হল উপাধি। জাতি ও উপাধির মধ্যে পার্থক্য আছে। জাতি নিত্য, উপাধি অনিত্য। জাতি হল স্বাভাবিক, উপাধি হল কৃত্রিম। অন্ধত্বকে জাতি বা শ্রেণীরূপে গণ্য করলে অন্ধ ব্যক্তি, অন্ধ গরু, অন্ধ ঘোড়া সব একই শ্রেণীভুক্ত হবে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম—এই তিন পদার্থের জাতি থাকে, অন্য পদার্থের জাতি নেই। এই তিন পদার্থের যে জাতি আছে, তার নাম সত্তা।

সামান্য ও উপাধির পার্থক্য

সামান্যের শ্রেণীবিভাগ ঃ ব্যাপকতা অনুসারে সামান্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—(১) পর, (২) অপর এবং (৩) পরাপর। 'পর' হল সব চেয়ে

1. কোন কোন আধুনিক বস্তুবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিক যেমন, বার্ট্র্যাণ্ড রাসেল সামান্য ধর্মের কোন সত্তা স্বীকার করেননি। তাঁর মতে সামান্যের সত্তা (existence) নেই, তার অবস্থিতি (subsistence) আছে। সত্তার দেশ ও কালে অবস্থিতি থাকে। কিন্তু সামান্যের অবস্থিতি দ্রব্য, গুণ ও কর্মে।

এই দার্শনিকদের মতে সামান্য এমন একটা কালাতীত নিত্য বিষয় যা বহু ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

অধিক ব্যাপক, 'অপর' হল সবচেয়ে কম ব্যাপক এবং পরাপর হল এই উভয়ের মধ্যবর্তী।

যে জাতি সবচেয়ে ব্যাপক, যাকে অন্য কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, তাকেই পর-সামান্য (Sumnum genus) বলে। সত্তা (Beinghood) হল পরসামান্য কারণ এ সবচেয়ে অধিক ব্যাপক। অন্যান্য সামান্য এই সামান্যে থাকবেই। সত্তা হল খাঁটি সামান্য।

সামান্য তিন প্রকার—পর, অপর এবং পরস্পর

সবচেয়ে কম ব্যাপক যে জাতি, যার অন্তর্ভুক্ত আর জাতি হয় না তাকে অপর সামান্য বলে। যেমন—ঘটত্ব; এর চেয়ে কম ব্যাপক কোন শ্রেণী হতে পারে না।

দ্রব্যত্বের সামান্য উপরোক্ত সামান্যের মধ্যবর্তী—সেজন্য একে বলা হয় পরাপর সামান্য। যে কোন পরাপর সামান্যকে আবার অন্য সামান্যের তুলনায় 'পর' বা 'অপর' বলা হয়। যেমন—ঘট, চেয়ার, টেবিল, বই, কলম সবই দ্রব্য, সেহেতু দ্রব্যত্ব হল পর। আবার, দ্রব্যত্ব সত্তার তুলনায় অপর।

১৩। বিশেষ (Particularity):

'বিশেষ' কথাটি থেকেই বৈশেষিক নামের উৎপত্তি। বিশেষ হল সামান্যের সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ। অংশহীন নিত্য দ্রব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল বিশেষ। পদার্থকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—নিত্য ও অনিত্য। যার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, তাকেই নিত্য পদার্থ বলা হয়; এর বিপরীতধর্মী পদার্থকেই অনিত্য পদার্থ বলা হয়। অনিত্য পদার্থের যেমন—ঘট, পট প্রভৃতির কোন বিশেষ নেই। বিভিন্ন পরমাণুর সংযোগে যে সব যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলি নিজ নিজ অবয়বের জন্যই পরস্পর ভিন্ন বলে স্বীকৃত হয়। তাছাড়া, যেহেতু অংশের সংযোগে এগুলি গঠিত অংশের পার্থক্যের সাহায্যেই এগুলিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পরমাণুগুলি নিজেরাই ভিন্ন বা পৃথক, এবং ভিন্ন পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন পদার্থও পৃথক।

অংশহীন নিত্য দ্রব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল বিশেষ

অনিত্য পদার্থের বিশেষ নেই

নিত্য পদার্থেই বিশেষের অধিষ্ঠান। আকাশ, দিক, কাল, মন এবং আত্মা, ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ুর যে পরমাণু—এগুলি নিত্য এবং এগুলির প্রত্যেকরই একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে যার সাহায্যে এদের প্রত্যেককে পৃথক অস্তিত্ববিশিষ্ট বলে জানা যায়। যেমন, একটি আত্মা অন্য আত্মা থেকে পৃথক, একটি মন অন্য মন থেকে পৃথক। যদি এই পার্থক্য না থাকত তাহলে পৃথিবীতে একটি আত্মা বা মনকে অপর আত্মা বা মন থেকে পৃথক করা যেত না। প্রত্যেকটি আত্মার মধ্যে এমন এক বিশেষ পদার্থ আছে যার জন্য সে-আত্মা অন্য আত্মা থেকে পৃথক। এই বিশেষ বৃত্তি থাকার জন্য আমরা একাধিক নিত্য দ্রব্যের কথা বলতে পারছি, নতুবা আত্মা, মন, দিক, কাল এগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক করা সম্ভব হত না। তেমনি একটি পরমাণু আর একটি পরমাণু থেকে পৃথক। গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রাইটিসের মতে পরমাণুগুলির মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য আছে কিন্তু প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই। বৈশেষিকদের মতে প্রতিটি পরমাণুর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যে কারণে একটি পরমাণু অপর একটি পরমাণু থেকে পৃথক। পরমাণুগুলি অংশহীন। সুতরাং কোন অবয়ব না থাকার জন্য এগুলিকে সাধারণভাবে পৃথক বলে স্বীকার করা যেতে পারে না। বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকার জন্যই জলের একটি পরমাণুকে জলের আর একটি পরমাণু থেকে পৃথক করা যায়।

নিত্য পদার্থে বিশেষের অধিষ্ঠান

প্রতিটি পরমাণুতে এক একটি বিশেষ আছে। ক্ষিতির পরমাণুগুলি সবই যদি সমান হয় তাহলে এই সমান পরমাণু থেকে বিবিধ প্রকার পার্থিব বস্তু উৎপন্ন হচ্ছে কেন? একজাতীয় বস্তু উৎপন্ন হয় না কেন? একই গাছের বিভিন্ন ফল; একপ্রকার পরমাণু থেকেই যদি তাদের উৎপত্তি হয়, তাহলে সব ফল ঠিক এক নয় কেন? প্রতিটি ফলের রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে; এর কারণ কি? মহর্ষি কণাদের মতে প্রত্যেকটি পরমাণুতে একটি বিশেষ থাকে। সেই বিশেষ প্রতিটি পরমাণুকে অন্য পরমাণু থেকে পৃথক করে। সুতরাং সেই বিশেষের জন্য ক্ষিতি পরমাণু থেকেই বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হয়।

প্রতিটি পরমাণুতে এক একটি বিশেষ আছে

নিত্য দ্রব্যের মধ্যে অধিষ্ঠান বলে, বিশেষও নিত্য পদার্থ। নিত্য দ্রব্যের সংখ্যা অসংখ্য ; সেকারণে বিশেষের সংখ্যাও অসংখ্য, অসংখ্যা আত্মা আছে, প্রতিটি আত্মায় একটি করে বিশেষ আছে। বিশেষ সামান্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সামান্য বহু দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে, বিশেষ কেবলমাত্র একটি নিত্য দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে।

বিশেষকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। পরমাণু যেমন অতীন্দ্রিয় বস্তু, বিশেষও তেমনি অতীন্দ্রিয় বস্তু। নিত্য পদার্থের সঙ্গে বিশেষের সমবায় সম্বন্ধ। বিশেষের কোন বিশেষ নেই। যদি বিশেষের বিশেষ কল্পনা করা হয় তাহলে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। বিশেষ যদিও একটি নিত্য দ্রব্যকে অন্য নিত্য দ্রব্য থেকে পৃথক করে, নিজেদের পরস্পর থেকে পৃথক করার জন্য বিশেষের কোন বিশেষের প্রয়োজন হয় না।

বিশেষকে প্রত্যক্ষ করা যায় না

সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত এবং মীমাংসা বিশেষকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার করে না।

১৪। সমবায় (Inherence) :

দুটি পদার্থ যখন এমন এক অবিচ্ছেদ্য ও নিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ যুক্ত হয় যে, পদার্থ দুটির মধ্যে একটি আর একটিতে থাকে, তখন ঐ সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলে।

দুটি পদার্থের নিত্য সম্বন্ধকে সমবায় বলে

ন্যায়-বৈশেষিকরা দু' প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করে—সংযোগ ও সমবায়। যে দুটি বস্তু সাধারণতঃ পৃথকভাবে থাকে, তাদের মধ্যে যে অনিত্য সম্বন্ধ তাকেই সম্বন্ধ বলে। ঘরের ছাদের ওপর থেকে পাখীটা উড়ে এসে যখন গাছের ওপর বসল, তখন গাছের সঙ্গে পাখীর সংযোগ হল। এই সংযোগ নিত্য বা স্থায়ী নয়, কেননা পাখীটি গাছের ওপর থেকে উড়ে চলে গেলে উভয়ের মধ্যে সংযোগ আবার বিনষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং এ সম্বন্ধ হল সাময়িক। যতক্ষণ দুটি বস্তুর মধ্যে সংযোগ চলতে থাকে ততক্ষণ এই সংযোগ বস্তুর গুণরূপেই বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে। বস্তুর সত্তা

সম্বন্ধ দু'প্রকার—সংযোগ ও সমবায়

সংযোগের ওপর নির্ভর করে না। গাছ ও পাখীর মধ্যে যে সংযোগ সম্বন্ধ স্থাপিত হল, সেই সম্বন্ধের ওপর গাছ ও পাখীর সত্তা নির্ভর করে না। এই সম্বন্ধ হবার পূর্বেও উভয়ের অস্তিত্ব ছিল। দুটি বস্তুর একটিকে যদি আর একটি থেকে পৃথক করা যায়, তাহলে তাদের বলা হয় যুথসিদ্ধ। আর যদি একটিকে আর একটি থেকে পৃথক করা না যায় তাদের বলা হয় অযুথসিদ্ধ। যুথসিদ্ধ বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধকে সংযোগ বলা হয় এবং অযুথসিদ্ধ বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয়। সুতরাং সংযোগ হল বাহ্য সম্বন্ধ, বস্তুর আগন্তুক গুণ।

বস্তুর সত্তা সংযোগের ওপর নির্ভর করে না

সংযোগ সম্বন্ধ হল অনিত্য ও বাহ্য সম্বন্ধ। কিন্তু সমবায় হল নিত্য বা স্থায়ী সম্বন্ধ। দুটি বিষয়ের সমবায় সম্বন্ধে একটি আর একটিতে থাকে। কিন্তু সমবায় হল নিত্য বা স্থায়ী সম্বন্ধ, যেমন—অবয়বের সঙ্গে অবয়বীয়, দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সম্বন্ধ, সূত্রের সঙ্গে বস্ত্রের সম্বন্ধ। রাধাকৃষ্ণনের মতে সংযোগ হল বাহ্য সম্বন্ধ, আর সমবায় হল আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ।

সংযোগ অনিত্য, সমবায় নিত্য ; সংযোগ অস্থায়ী সম্বন্ধ, সমবায় স্থায়ী সম্বন্ধ

সমবায় সম্বন্ধকে কিন্তু আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ বলা যেতে পারে না। আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত বস্তু দুটি পরস্পরের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সমগ্রের সঙ্গে অংশের বা সূত্রের সঙ্গে বস্ত্রের সম্বন্ধ পারস্পরিক নির্ভরতার সম্বন্ধ নয়—সমগ্র অংশের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু অংশ সব সময় সমগ্রের ওপর নির্ভর করে না। গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না, কিন্তু গুণ ছাড়া দ্রব্য থাকতে পারে। জাতি ছাড়া ব্যক্তি থাকতে পারে না, কিন্তু ব্যক্তি ছাড়া জাতি থাকতে পারে। সুতরাং সমবায় সম্বন্ধকে নিত্য সম্বন্ধ এবং অনিবার্য সম্বন্ধ বলা যেতে পারে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ বলা যেতে পারে না। দার্শনিক হিরিয়ানা (Hiriyanna) সমবায়-সম্বন্ধকে বাহ্য-সম্বন্ধরূপেই গণ্য করার পক্ষপাতী।

সমবায় সম্বন্ধকে আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ বলা চলে না

দার্শনিক শংকর বৈশেষিকদের সমবায় পদার্থের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর মতে সমবায় তাদাত্ম্যের সঙ্গে অভিন্ন।

১৫। অভাব (Non-existence):

ইতিপূর্বে আমরা যে ছ'টি পদার্থের আলোচনা করেছি সেগুলি হল ভাব-পদার্থ (Positive categories)। অভাব হল নঞর্থক পদার্থ (Negative category)। 'অভাব' মানে যার অস্তিত্ব নেই। অভাব পদার্থকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। টেবিলের ওপর বইটি আছে, এ যেমন সত্য, টেবিলের ওপর কলমটি যে নেই তাও সত্য। পুষ্পহীন বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে বৃক্ষের পত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিত হই, পুষ্পের অভাব সম্পর্কেও তেমনি নিশ্চিত হই। এই কারণে বৈশেষিকরা অভাবকে সপ্তম পদার্থরূপে স্বীকার করেন। মহর্ষি কণাদ অবশ্য তাঁর বৈশেষিক সূত্রে অভাবকে পদার্থরূপে উল্লেখ করেননি। কিন্তু বৈশেষিক সূত্রে অভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকার জন্য পরবর্তী বৈশেষিকগণ, বিশেষ করে ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ, অভাবকে সপ্তম পদার্থরূপে উল্লেখ করেছেন।

অভাব পদার্থকে অস্বীকার করা চলে না

অভাবের শ্রেণীবিভাগ: অভাব দু'প্রকারের—সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব বলতে কোন কিছুতে অন্য কোন কিছুর অভাব বোঝায়। অন্যোন্যাভাব বলতে বোঝায় যে একটি বস্তু আর একটি বস্তু নয়।

অভাব দু'প্রকার—সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব

সংসর্গাভাব তিন প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব এবং অত্যান্তাভাব।

প্রাগভাব: উৎপন্ন হবার পূর্বে বস্তুর যে অভাব থাকে এবং উৎপন্ন হলে যা থাকে না তাকে প্রাগভাব বলে। প্রাগভাবের উৎপত্তি নেই, ধ্বংস আছে, সে কারণে প্রাগভাব অনাদি, কিন্তু শান্ত। মাটি দিয়ে মূর্তি তৈরী করার পূর্বে মাটিতে মূর্তির অভাব রয়েছে। মাটিতে মূর্তির এই অভাবকে বা অস্তিত্বহীনতাকেই প্রাগভাব বলা হবে। মাটি এবং মাটির দ্বারা তৈরী যে মূর্তি উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের অভাব রয়েছে। মূর্তিটির তৈরী হবার পূর্ব পর্যন্ত এর কোন অস্তিত্ব নেই, সেহেতু এর অভাবের কোন আদি বা শুরু নেই, এ হল অনাদি। কিন্তু যখনই মূর্তিটি তৈরী হল, তখনই তার প্রাগভাবের বিনাশ হল। সুতরাং এর অন্ত আছে।

প্রাগভাব

ধ্বংসাভাবঃ কোন বস্তু উৎপন্ন হবার পর ধ্বংস বা বিনষ্ট হলে বস্তুটির যে অভাব তাকে ধ্বংসাভাব বলে। ঘট ভেঙে গেলে ঘটের ধ্বংসাভাব হল, কারণ ঘটের ভাঙা টুক্‌রোগুলিতে আর ঘটের অস্তিত্ব নেই। পূর্ব থেকে যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, ধ্বংস হওয়ার জন্য সে বস্তুর অস্তিত্বের অভাবই হল ধ্বংসাভাব।

ধ্বংসাভাব

ধ্বংসাভাবের উৎপত্তি আছে, কিন্তু বিনাশ নেই। অর্থাৎ এর আদি আছে, অন্ত নেই। কারণ যে ঘট ধ্বংস হয়ে গেছে তার আবার ধ্বংস কি ভাবে হতে পারে? ভাব পদার্থের ক্ষেত্রে নিয়ম হল যার উৎপত্তি আছে, তারই বিনাশ আছে, কিন্তু অভাব পদার্থের ক্ষেত্রে নিয়ম হল যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশ নেই। ধ্বংসের দ্বারা যে বস্তুর অভাব উৎপন্ন হল, সেই অভাবকে ত কোনমতেই ধ্বংস করা যায় না; কেননা ভাঙা ঘটকে আবার অস্তিত্বশীল করে তোলা যেতে পারে না।

অত্যান্তাভাবঃ যখন দুটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধের অভাব সকল সময়েই বর্তমান থাকে, তখন এই সম্বন্ধের অভাবকেই অত্যান্তাভাব বলে। অতীত, বর্তমান

অত্যান্তাভাব

এবং ভবিষ্যৎ—এই তিন কালেই দুটি বস্তুর সম্বন্ধের অভাবই অত্যান্তাভাব। বায়ুতে রূপের অভাব, ঘটে চেতনার অভাব হল অত্যান্তাভাব—যেহেতু এই অভাব ত্রৈকালিক, সেহেতু এই অভাবের উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। সুতরাং অত্যান্তাভাব হল অনাদি এবং অনন্ত।

অন্যোন্যাভাবঃ দুটি বস্তুর সম্বন্ধের অভাব হল সংসর্গাভাব, দুটি বস্তুর পারস্পরিক ভেদ হল অন্যোন্যাভাব। যেমন—ঘট কাপড় নয়। ঘটের সঙ্গে

দুটি বস্তুর পারস্পরিক ভেদ হল অন্যোন্যাভাব

কাপড়ের ভেদকেই অন্যোন্যাভাব বলা হয়। ঘট কাপড় থেকে পৃথক, সুতরাং ঘটে কাপড়ের অভাব, কাপড়ে ঘটের অভাব। যেহেতু একটি বস্তু আর একটি বস্তু থেকে পৃথক, একটির রূপ আর একটিতে থাকতে পারে না।

সংসর্গাভাব হল সংযোগের অভাব—যেমন মাটি আর মূর্তি দুটি পদার্থের মধ্যে সংযোগের অভাব বা সম্বন্ধের অভাব। অন্যোন্যাভাব হল দুটি বস্তুর পারস্পরিক অভাব, অথবা দুটি বস্তুর তাদাত্মের (identity) অভাব।

১৬। জগতের সৃষ্টি এবং লয় (The creation and Destruction of the world) ঃ

বৈশেষিকরা পরমাণুবাদের সাহায্যেই এই জড়জগতের সৃষ্টি এবং লয় ব্যাখ্যা করেছেন। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণু হল মূল উপাদান। যা স্থূল তা মূল উপাদান হতে পারে না। এই জড়জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ ক্ষিতি, জল, বায়ু এবং তেজের পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন এবং পরমাণুগুলি বিযুক্ত হলেই তাদের বিনাশ হয়। প্রশ্ন হল—পরমাণুগুলিকে কে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করে? চেতনাহীন পরমাণুগুলি আপনা আপনিই সংযুক্ত বা বিযুক্ত হয়—এ ধারণা করা যুক্তিযুক্ত নয়। নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিমান কর্তা পরমাণুগুলিকে সংযুক্ত এবং বিযুক্ত করেন। বৈশেষিকদের মতে এই বুদ্ধিমান কর্তা হলেন ঈশ্বর। বৈশেষিকরা অনুমানগুলির সংযোজন এবং বিয়োজনের মূলে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে বৈশেষিকরা পরমাণুবাদের সমর্থক হলেও ভারতীয় দার্শনিকদের জগতের প্রতি যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী তাকে গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিতে এই জড়জগত জীবাত্মার মোক্ষলাভের জন্য এক উপযুক্ত নৈতিক ক্ষেত্র। বস্তুতঃ, এই জড়জগত নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এক সর্বজ্ঞ, অনন্ত, শাশ্বত পরমপুরুষ, জীবের কর্মফল থেকে উদ্ভূত অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্ট শক্তি অনুযায়ী এই জগত নিয়ন্ত্রণ করেন।

পরমাণুর সংযোগ এবং বিযুক্তিতে যৌগিক বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ

কোন বুদ্ধিমান কর্তা পরমাণুগুলিকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করেন

ন্যায় বৈশেষিকদের জগতের উৎপত্তি এবং ধ্বংস-সম্পর্কীয় মতবাদ কেবলমাত্র অনিত্য যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বৈশেষিকদের মতে আকাশ, দেশ, কাল, মন ও আত্মাকে পরমাণুতে পরিণত করা যায় না, এগুলি নিত্য দ্রব্য। অন্যান্য যৌগিক পদার্থ অনিত্য, এগুলিকে পরমাণুতে পরিণত করা যায়। এই পরমাণুর আবার কোন পরমাণু হয় না। এই পরমাণুগুলি নিত্য, এগুলির উৎপত্তি বা বিনাশ নেই।

নিত্য পদার্থের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই

শান্ত অবয়ববিশিষ্ট জড়দ্রব্যগুলিই পরমাণুর সংযোগে গঠিত। এগুলির উৎপত্তি নিম্নলিখিত ভাবে ঘটে থাকে। সৃষ্টির প্রথম স্তরে আমরা পাই দ্ব্যণুক। দুটি পরমাণু মিলিত হলে দ্ব্যণুক (dyad) হয়। এর পরের স্তরে আমরা পাই ত্র্যণুক (triad)। তিনটি পরমাণুর মিলনে ত্র্যণুকের উৎপত্তি হয়। ত্র্যণুককে 'ত্রসরেণু'ও বলা হয়। 'ত্রস' কথাটির অর্থ গতিশীল, সুতরাং ত্রসরেণু হল গতিশীল অণু। পরমাণু ও দ্ব্যণুক প্রত্যক্ষ করা যায় না, ত্র্যণুক বা ত্রসরেণুই দৃশ্য বা প্রত্যক্ষের বিষয়—ত্র্যসরেণুই স্থূলের আদি অবস্থা।

সৃষ্টির প্রথম স্তরে দ্ব্যণুক, তারপর ত্র্যণুক

দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক বা ওদের সংমিশ্রণেই এই জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি। প্রশ্ন হল—এই পরমাণুগুলিকে কে গতিশীল করে তোলে? দ্বিতীয়তঃ, এই জগতে আমরা যে শৃঙ্খলা, বিন্যাস এবং সূক্ষ্ম কলাকৌশল লক্ষ্য করি তাকেই বা কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? অর্থাৎ পরমাণুগুলিকে কে সুবিন্যস্ত করে? বৈশেষিকদের মতে এই জড়জগতের একদিকে দেখি যাবতীয় জড়বস্তু; অন্য দিকে দেখি শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মাযুক্ত চেতনশীল জীব। আকাশ, কাল ও দিকে এদের অবস্থান এবং এদের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ঘটে। জীবাত্মা কর্মফলানুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগ করে। জগত নৈতিক কর্মবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এই কর্মবাদই জীবকে নিয়ন্ত্রিত করে।

জগত নৈতিক কর্মবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এই কর্মবাদই জীবকে নিয়ন্ত্রিত করে

জগতের নৈতিক শৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতেই বৈশেষিক সম্প্রদায় জগতের সৃষ্টি এবং লয় ব্যাখ্যা করেছেন। পরমপুরুষ সর্বজ্ঞ মহেশ্বরের ইচ্ছায় এই সৃষ্টি কার্য শুরু হয়। পরমেশ্বর এক জগত সৃষ্টির কল্পনা করেন—যে জগতে জীব তাদের কর্মফলানুযায়ী সুখ ও দুঃখ ভোগ করবে। অবশ্য জগতের এই সৃষ্টি ও ধ্বংস হল অনাদি, এদের আরম্ভও নেই, শেষও নেই। অর্থাৎ সৃষ্টির পরধ্বংস এবং ধ্বংসের পর সৃষ্টি পর্যায় ক্রমে চলেছে। জীবের শুভ ও অশুভ কর্মানুষ্ঠানের ফলে পাপ ও পুণ্যের উদ্ভব। এই পাপ ও পুণ্যের সঞ্চয়ই হল অদৃষ্ট। যখন ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেন তখন নিত্য জীবাত্মার মধ্যে এই নৈতিক কর্মফলের অপ্রত্যক্ষ শক্তিগুলি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কার্য করতে থাকে।

মহেশ্বরের ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টিকার্য শুরু

জীবাত্মার সঙ্গে অদৃষ্টের বা নৈতিক গুণাগুণের সংযোগের ফলেই বায়ুর পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে। বায়ুর পরমাণুগুলি যখন সংযুক্ত হয়ে দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুক গঠন করে, তখন এই দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুকের সংযোগেই বায়ুরূপ মহাভূতের উৎপত্তি হয়। এই মহাভূত আকাশে অবস্থিত থাকে এবং সর্বক্ষণ অনুকম্পিত বা আন্দোলিত হতে থাকে। অনুরূপভাবে জল, ক্ষিতি এবং তেজের পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে যথাক্রমে জল, ক্ষিতি এবং তেজ—এই তিন মহাভূত উৎপন্ন হয়। এর পর কেবলমাত্র ঈশ্বরের অভিধ্যানের ফলেই তেজ এবং ক্ষিতির পরমাণু থেকে একটি ব্রহ্মাণ্ডের ভ্রূণের উৎপত্তি ঘটে। পরমেশ্বর এই ভ্রূণকে ব্রহ্মা বা জগত-আত্মার দ্বারা প্রাণময় করে তোলেন। এই ব্রহ্মা হলেন—জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যসমন্বিত। ঈশ্বর এই ব্রহ্মার ওপরই জগতের সবিস্তারে সৃষ্টি কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ব্রহ্মার কাজ পাপ ও পুণ্য, সুখ ও দুঃখের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে এই জগতের যাবতীয় সব কিছুকে সৃষ্টি করা।

জীবাত্মার সঙ্গে অদৃষ্টের বা নৈতিক গুণাগুণের সংযোগের ফলেই বায়ুর পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে

তারপর জল, ক্ষিতি ও তেজের পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে

সৃষ্ট জগত বেশ কিছুদিন চলতে থাকে। তারপর সকল জীবকে দুঃখ ও ক্লেশভোগ থেকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বর এই জগত ধ্বংস করার জন্য সংকল্প করেন। ঈশ্বরের জগত ধ্বংস করার ইচ্ছা থেকেই জগতের ধ্বংস শুরু হয়ে যায়। অন্যান্য আত্মার মত ব্রহ্মা যখন তাঁর শরীর পরিত্যাগ করেন, তখনই মহেশ্বরের মধ্যে জগত ধ্বংস করার ইচ্ছার আবির্ভাব হয়। এর ফলে জীবাত্মার সৃষ্টিমূলক অদৃষ্ট তার ধ্বংসমূলক অদৃষ্টের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং জীবের কর্মময় জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। যে সব জীবাত্মার মধ্যে এই ধ্বংসমূলক অদৃষ্ট কাজ করতে থাকে, সেই জীবাত্মার দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে। দেহ ও ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হলে কেবলমাত্র পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকে। এইভাবে ক্ষিতি, জল, তেজ এবং বায়ু প্রভৃতির পরমাণুগুলি পর্যায়ক্রমে গতিশীল

ঈশ্বরের জগত ধ্বংস করার ইচ্ছা থেকেই জগতের ধ্বংস শুরু হয়

সৃষ্টিমূলক অদৃষ্ট ধ্বংসমূলক অদৃষ্টের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়

হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ফলে মহাভূতগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। চারটি মহাভূত, সমস্ত দেহ এবং ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়ে গেলে কেবলমাত্র ক্ষিতি, জল, তেজ, ও বায়ুর পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক, মন আত্মা—এই নিত্য দ্রব্যগুলি এবং পাপ, পুণ্য ও অতীত সংস্কার বা ভাবনাগুলি কেবলমাত্র থেকে যায়।

চারটি মহাভূত, দেহ ও ইন্দ্রিয় সব বিনষ্ট হয়ে যায়

লক্ষ্য করার বিষয় যে, সৃষ্টির বেলায় প্রথমে বায়ুর পরমাণুর দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থের আবির্ভাব, তারপর ক্রমশঃ জল, ক্ষিতি এবং তেজের পরমাণুর দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থগুলির আবির্ভাব হয়, কিন্তু ধ্বংসের বেলায় প্রথমে ক্ষিতিজ যৌগিক পদার্থ, তারপর জল, তেজ এবং বায়ুর দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থগুলি ধ্বংস হতে থাকে।

১৭। ঈশ্বর বা পরমাত্মা ঃ

কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ করেননি। বৈশেষিক সূত্রে যেখানে তিনি বেদের প্রামাণ্যের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন তাঁর বা তাদের বচনের জন্যই বেদ প্রামাণ্য।[1] কিন্তু তাঁর বা তাঁদের বলতে কণাদ হয়ত মুনিঋষিদের কথাই বলেছেন। কিন্তু পরবর্তী ভাষ্যকার শংকরমিশ্র প্রভৃতি ব্যক্তিরা বেদকে ঈশ্বরের রচনা বলেই উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বর ভ্রান্তি, অসাবধানতা এবং অপরকে প্রতারণা করার ইচ্ছা থেকে মুক্ত। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, অনন্ত, শাশ্বত পুরুষ, বেদ তাঁরই রচনা। প্রশস্তপাদ তাঁর পদার্থসংগ্রহের প্রথম এবং শেষ সূত্রে ঈশ্বরের উল্লেখ করেছেন। মহেশ্বর কি ভাবে জগত সৃষ্টি এবং ধ্বংস করেন তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি দিয়েছেন। শ্রীধর এবং উদয়ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। কণাদের মতে অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্টই পরমাণুর এবং আত্মার গতিশীলতা, জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা এবং জীবাত্মার সুখ ও দুঃখভোগ ব্যাখ্যা করতে সমর্থ। দার্শনিক শংকর বৈশেষিক মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে

কণাদ ঈশ্বরের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেননি

শংকরমিশ্র, প্রশস্তপাদ প্রভৃতি ঈশ্বরের উল্লেখ করেছেন

কণাদের মতে অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্টই জীবাত্মার সুখ-দুঃখ ভোগ ব্যাখ্যা করতে সমর্থ

1. "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"—'বৈশেষিক সূত্র'

ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে উল্লেখ করেননি। তিনিও জগতের সৃষ্টি-প্রসঙ্গে পরমাণুকে গতিশীল করার জন্য অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্টকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল অদৃষ্ট, চেতনা ও বুদ্ধি শূন্য। কোন বুদ্ধিমান কর্তা যদি অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত না করে তাহলে অদৃষ্টের ক্রিয়াকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে?

পরবর্তী যে সব দার্শনিক ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেছিলেন, তাঁরা তাদের রচনায় ঈশ্বরের সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করে গেছেন। এই সব লেখক জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে প্রভেদের উল্লেখ করেছেন।

জীবাত্মা বহু, পরমাত্মা এক

জীবাত্মা বহু, কিন্তু পরমাত্মা এক। ঈশ্বর বিভু বা সর্বব্যাপী, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। যেহেতু ঈশ্বরের কোন মিথ্যাজ্ঞান নেই, সেহেতু ঈশ্বরের কোন রাগ বা দ্বেষ নেই। যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, সেহেতু ঈশ্বরের কোন সংস্কার নেই।

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, পরমাণু জগতের উপাদান কারণ। বৈশেষিকরা দ্বৈতবাদী, তাঁরা ঈশ্বর ও পরমাণু উভয়েরই সহ-অবস্থানের কথা স্বীকার করেন।

উপসংহার ঃ

ন্যায় দর্শনের মত বৈশেষিক দর্শনও বস্তুবাদী দর্শন। বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরবাদ এবং বহুবাদের সমন্বয় দেখা যায়। বৈশেষিকদের মতে জড়পরমাণুর

বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরবাদ ও বহুবাদের সমন্বয়

সংযোগেই এই জগতের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি। কিন্তু ঈশ্বরই জীবাত্মার অদৃষ্ট অনুযায়ী এই জগত সৃষ্টি করেন ও ধ্বংস করেন। কিন্তু বৈশেষিকদের জীবাত্মা সম্পর্কে ধারণা এবং অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অসংগতিপূর্ণ। কারণ নৈয়ায়িকদের মত

আত্মা স্বরূপতঃ চৈতন্যময় না হওয়াতে মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না

বৈশেষিকরাও মনে করে যে আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন পদার্থ এবং চেতনা আত্মার একটি আগন্তুক ধর্ম। মোক্ষ অবস্থায় আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। কিন্তু আত্মাকে যদি চৈতন্যময় ও বুদ্ধিময় সত্তারূপে কল্পনা করা না যায় তাহলে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না।

বৈশেষিকদের অতীবর্তী ঈশ্বরবাদ সন্তোষজনক নয়

বৈশেষিকদের অতীবর্তী ঈশ্বরবাদও (Deism) সন্তোষজনক নয়। ঈশ্বরকে যদি জীবাত্মা ও জগতের সম্পূর্ণ অতীবর্তী বলে মনে করা যায় তাহলে জীবাত্মা এবং জগতের অস্তিত্ব ঈশ্বরকে সীমিত করে। দ্বিতীয়তঃ, অতীবর্তী ঈশ্বরবাদ জীবের ধর্ম-চেতনার পক্ষে অনুকূল ধারণা নয়। ধর্ম-চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে জীব ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে লীন করে দিতে চায়, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মা হতে চায়, কিন্তু বৈশেষিক মতবাদে তার কোন সুযোগ নেই।

পদার্থের বিভাগ ঠিক দার্শনিক বিভাগ নয়

পদার্থের শ্রেণীবিভাগ, পরমাণুবাদ এবং সৃষ্টিতত্ত্ব বৈশেষিক দর্শনের বৈশিষ্ট্য। বৈশেষিক দর্শন ভাবপদার্থ এবং অভাবপদার্থ—এই উভয়বিধ পদার্থ স্বীকার করেন। আবার ভাবপদার্থের মধ্যে কতকগুলি পদার্থের যেমন—দ্রব্য, গুণ এবং কর্মের দেশে ও কালে অবস্থান আছে। কিন্তু সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়ের কোন দৈশিক বা কালিক অবস্থান নেই। পদার্থের এই বিভাগের পরিকল্পনায় বৈশেষিক সম্প্রদায় সাধারণ মতবাদকেই অনুসরণ করেছেন। এই বিভাগ ঠিক দার্শনিক বিভাগ হয়নি। বৈশেষিকরা দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সমবায় সম্বন্ধের কথা বলেছেন। কিন্তু বৈশেষিক মতে গুণ ভিন্ন দ্রব্যের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। তাহলে দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সমবায় সম্বন্ধ কি ভাবে হতে পারে? যে দুটি বস্তুর মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ থাকবে সে দুটি বস্তু পরস্পর-নির্ভর হবে, কিন্তু দ্রব্য ও গুণ পরস্পর-নির্ভর নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে সমবায় সম্বন্ধ আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ না হয়ে বাহ্য সম্বন্ধে পরিণত হয়েছে।

বিশেষের স্বরূপ বৈশেষিক দর্শনে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়নি

বৈশেষিকদের বিশেষ পদার্থ সম্পর্কে ধারণাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিশেষের স্বরূপ বৈশেষিক দর্শনে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়নি। তাছাড়া, একটি জীবাত্মার সঙ্গে আর একটি জীবাত্মার পার্থক্য, বৈশেষিক দর্শনে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। জীবাত্মা তাদের বিশেষত্ব কখনও হারায় না। এমন কি মোক্ষ অবস্থায়ও প্রতিটি জীবাত্মা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।

বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ মতবাদের তুলনায় উন্নততর মতবাদ। সাধারণ মতবাদ অনুযায়ী এ জগত ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু—এই চার ভূত বা উপাদানের সংযোগে গঠিত। কিন্তু বৈশেষিকদের মতে এই চারটি ভূতের পরমাণুর সংযোগেই এই জগত সৃষ্ট হয়েছে। তাছাড়া, জড়বাদী মতানুসারে জড়বস্তু, মন, চেতনা—সবই জড় পরমাণুর দ্বারা গঠিত, কিন্তু বৈশেষিক সম্প্রদায় মন, চেতনা প্রভৃতি জড়বস্তু থেকে উৎপন্ন নয় মনে করেন। বৈশেষিক দর্শন পরমাণুবাদের সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতির সমন্বয়-সাধন করেছে। ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং নৈতিক নিয়ন্ত্রণকর্তা। কিন্তু ঈশ্বরের পাশাপাশি পরমাণু, মন, আত্মার নিত্যতা স্বীকার করার জন্য ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সীমায়িত হয়ে পড়েছে। কোন বিশ্বচেতনা বা পরমব্রহ্ম থেকেই সকল কিছুর উদ্ভব বা উৎপত্তি—এমন কোন নীতি না থাকার জন্য বৈশেষিকদের ঈশ্বরতত্ত্ব ও জগত-সৃষ্টিতত্ত্ব বেদান্ত দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি।

জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ মতবাদের তুলনায় বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ উন্নততর

বৈশেষিক ঈশ্বরতত্ত্ব ও জগত সৃষ্টিতত্ত্ব বেদান্ত দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি

প্রশ্নমালা

Introduction

1. Explain in general terms certain common features found in the different systems of Indian Philosophy. Can we describe these systems as pessimistic because of their emphasis on the fact of human misery ? (C. U. 1950)

2. Give some of the distinguishing features of Indian Philosophy. (C. U. 1953)

3. Discuss if Indian Philosophy is pessimistic. (C. U. 1954)

4. Consider the criticism that proper emphasis on morality is not laid in Indian Philosophy. (C. U. 1955)

5. Is Indian Philosophy based on authority or reasoning or both ? (C. U. 1956)

6. Explain the nature and status of the law of Karma in Indian Philosophy. (C. U. 1956)

7. 'Faith in eternal moral order dominates Indian Philosophy'—Discuss. (C. U. 1957)

8. 'It is said that pessimism in Indian thought though initial, is not final'.—Discuss. (C. U. 1958)

9. How do you meet the charge against Indian Philosophy that it is wholly ethico-religious ?

10. Substantiate the statement that all systems of Indian Philosophy aim at liberation or moksa. (C. U. 1959)

11. What are the places of Authority and Reasoning in Indian Philosophy ? Is the charge of dogmatism against Indian Philosophy justified, in your opinion ? (C. U. 1960)

12. Describe the common features of Indian Philosophical systems & discuss if Indian Philosophy is pessimistic. (B. U. 1961)

13. Explain the fundamental characteristics of Indian Philosophy. (B. U. 1962)

2. Bauddha System

1. Give a general idea of the different schools of Buddhist thought. (C. U. 1951)

2. Explain briefly the main tenets of Buddhist philosophical thought. (C. U. 1952)

3. Write a brief account of the Bauddha system. (C. U. 1956)

4. Explain briefly the four noble truths of Buddhism. (B. U. 1962)

5. Give a general idea of the different religious schools of Buddhist thought.

6. Explain Buddhist's conception of soul and the theory of dependent origination.

7. Explain the theory of Karma as expounded by Buddha.

8. Explain the Buddhistic theory of Momentariness.

3. Nyaya-Vaisesika System

1. How does the Nyaya System prove the existence of God? (C. U. 1954)

2. Explain the Five-membered Syllogism of the Nyaya School. What are its merits? (C. U. 1954)

3. How many Categories (Padartha) are recognised by the Vaisesika School? What are they? Explain any two of them. (C. U. 1954, B. U. 1962)

4. Explain clearly the Nyaya conception of the Soul. (C. U. 1955; B. U. 1961)

5. Give an account of Vaisesika Atomism. (C. U. 1955, '58; B U. 1961)

6. Explain the Nyaya definition of perception and the distinction between ordinary and extraordinary perception. (C. U. 1956)

7. What is Vyapti and what is Nyaya method of establishing it? (C. U. 1956, '57, '60, '62)

8. Explain the Vaisesika Categories of Samanya and Visesa. (C. U. 1956)

9. Explain the nature of Samavaya in the Vaisesika philosophy. How is Samavaya different from Samjoga? (C. U. 1957)

10. Discuss the Nyaya theory of the nature of self. How does it differ from the theory of self in the Adwaita Vedanta? (C. U. 1957)

11. Discuss critically the nature of Nyaya Theism. (C. U. 1958)

12. 'The effect is contained in the Cause'. How would the Nyaya criticise the statement? (C. U. 1958)

13. Explain the Nyaya theory of self and its relation to knowledge. (C. U. 1959)

14. How does the Naiyayika distinguish between samyoga and samavaya? Discuss the doctrine of samavaya. (C. U. 1959)

15. What does the Vaisesika mean by Padarthas? What is Abhava? What are its different kinds? (C. U. 1959)

16. Define perception according to Nyaya. What are the different kinds of perception? (C. U. 1960)

17. Explain the Nyaya-Vaisesika theory of Samanya or generality and Visesa or particularity. (C. U. 1960)

18. Explain the Categories of Dvavya (substance), guna (quality) and Samanya (universal) according to the Vaisesika system. (C. U. 1961)

19. Explain fully the Nyaya theory of extra-ordinary perception (alaukika pratyaksa). (B. U. 1962)

20. State and explain the Nyaya arguments for the existence of God. (B. U. 1962)

21. Explain the Nyaya theory of Upamana.

22. What is Hetvabhas? What are the different kinds of Hetvabhas? Explain with examples.

23. Write notes on the following:

Samavaya, Guna, Nirvana, Vyapti, Abhava, Visesa, Samadhi, Pratityasamutpada, Panca-skandha, Hinayana, Mahayana, Samanyalaksana, Samanya.

পরিভাষিক শব্দ

Authority—প্রামাণ্য
Agnostic—অজ্ঞেয়তাবাদী
Appearance—অবভাস
Acquired Perception—জ্ঞান লক্ষণ
Analogy—সাদৃশ্যমূলক অনুমান
An aggregate of operative condition—কারণ সামগ্রী
Basic characteristics—মৌলিক তত্ত্ব
Beinghood—সত্তা
Common characters—সাধারণ লক্ষণ
Cosmological or Causal Argument—বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক বা পরণতি কারণ বিষয়ক যুক্তি
Correspondence—তদানুরূপতা
Constituents of Inference—অনুমানের অবয়ব
Causal relation—কার্যকারণ সম্বন্ধ
Co-existence—সহ-অবস্থান
Dogmatic—বিচারবিযুক্ত
Dogma—অনুশাসন বাক্য
Development—ক্রমবিকাশ
Determinate Perception—সবিকল্প প্রত্যক্ষ
Deist—অতিবর্তী ঈশ্বরবাদী
Dimension—পরিমাণত্ব
Dyad—দ্ব্যণুক
Epistemology—জ্ঞানবিদ্যা
Extrinsic Validity—পরতঃ প্রামাণ্য
Efficient Cause—নিমিত্ত কারণ
Final Cause—পরিণতি কারণ
Fallacy of Infinite Regress—অনবস্থা দোষ
Genus—জাতি
Generalisation—সামান্যীকরণ
Heterodox—নাস্তিক
Incomposite Category—অসংস্কৃত ধর্ম
Idealist—ভাববাদী
Intuition—স্বজ্ঞা
Individual self—জীবাত্মা
Intrinsic Validity—স্বতঃপ্রামাণ্য
Instrument—করণ
Invalidity—অপ্রামাণ্য
Indeterminate Perception—নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ
Inference—অনুমান
Immediate—অব্যবহিত
Invariable—অপরিবর্তনীয়
Inherence—সমবায়
Law of the Conservation of Moral Value—নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণ নিয়ম
Logical Realism—যুক্তিমূলক বস্তুবাদ
Liberation—অপবর্গ বা মোক্ষ
Metaphysics—অধিবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা
Major Term—সাধ্য
Minor Term—পক্ষ
Middle Term—হেতু

Material Cause—উপাদান কারণ
Non-ethical—নীতি-নিস্পৃহ
Noble Truth—আর্য সত্য
Nihilism—শূন্যবাদ
Non-existence—প্রাগ্‌ভাব
Orthodox—আস্তিক
Optimistic—আশাবাদী
Ordinary Perception—লৌকিক প্রত্যক্ষ
Ontology—তত্ত্ববিদ্যা
Pessimistic—দুঃখবাদী
Personal Identity—ব্যক্তি-অভিন্নতা
Positivism—প্রত্যক্ষবাদ
Pragmatic—প্রয়োজনবাদী, প্রয়োগবাদী
Phenomenalist—আভাসবাদী
Pure Consciousness—শুদ্ধ চৈতন্য
Philosophical School—দর্শন সম্প্রদায়
Proposition—আশ্রয় বাক্য, বচন
Partless—নিরবয়ব
Rigorism—কৃচ্ছ্রতাবাদ
Realist—বস্তুবাদী
Reality—সত্তা, তত্ত্ব
Religious School—ধর্ম-সম্প্রদায়
Realistic Pragmatism—বস্তুবাদী প্রয়োগবাদ
Recognition—প্রত্যভিজ্ঞা
Spiritual background—আধ্যাত্মিক পটভূমিকা
Sumum bonum—পরমার্থ
Synthetic outlook—সংশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী
Scepticism—সংশয়বাদ
Subjective Idealism—আত্মগত ভাববাদ
Simple Apprehension—সহজ উপলব্ধি
Soul—আত্মা
Sumnum-genus—পর-সামান্য
Trancendental Intuition—অতীন্দ্রিয় অনুভূতি
The Theory of Dependent Origination—প্রতীত্য সমুৎপাদবাদ
The Doctrine of Universal Change and Inpermanence—সর্বব্যাপক পরিবর্তনবাদ ও অনিত্যবাদ
The Theory of the Non-existence of the Soul—অনাত্মাবাদ
Trancendentalism—অতীন্দ্রিয়বাদ
The Theory of the Inferability of External Objects—বাহ্যানুমেয়বাদ
Testimony—শব্দ
Triad—ত্র্যণুক
Ultimate Reality—চরমতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব
Universal Relation—সামান্য সম্বন্ধ, নিয়ত সম্বন্ধ
Unconditional—অনৌপাধিক

Womens' Christian College
Chhanda Chakrabarty
1st year degree course.
Roll — 102.
Philosophy.

CHHANDA
CHAKRBA BARTY